আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা

এ এক অন্য ইতিহাস

WWW.ALMODINA.COM

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী

"পৃথিবীতে মানুষের আগমন, উত্থান-পতন ইত্যাদির ক্রিয়াশীল উদ্দেশ্য উদ্ঘাটন করাই ইতিহাসের অন্যতম বিষয়। তাই ইতিহাস পাঠ ও চর্চার মাধ্যমে এভাবেই মানুষ অতীতের ঘটনাবলীর পরিচয় পেতে পারে। তাই বর্তমান প্রজন্মের জন্য ইতিহাস জাতীয় চেতনা উন্মেষের ক্ষেত্রে অতীত বর্তমানের সেতু বন্ধনের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান।"

এ এক অন্য ইতিহাস

আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা

(খ্যাতনামা গবেষক এবং বর্তমানকালের অন্যতম সংস্কারবাদী ঐতিহাসিক)

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী

মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

প্রকাশনায় ঃ
মোহাম্মদ শামসুজজামান
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশনা পরিচালক
মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী
মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

Estd. in the Year—March. 1997

প্রকাশকাল ঃ
জুন-২০০৮ ইং

(লেখক কর্তৃক স্বত্ব সংরক্ষিত)

বর্ণবিন্যাস ঃ
জবা কম্পিউটার
৪৫, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে
আল ফয়সল প্রিন্টার্স
৩৪, শিরিশ দাস লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-605-004-9

লেখকের বিভিন্ন বই সম্পর্কে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং সংবাদপত্রের মন্তব্যের অংশবিশেষ

দৈনিক আজকাল পত্রিকা ঃ "গবেষণাধর্মী বা বিভিন্ন বই থেকে উদ্ধৃতির প্রাচুর্য থাকলেও তাঁর পরিবেশনের স্টাইলটা বেশ সহজ-সরল, ভাষাও টানটান, ফলে বৃহৎ বইটি অনায়াসে শেষ করে ফেলা যায়। ... মোর্তজা সাহেবের এই বইটিও একই সঙ্গে তেমন পরিচিত ও বহুল পঠিত হলে আখেরে শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্রছাত্রীরা উপকৃতই হবেন, বিশেষ করে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান যাঁদের অন্যতম বিষয়। ... আর এ জন্য লেখক প্রচলিত ইতিহাসের পথে হাঁটেন নি। বরং সেই ইতিহাসের যাবতীয় বিকৃতি ও ভুলকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্যই তাঁর এই 'বজ্রকলম'।"

— অনীশ ঘোষ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোলকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ "সেদিক থেকে বইটি সর্বজনপঠিত হোলে সমাজজীবন আরও উন্নততর হবে নিশ্চিত আশা করা যায়। বইটি বহুল প্রচারিত হোক এই কামনা করি।"

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শোভনলাল মুখোপাধ্যায় ঃ "আলোচ্য বইখানি বাংলার, তথা ভারতের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বৃদ্ধি করতে খুবই সহায়ক হবে। ... তাঁর প্রদত্ত তথ্য প্রমাণগুলি ভবিষ্যতেও অন্যান্য গবেষকদের কাছে মৌলিক উপাদানরূপে খুব কাজে লাগবে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ "লেখক যে সব গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা সবই প্রকাশিত গ্রন্থ; কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এইসব গ্রন্থের সঙ্গে সুপরিচিত।"

— ডঃ অমলেন্দু দে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব আনোয়ার জাহিদ সাহেব ঃ "ইতিহাস গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য আবিষ্কার ও জাতির ভবিষ্যত পথ নির্দেশ। ... তাঁর লেখনি বিকৃত ইতিহাসের স্থলে প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরে ইতিহাসের প্রতি ন্যায় বিচার করেছে। আমি তাঁর পুস্তকের বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করি।"

সূচিপত্র

ছবি	পৃষ্ঠা
স্যার আশুতোষ মুখার্জি	১২
স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু	১২
স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১২
স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি	১২
স্যার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি	১২
স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল	১২
স্যার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১২
স্যার সৈয়দ আহমাদ	১৩
স্যার আব্দুল লতিফ	১৩
স্যার আবু আহমাদ	১৩
স্যার আজিজুল হক	১৩
স্যার ফজলে হোসেন	১৩
স্যার আকবর হায়দারী	১৩
রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়	৪৭
যোগেশচন্দ্র রায়	৪৯
বিজয়চন্দ্র মজুমদার	৫১
প্রমথনাথ বসু	৫৩
নীলমণি চক্রবর্তী	৫৫
গোবিন্দচন্দ্র সেনমুন্সী	৫৭
বিপিনকৃষ্ণ বসু	৫৯
ভূতনাথ দে	৬১
হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	৬৩
মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৬৫
ডা. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	৬৭
ডা. নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়	৬৯
জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী	৭১
এলবিয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৩
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	৭৫
ডা. গুডিভ চক্রবর্তী	৭৭
তানসেন	১০০
হাফিজ আলি খাঁ	১০০
এনায়েত খাঁ	১০১
বিলায়েত খাঁ	১০১
বড়ে গুলাম আলি খাঁ	১০২

ছবি	পৃষ্ঠা
স্যার জিয়াউদ্দিন আহমাদ	১৩
স্যার নাজিমুদ্দিন	১৪
স্যার সেকেন্দার হায়াত	১৪
স্যার সুলতান আহমাদ	১৪
স্যার সৈয়দ রেজা আলী	১৪
স্যার আগা খাঁ	১৪
বিজ্ঞানী সৈয়দ মীর মহসিন	১৪
বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মাদ কুদরতে খুদা	১৪
প্রধান বিচারপতি আশুতোষ মুখার্জি	১৫
প্রধান বিচারপতি সৈয়দ নাসিম আলি	১৫
জেলখাটা কবি কাজী নজরুল ইসলাম	১৫
জেলখাটা বুদ্ধিজীবী মাওঃ আকরাম খাঁ	১৫
দুর্গার বিভিন্ন অবস্থা	৩৩
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১১০
রামমোহন রায়	১২৪
দ্বারকানাথ ঠাকুর	১৩৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪২
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪৫
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪৯
বাবার মৃত্যুর পর মাথামুণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ	১৫১
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি	১৫৭
অনন্য ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ	১৫৯
বিশেষ ভঙ্গিমায় রবীন্দ্রনাথ	১৮৬
স্যার মুহাম্মাদ ইউসুফ ইসমাঈল	১৯২
স্যার ইউসুফকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি	১৯৩
রবীন্দ্রনাথকে লেখা স্যার ইউসুফের চিঠি	১৯৪
গান্ধীজী	২০৩
শৈশবে গান্ধীজী	২০৫
কৈশোরে গান্ধীজী	২০৭
বিদেশে ছাত্রাবস্থায় গান্ধীজী	২০৯
দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী	২১১
এন্ড্রুজ ও পিয়ারসনের সঙ্গে গান্ধীজী	২১৫
গান্ধীজীর পিতা করমচাঁদ গান্ধী	২২১
গান্ধীজীর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিলাল	২২৫

ছবি	পৃষ্ঠা
উস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ	১০২
ফৈয়াজ খাঁ	১০২
বেগম আখতার	১০২
রবিশঙ্কর, আলাউদ্দিন ও আলি আকবর	১০৩
কাজী নজরুল ইসলাম	১০৪
সুর সম্রাট আব্বাসউদ্দিন	১০৪
কবি গোলাম মুস্তাফা	১০৪
পদ্মভূষণ উস্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁ	১০৪
রবিশঙ্কর ও আলি আকবর	১০৫
রবিশঙ্কর, কমলাদেবী এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব	১০৫
রবিশঙ্করের শাশুড়ি মদিনা বেগম	১০৬
রবিশঙ্কর ও রওশনআরা	১০৬
রবিশঙ্করের শ্বশুরবাড়ি	১০৭
আবু আলি সিনা	২৬৬
ফিরদৌসী	২৬৭
মাদাম পিপারকিল্ড	২৬৮
আলেকজাণ্ডার রাসেলওয়েব	২৬৯
এডওয়ার্ড আলকক	২৬৯
ডেরেক হাওয়ার্ড স্মিথ এবং তাঁর স্ত্রী	২৬৯
মিস্টার অরভিস হাসান ইভান্স	২৬৯
সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভী(র)	২৭০
লে. কর্নেল আব্দুল্লাহ হিউইট	২৭১
জোনিসন ওরিংটন ক্রাই	২৭১
ডেভিড কাওয়ান	২৭২
আহমদ সেইগ	২৭৩
আসমা সেইগ	২৭৩
সিলভিয়া সালমা কোহেন	২৭৪
মেজর আব্দুল্লাহ বেটারসবে	২৭৪
এলিজাবেথ সাফারন	২৭৪
জেসেন ইয়াসমিন স্কট	২৭৪
ইসমাঈল ডি. ইয়র্ক	২৭৪
জামিল প্লান্ট	২৭৫

ছবি	পৃষ্ঠা
গান্ধীজীর দ্বিতীয় পুত্র মণিলাল	২২৭
গান্ধীজীর তৃতীয় পুত্র রামদাস	২২৯
গান্ধীজীর কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাস	২৩১
মহাত্মা গান্ধী ও নেতৃবৃন্দ	২৩৩
গান্ধীজী এবং রাজকুমারী অমৃত কাউর	২৩৫
আভা ও মনুর সঙ্গে গান্ধীজী	২৩৭
চলার পথে গান্ধীজী	২৩৯
কিরণশঙ্কর রায়	২৬০
হাসান সোহরাবর্দী	২৬১
শের-এ বাংলা ফজলুল হক	২৬২
আশরাফ আলি থানভী (র)	২৬৩
জালালুদ্দিন রুমী	২৬৪
শাইখ সা'দী	২৬৫
ব্রিডা কনভয়	২৭৫
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট	২৭৬
প্রোফেসর হারগ্রোঞ্জ	২৭৬
আব্দুর রহমান রসলার	২৭৭
ডক্টর হামিদ মার্কাস	২৭৭
জালালুদ্দিন হো	২৭৮
ফাইসাল ওয়াগনার	২৭৮
ফারুক চিয়াহ	২৭৯
এন.এম.বি. রিযওয়ান	২৭৯
মিস মিনিরা চো	২৭৯
লুকমান ইয়াংটক	২৭৯
আদনান সেং	২৭৯
রাফিয়ান চাও	২৭৯
গানার এরিকসন	২৮০
বায়নার ভি. বোয়েরকি	২৮০
প্যাট্রিসিয়া প্যারী	২৮১
উইসল জেজরস্কি	২৮১
কমলা সুরাইয়া (মাধবী কুট্টি)	২৮২
আব্দুল আযিয জলন্ধরী	২৮২

প্রথমেই যেটা জানতে হবে

স্যার আশুতোষ মুখার্জি

স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি

স্যার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি

স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

স্যার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মানুষই একমাত্র প্রাণী যাদের প্রয়োজন ইতিহাসের। ইতিহাসের প্রাণ হোল সত্যতা ও সততা। ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে কারও প্রতি ভক্তির সীমাহীন অন্ধতা, অথবা অহেতুক প্রচন্ড বিরুদ্ধতা— দুটোই মারাত্মক ক্ষতিকর। যিনি জীবনে মিথ্যা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন না, যিনি মিথ্যাবাদিতা ও মিথ্যাচারিতাকে বুদ্ধিমত্তা ও কলাকৌশল বলে মনে করেন, তাঁর লেখা ইতিহাস কখনোই অব্যর্থ সত্য বা চূড়ান্ত বলে গ্রহণীয় নয়। যদিও তাঁর রচনার সমস্তটাই অসত্য নয় তবুও ইতিহাসবিদ্ হিসাবে তিনি অকৃতকার্য এবং প্রকৃত ঐতিহাসিকদের নিকট তাঁর অপাংক্তেয় হওয়ারই কথা। বহির্ভারতের ইতিহাস ব্যবসায়ীরা এবং তাঁদের ক্রীত তাবেদার-সহযোগীদের হাতে গড়া বর্তমান ভারতীয় ইতিহাস একশো কোটিরও বেশি ভারতবাসীকে এমন এক জায়গায় দাঁড় করিয়েছে যার ফলে আমরা পারস্পরিক অবিশ্বাস, হিংসা, হানাহানি, রক্তারক্তি প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে বীরত্ব মনে করে থাকি। আর একে অপরকে ধ্বংস করতে গিয়ে নিজেরাও ধ্বংসের শেষ সীমান্তে দন্ডায়মান। এই বিধ্বংসী বিপদের হাত থেকে নিজেরা বাঁচতে ও অপর সকলকে বাঁচাতে এখন অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন সঠিক ইতিহাস সংকলন এবং অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্কুলে যথাযথভাবে তার নিরপেক্ষ পরিবেশন।

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, দ্বারকানাথ, হরপ্রসাদের ইতিহাস লিখতে গিয়ে শুধু তাঁদের স্তবস্তুতি আর মহিমা প্রচার না করে তাঁদের সত্যিকারের আলো দিক যেমন তুলে ধরা হয়েছে সেইসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে তাঁদের কালো দিকও। সৈয়দ আহমাদ, মহামতি আকবর, মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহ-র ইতিহাস লিখতে হলে তাঁদের আলো এবং কালো দিক দুটোই তুলে ধরা উচিত। নতুবা তা হবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে একান্তভাবে অনৈতিহাসিক পদক্ষেপ।

ভারতবিভাগের কালে মহম্মদ আলি জিন্নাহকে যে মুসলমানেরা ঘৃণা ও উপেক্ষা করেছিলেন, যাঁরা তাঁর দ্বিজাতি তত্ত্ব মেনে নিতে পারেননি, তাঁরা পাকিস্তানে না গিয়ে এখানেই থেকে গেছেন। পাকিস্তানে চলে যাওয়াটা তাঁরা মনে করেছিলেন বাস্তব বুদ্ধির প্রতিকূল। তাই ভারতের মাটি কামড়ে এখানেই থেকে গেছেন তাঁরা, চিরকালের মত এখানে থাকবার সিদ্ধান্তে আজও রয়েছে তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয়।

ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ সঙ্গত কারণ মনে করে যদি জিন্নাহ্ বিরোধী হন তাহলে তাঁকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে সত্যের খাতিরে এটাও লিখতে হবে যে, জিন্নাহ্ ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক স্তরের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার, আইনজ্ঞ ও রাজনীতিবিদ। অপরদিকে কোন ঐতিহাসিক যদি ব্যক্তিগতভাবে জিন্নাহভক্ত হন বা জিন্নাহ্ প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে থাকেন তবুও তাঁকে ইতিহাসবিদ হিসাবে এটাও লেখবার ক্ষমতা রাখতে হবে যে, জিন্নাহ্ একজন ভাল মুসলমান হিসাবে গণ্য ছিলেন না, কারণ নিয়মিত দিনে রাতে পাঁচবার নামায পড়া এবং রমযান মাসে রোযা রাখা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে।

স্যার আশুতোষ মুখার্জি, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, স্যার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, স্যার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীদের ইংরেজের রাজত্বে 'স্যার' উপাধি পাওয়ার জন্য ভারতবাসী যদি গৌরব অনুভব করেন বা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন তাহলে স্যার সৈয়দ আহমাদ, স্যার আব্দুল লতিফ, স্যার আবু আহমাদ, স্যার আজিজুল হক, স্যার ফজলে হোসেন, স্যার আকবর হায়দারী, স্যার জিয়াউদ্দিন, স্যার নাজিমুদ্দিন, স্যার সেকেন্দার হায়াত, স্যার সুলতান আহমাদ, স্যার সৈয়দ রেজা আলী প্রমুখের জন্যও প্রত্যেক ভারতবাসী গৌরব অনুভব করবেন না কেন, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন নাই বা কেন?

আর যদি বৃটিশের কাছ থেকে পাওয়া 'স্যার' উপাধি বিশ্বাসঘাতকতা, দালালি, গোলামি, নিজেদের বিকিয়ে দেওয়া বা এককথায় বেইমানি বলে মনে করা হয় তাহলে উভয় ক্ষেত্রে প্রত্যেককেই এই বেইমানির কলঙ্কে কলঙ্কিত করা যাবে নাই বা কেন?

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি পণ্ডিতদের পাশে বিজ্ঞানী কুদরতে খোদা, বিজ্ঞানী মীর মহসিন ও বিজ্ঞানী আবুল ফজলের ইতিহাস পাশাপাশিভাবে বেঁচে থাকা উচিত ছিল।

ভারতে বৃটিশ রাজত্বে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হওয়ার সুবাদে স্যার আশুতোষ মুখার্জির পাশে ঐ একই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নাসিম আলির ইতিহাস এবং ছবি প্রচারিত হওয়ারও প্রয়োজন ছিল।

স্যার সৈয়দ আহমাদ

স্যার আব্দুল লতিফ

স্যার আবু আহমাদ

স্যার আজিজুল হক

স্যার ফজলে হোসেন

স্যার আকবর হায়দারী

স্যার জিয়াউদ্দিন আহমাদ

স্যার নাজিমুদ্দিন

স্যার সেকেন্দার হায়াত

স্যার সুলতান আহমাদ

স্যার সৈয়দ রেজা আলী

স্যার আগা খাঁ

প্রধান বিচারপতি আশুতোষ মুখার্জি

প্রধান বিচারপতি নাসিম আলি

আমাদের দেশের বরেণ্য কবিদের নামে স্তব স্তুতি প্রশংসার বাড়াবাড়ি করার অভ্যাস আমাদের যথেষ্ট আছে। স্বাধীনতার ইতিহাসে যাঁদের তেমন কোন অবদান নেই, যাঁদের লেখনি বৃটিশ শাসকের স্তবস্তুতিতে ভরা, যাঁরা তদানীন্তন সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছিলেন সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক, তাঁরা ইতিহাসে খ্যাতির চূড়ায় দন্ডায়মান। কাজী নজরুল ইসলামকে দেশবাসী কবি গায়ক ও গীতিকার হিসাবেই জানেন। তিনি তাঁর লেখনির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে হয়েছেন ধিক্কৃত ও তিরস্কৃত। তাঁর লেখা পাঁচ ছ'টি বই নিষ্ঠুরভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল আর সরকারের কারাগারে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা। তাঁকে জওহরলাল, মতিলাল, আযাদ গান্ধীদের পংক্তিতে স্থান দেওয়া হয়নি আজও।

বৃটিশের তাড়া খাওয়া দৈনিক ও সাপ্তাহিক কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদক, কারাগারে সশ্রম কারাদন্ডভোগী, বৃটিশবিরোধী বিপ্লবী মাওলানা আকরাম খাঁকে আমাদের দেশের ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়া হোল কেন এসব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না আজও। বাংলাদেশের বাসিন্দা হওয়াটাই যদি কারণ হয় তাহলে কি বাংলাদেশিরা তাঁদের ইতিহাস থেকে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র গান্ধীজী এবং জহরলালকে এই অজুহাতেই বাদ দেবেন?

এইসব কথা সামনে রেখেই রচিত হোল এই গ্রন্থ। বর্তমান ও আগামী দিনের অনুসন্ধিৎসু পাঠক গবেষক লেখক বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক বক্তা ও রাজনীতিবিদ্‌দের জন্য এটি হচ্ছে একটি আকর গ্রন্থ, যা তাঁদের জন্য হবে সবিশেষ প্রাপ্তি।

যাঁরা ইতিহাস বা তথ্যবহুল লেখা লেখেন তাঁদের থাকে গভীর পান্ডিত্য, অভিজ্ঞতা আর স্বাতন্ত্র্য। আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি বিপরীত। 'পরের ধনে পোদ্দারি'র মত আমি শুধু প্রখ্যাত বড় ছোট স্বদেশী বিদেশী পণ্ডিতদের উদ্ধৃতি এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাদি জড়ো করে আমার ব্যক্তিগত সুতো দিয়ে মালা গেঁথে দিয়েছি মাত্র।

এই বইটির 'বজ্রকলম' নামটি অনেকেই পছন্দ করছেন না জেনেই দ্বিতীয় খন্ডের নাম পাল্টে রাখা হোল 'এ এক অন্য ইতিহাস'। ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে ছোট্ট অক্ষরে 'বজ্রকলম দ্বিতীয় খন্ড' কথাটিও এতে লেখা থাকল।

স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস আজকের ভারতে এত বিরাট ব্যক্তিত্ব যে, এঁদের সম্বন্ধে এই বইয়ের প্রথম খন্ডের প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে লিখতে হলে বইটি বড্ড বড় হয়ে যায়। আবার যদি একটি পৃথক খন্ড করা হয় তাহলে অনেকের কাছে পুস্তকটি মনে হবে একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর। সেইজন্য 'মুসলমানদের চোখে বিবেকানন্দ' নাম দিয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও তথ্যবহুল গ্রন্থ প্রকাশ করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তাতে প্রসঙ্গক্রমেই এসে যাবেন রামকৃষ্ণ পরমহংসও।

বিজ্ঞানী সৈয়দ মীর মহসিন

বিজ্ঞানী ড. মুহাঃ কুদরতে খুদা

জেলখাটা কবি নজরুল ইসলাম

জেলখাটা বুদ্ধিজীবী মাওঃ আকরাম খাঁ

মুদ্রণ ত্রুটি, ধারাবাহিকতার ত্রুটি, ব্যাখ্যা ও উদ্ধৃতি প্রয়োগের ত্রুটি, তথ্য পরিবেশনের ত্রুটি যদি হয়েই থাকে তাহলে আমি তা মাথা পেতে মেনে নিচ্ছি। আর পাঠকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন তাঁদের পরিচয়সহ যুক্তিগ্রাহ্য দলিলের সঙ্গে সঠিক তথ্য আমার অথবা প্রকাশকের ঠিকানায় পাঠিয়ে কৃতার্থ করেন, যেটা আমার ও পাঠকদের পক্ষে হবে একটি মূল্যবান সংশোধন ও সম্পদ; তাঁদের জন্য দেওয়া রইল আমার আগাম কৃতজ্ঞতা ও শুভাশিস্। উপকৃত ও মুগ্ধ পাঠকদের কাছ থেকেও আশা করি প্রাণবন্ত শুভেচ্ছা আর সেইসঙ্গে আরও উৎসাহ।

সমস্ত প্রশংসা আমার মালিক বিশ্বনিয়ন্তা স্রষ্টারই জন্য।

মেমারি, বর্ধমান
পশ্চিমবঙ্গ

বিনীত
গোলাম আহমাদ মোর্তজা

ভূমিকা

যে কোন জাতির জীবনে অতীত ইতিহাস ঐতিহ্য এক গুরুত্বপূর্ণ ও অনুসরণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়। যদি অতীত ইতিহাসের সাথে অতীত ঐতিহ্যের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ভিত্তিভূমি বিছিন্ন হয়ে পড়ে সে ক্ষেত্রে যে কোন জাতির পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। অতীতের প্রতিবিম্বই হচ্ছে বর্তমান। আর বর্তমান উপহার দিবে ভবিষ্যতকে। এসব চলমান প্রক্রিয়ার কারণেই সব সচেতন জাতি তার অতীত ইতিহাসের পঠন -পাঠনকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গুরুত্ব প্রদান করে, আর তেমনি অতীত ঐতিহ্যের পুরোপুরি সংরক্ষণকেও এক অপরিহার্য বিষয় হিসাবে বিবেচনা করে। সত্যি কথা বলতে গেলে এ ক্ষেত্রে জাতি হিসাবে ইতিহাসের পাতায় আমাদের অবস্থান যথাযথ নয়। আমাদের মুসলমানদের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অবস্থান ক্ষেত্রে বিশেষ আশাহত নয়। কারণ আমরা চারদিক থেকেই ইতিহাসের পাতায় বৈষম্যের স্বীকার। এরও একাধিক কারণ রয়েছে। এখানে বর্ণনার স্থান নয়। ইতিহাসে সৃষ্ট বিভ্রান্তির দ্বারা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন জাতির বিদ্বেষমূলক প্রচারণায় তাড়িত হয়ে থাকি। তাই এ ক্ষেত্রে ইতিহাসকে আমরা সুস্পষ্ট করে তোলার প্রচেষ্টা নিতান্তই ক্ষীণ। জাতি হিসেবে এটা আমাদের ইতিহাস সচেতনারই অভাবের পরিচায়ক। বলার অপেক্ষা রাখে না ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং চিন্তা-চেতনা ভিত্তিক ইতিহাস প্রণয়নে আমাদের সচেতনাতার অভাব আরও প্রকট। যে জাতির অতীত গৌরবের, অতীত শোর্যবীর্যের, অতীত মর্যাদার মহিমা, সে জাতিরই বহু স্মৃতিচিহ্ন ইতিমধ্যেই কালের আবর্তে বিলিন হয়ে গেছে। অর অবশিষ্ট যা কিছু আছে তাও এখন বিলুপ্তির পথে। এ পরিস্থিতে আমরা জাতি হিসাবে মিথ্যা ইতিহাস মেনে নিয়েছি এবং নতুন ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টা না করে থাকাটাই আমাদের অর্থাৎ এ জাতির জন্য পীড়াদায়কই নয় বরং যন্ত্রণাদায়কও বটে।

কোন জাতির স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন ইতিহাস না থাকাটা (অনেক ক্ষেত্রে আছে বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষপূর্ণ যা অন্যান্য জাতির দ্বারা রচিত) অত্যন্ত দুঃখজনক। ইতিহাস কেবল অতীতের অন্ধকারে ফেলে আসা কতিপয় ঘটনাবলীর শব্দ সমষ্টিই নয়। কালের প্রেক্ষিতে ইতিহাস অতীতের অধ্যায় কে ধারণ করে থাকলেও এর প্রভাব প্রক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া অনাগতকাল জাতিকে পথ দেখায় এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করে অনুপ্রাণিত করে। কোন জাতির জনগোষ্ঠির গৌরবময় ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে যারা নিষ্ক্রীয়, নির্বিকার, চেতনাহীন—তারা সত্যিকার অর্থেই হতভাগ্য। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশই বিশেষ করে স্বদেশের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন নয়। ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস থেকে বর্তমান সময়কালের ইতিহাসে কত পক্ষপাতিত্ব বিভ্রান্তি, বিদ্বেষতায় পরিপূর্ণ, যদিও আমাদের শিক্ষিত সমাজ বই পত্রের অনেক খবর রাখার পরও তারা এসব দেখে শুনেও পদানুকরণ করে যাচ্ছেন। মুসলিম জাতির ইতিহাস, ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস, ১৯৪৭ সনের ভারত বিভাগ সম্পর্কীত ঘটনাপ্রবাহ আজকের বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠককে বিভিন্নপন্থায় ভুল বুঝানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় "ত্রিবেনী শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশে এক দেহে লীন হয়ে যাবার মন্ত্রণায়। বর্তমান মুসলমানেরা বিশ্বের সর্বত্রই আজ গভীর ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত। ইতিহাসে মুসলমানেরা যে কত উপেক্ষিত এ সম্পর্কে মৌলবী দীন মোহাম্মদ সাহেব এক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ দুর্ভাগ্যবশত ভারতের সিংহাসন হইতে বিদায় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানদিগের সর্ববিধ গৌরব বিনষ্ট হইয়াছে। কূটনীতি -বিশারদ খ্রীষ্টশিষ্যরা মাত্র যে তাহাদের রাজসিংহাসন অপহরণ করিয়াই তিপ্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে। যাহাতে ভবিষ্যতে শিষ্যরা মুসলমানদিগকে ঘৃণায় চক্ষে দর্শন করেন, তাহারও বিস্তর উপায় স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা মিথ্যা কাহিনীর দ্বারা মুসলমান চরিত্রে কলংক-কালিমা নিক্ষিপ্ত করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতে বিন্দুমাত্র ও কৃপণতা করেন নাই। খৃষ্টানদের একটি মহৎ গুণ এই যে, দান ও অবদান পরম্পরায় তাহারা যতই না কৃপণ হোন না কেন, কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীর অযথা অপবাদ ঘোষণা করিতে দান শৌণ্ডতায় পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন। অপরদিকে ঐতিহাসিকদিগের লেখনী মুসলিম বীরপুরুষ ও সম্রাটগণের অযথা কলংকোদগার অবধারিত।

এ সম্পর্কে আরও একজন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মোহাম্মদ গোলাম হোসেন লিখেছেন ঃ "খৃষ্টান ঐতিহাসিকরা মুসলমানদের মিথ্যা অপবাদ ও অযথা কলংক রটাইতে যে মুক্তকণ্ঠ তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে অন্যত্র যাইতে হইবে না। বঙ্গদেশের ইতিহাস পাঠ করিলেই তাহা প্রমাণিত হইবে। .... ইংরেজরা মুসলমানদিগকে যে চরিত্রে আখ্যায়িত করিয়া হিন্দুদিগকে পথ দেখাইয়াছেন, তাহারাও তদ্রূপ দর্শন করিয়াছেন। আর হিন্দুরা সেই চর্বিত চর্বন করিয়া, নতুন ইংরেজ প্রভুর মনোরার্থে তাহাতে আরও রং চড়াইয়া, ইতিহাস, নাটক, নভেলে দেশ বিস্মৃত করিয়াছেন। অনেকেই নিজে কিছু বিচার আচার না করিয়া কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগেরই মতের অনুবর্তী। এই সমস্ত হইতে অনুমান হয় এ দেশবাসী পাশ্চাত্যবিদ্যা পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের বিদ্বেষ বুদ্ধি চালিত লেখনী প্রসূত অনেক কথাই বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাস তাদের অটল। .... তাহারা কোনরূপ বিচার আচারের ধারধারেন না।

—(বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান)

এই সমস্ত আলোচনা হইতে একটা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত যে, ইংরেজ ঐতিহাসিকরা ইচ্ছা করিয়াই সেই রূপ করিয়াছেন। কার্যক্রমে যেন ইংরেজ জাতি এদেশের রাজশক্তি লাভ করেন। রাজশক্তি লাভ করিয়া পূর্ববর্তী সম্রাটদিগের কুৎসা না গাহিতে পারিলে শাসিতদিগের অন্তকরণে ভক্তি স্থান লাভ করা কিছু কষ্টকর হইয়া পড়ে। সেই জন্যই তাঁহারা এদেশীয়দের ইতিহাস, লোকচরিত্র ও ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারাদিতে এরূপ বিভিন্ন প্রকারে চিত্রিত করিয়াছেন। .... এ দেশীয় ইংরেজকৃত মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস অপরাধ, কলংক, কুৎসা রটনার সহিত ইংরেজদের জাতীয় স্বার্থসিদ্ধি সম্পূর্ণরূপে জড়িত। .... সাধারণতঃ এ দেশে যে সমস্ত স্কুলপাঠ্য ইতিহাস প্রচলিত সে সমুদয় ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের অবিকল অনুকরণ পদাঙ্কানুসরণ মাত্র। তাহাতে অনুসন্ধিৎসার কোন পরিচয় তেমন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে সম্প্রতি কতিপয় সহৃদ কৃতবিদ্য অনুসন্ধিৎসু হিন্দু মহানুভবের অবির্ভাবে মুসলমান রাজত্বের কলংক কালিমা স্খলনের পথ কতক পরিমাণে উন্মুক্ত হইয়াছে। .... সে ঋণ এক প্রকার অপরিশোধ্য। পুণ্য শ্লোক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নিখিল নাথ রায়, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অপরাপর দুই একজন মহাত্মারও অর্বির্ভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। (মোহাম্মদ গোলাম হোসেন ঃ বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান) প্রকাশক ঃ মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিচার্স একাডেমী, ঢাকা।

উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্বের সময় একথা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য যে, সুদীর্ঘ কাল পাশাপাশি বসবাস করেও হিন্দু মুসলমানের কোন সম্প্রতি গড়ে উঠে নাই; একে অপরকে সন্দেহ করেছে, করেছে ঘৃণা। এর মর্মমূলে কাজ করেছে সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের আত্মকেন্দ্রিকতা ও সংখ্যা লঘু মুসলমান সমাজকে জানবার ব্যাপারে নিদারুন নিস্পৃহতা ও অনিহা। পরাধীনতার মুক্তির ব্যাপারে যখনই মুসলমানগণ ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন, তখনই হিন্দুরা ইংরেজদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এমন একটি দৃষ্টান্ত ঃ পলাশীর পরাজয়ের পর মুসলমানগণ যখন ইংরেজদের বিরোধিতা করেছে তখন হিন্দুরা করেছে ইংরেজ শাসনের প্রতি সহযোগিতা। ১৯০৫ সনে মুসলমানদের স্বার্থে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি মুসলিম প্রধান প্রদেশ গঠিত হলে এর বিরুদ্ধে সারা ভারতের হিন্দুরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। বৃটিশ সরকার বাধ্য হয়ে ১৯১১ সনে তা পাল্টাতে বাধ্য হয়। ইংলন্ডের রাজা ও ভারত সম্রাট ১৯১১ সনে দিল্লীতে ডি. এল. রায় তাঁকে খোশ আহামেদ জানিয়ে লিখেন ঃ

বাজুক শংখ, উড়ক নিশান, বিবিধ বর্ণে সাজি,
ভারতের রাজা, ভারতের রানী, ভারতে এসেছে আজি।

কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী মহল কোন প্রেক্ষিতে নিজেদের শ্রেণী ও গোষ্ঠীস্বার্থে সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিল এবং এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর এরা কিভাবে আনন্দ প্রকাশ করেছিল এর পরবর্তী বছরগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে, বাঙালী তথা ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকায় এ সৃষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্রেণী কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস ও যাত্রাগানে কি রমক নগ্নভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। .... এ বুদ্ধিজীবী শ্রেণী প্রচাত্যের ইংরেজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুকরণ , অনুসরণ ও গলধকরণ করে সাম্রাজ্যবাদী সম্পূরক হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। উভয়ের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে এক অশুভ আঁতাত। —(এম. আর আকতার মুকুল ঃ কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী)

বৃটিশ যুগে সাহিত্য ক্ষেত্রে বাংলা নাটকে ভয়াবহ মুসলিম বিদ্বেষ লক্ষ্যণীয়। এরই একটি নমুনা এখানে তুলে ধরা হল। কিরণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় রচিত অন্যতম দেশাত্মক বোধক (?)

নামক হচ্ছে 'ভারতে যবন'। এ নাটকের ভারত মাতার দুঃখে ভারত সন্তানেরা যবন (মুসলমান) বধ করে স্বাধীনতা (?) অর্জনের কিভাবে প্রচেষ্টা করেছে নাট্যকারের লিখিত বক্তব্যের নমুনা হচ্ছে ঃ স্বাধীনতা সম কি আছে আর, পামর যবনে করি কি ভয়?

উনবিংশ শতাব্দীর এসব লেখকের দৃঢ় ধারণা ছিল যে এরই সাথে গণমানুষের হৃদয়ে দেশাত্ববোধ জাগ্রহ হবে। এ শতাব্দীর শেষ ভাগের ১৮৭৫ (জোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর) রচিত সরোজনী নাটক সংলাপের অংশ বিশেষ ঃ

সরোজনী ॥ মা চতুর্ভূজা। যাদের জন্য পিতার আজ এরূপ বিষম ভাবনা হয়েছে, সেই দৃষ্ট মুসলমানদের শ্রীঘ্র নিপাত কর।

লক্ষণ ॥ বৎসে মুসলমানদের নিপাত সহজে হবার নয়। তার পূর্বে অশ্রুপাত করতে হবে। জোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের মুসলিম বিদ্বেষী আরও একটি নাটকের সংলাপ ঃ

'যেখানে মুসলমান থাকে সেখানকার বাতাসও যেন আমার কাছে বিষতুল্য বোধ হয়। এ স্বপ্নময় নাটক (১৮৮২) এর অন্যতম চরিত্রে শুভসিংহ সংলাপ ..... দেব মন্দির সকল, চূর্ণচূর্ণ করিতেছে স্বেচ্ছ পদাঘাতে, বেদমন্ত্র ধর্ম করিতেছে লোপ, গোহত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ মাঝে।

এর চেয়ে মুসলিম বিদ্বষী বক্তব্য আর কি হতে পারে। ঠাকুর মহাশয় এখানে বলতে চেয়েছেন যে ..... মুসলিম রাজশক্তি শুধু অত্যাচারীই নয় বরং পুরো মুসলমান সমাজটাই এ পদাংক অনুসরণ করছে।— (কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী ৪৮-৪৯ পৃঃ)

এরপর আসা যাক কাব্য কেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতায় মুসলমানদের স্বার্থে ইংরেজ আমলে প্রদেশ বাস্তবায়নের বিরোধিতা করতে যেয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর লিখেন ঃ আমার সোনার বাংলা গানটি। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক সাহিত্যিক মোহাম্মদ মোদারের লিখেছেন ঃ ১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাওয়ায় কবি সোনার বাংলা গান লিখে হিন্দুদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু মুসলমানেরা এতে ক্ষুদ হয়।— (ইতিহাস কথা কয়)

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত সে পৌত্তলিকা মতবাদের ধারক, তা সত্ত্বেও আমরা তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি, কারণ আমাদের চালিকা শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি এক অশুভ শক্তির নির্দেশে এবং একেই আমরা সত্যিকার পথ প্রদর্শকরূপে মেনে নিয়েছি। এর চাইতে আমাদের বড় আক্ষেপ আর কি হইতে পারে যা ইতিপূর্বেও আলোচিত হয়েছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক কাব দেওয়ান আবদুল হামীদ সাহিত্যরত্ন লিখেন, "রবীন্দ্র সাহিত্যে মুসলমান" গ্রন্থে লিখেছেন, "তাঁর সাহিত্যে মুসলমানগণ সর্বত্র নিগৃহিত এবং নিকৃষ্ট চরিত্রে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তিনি মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন।"

হিন্দুদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাদের জ্যাতিভিমানের যে অভিপ্রায়টি হচ্ছে ঃ বাঙালি হিন্দুরচিত্তে একটি অভিমান দুর্জয় হয়ে আছে। সে অভিমান চলে আমারই বাঙালী জাতি, আমাদের ভাবনা, ধর্ম, আচার, কৃষ্টি বাঙালী জাতির নিজস্ব ও সর্বস্ব। —(মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, হিন্দু মুসলমান ঃ বুলবুল চৈত্র ঃ ১৩১৪ বাংলা)

অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে হলে হিন্দুত্বে অন্তর্লগ্ন হতে হবে। কথাটা ভুদেবচন্দ্রের একটি লেখায় অনবগুণ্ঠিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'শিখা' থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যাক ঃ

ভারতীয় জাতীয়তার যে আদর্শ হিন্দু গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ হিন্দু জাতীয়তা, তাহাতে স্বতন্ত্র সত্ত্বা বিশিষ্ট অন্য সম্প্রদায়ের স্থান নাই। পরলোকগত ভূদেববাবু তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান মিলনের এক ছবি আকিয়াছেন। এই জটিল সমস্যার তিনি যে সমাধান করিয়াছেন তাহা মৌলিক না হইলেও খুবই উপদেশব্যঞ্জক। তাঁহার মতে, জৈন ও শিখদিগকে যখন সাধারণ হিন্দু সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়, কালে এখানকার মুসলমানেরাও যে ভারত সমাজের মধ্যে একটি বর্ণ বিশেষ রূপে লক্ষিত হইবে তাহার বিশেষ সম্ভাবনা। ('স্বাধীন ভারতের দাস', 'শিখা", ১৩৩৮) বাংলার মুসলমান স্বভাবতই এ দৃষ্টিভঙ্গিকে ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখেছে। এমনিক ভঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন যখন প্রবল আকার ধারণ করে উত্তেজিত বাঙালিয়ানাকে সত্য ও প্রত্যক্ষ করে তুলতে চেয়েছিল, তখনও দেখা গেছে এ আন্দোলনের ধারায় এসে শিবাজী –উৎসবের মত অন্ধ গোঁড়ামি সংগোপনে মিলিত হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথও শিবাজীর 'একধর্ম রাজ্য পাশে খন্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি' শুনে উৎসাহিত হয়েছেন এবং সে উৎসাহে নবীন সেনের এক ধর্ম, এক জাতি—এক রাজ্য এক নীতি'র প্রতিধ্বনি শোনা গেছে এমন অভিযোগ অযথার্থ নয়।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন উপলক্ষে কংগ্রেস যে কর্মসূচী প্রণয় করে তা নিছক হিন্দুরাই মাত্র পালন করিতে পারে। বাংলার তদানীন্তন নেতা মিঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'India in the making' নামক সুবিখ্যাত পুস্তক হইতে সেই শোক দিবসের কর্মতালিকাটি উদ্বৃত করা হল ঃ

(ক) রাখী বন্ধন উৎসব–প্রত্যেকের বাহুতেই লাল ফিতা বাঁধিতে হইবে। ইহা ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। ইহা প্রাচীন ভারতীয় (মানে হিন্দু) প্রথার পুনঃপ্রবর্তন।

(খ) ১৯শে অক্টোবর উপবাসবত পালন করিতে হইবে। ..... খুব সকালে সকলকে খালি পায়ে হাঁটিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য গঙ্গাস্নানে যাইতে হইবে ইত্যাদি।

উপরোক্ত কর্মতালিকা অনুসরণের ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুদের মধ্যে উগ্রধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হইল এবং মুসলমানরা এই আন্দোলনের বিরোধিতা করায় হিন্দুদের উপরোক্ত অনুভূতি উগ্র মুসলিম-বিদ্বেষে পরিণতি লাভ করিল। ফলে, পূর্ব-বঙ্গের নানাস্থানে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা শুরু হইয়া গেল। তাহাতে বহু মুসলমান ও হিন্দু প্রাণ হারাইল।

শুধু এই মুসলিম–বিরোধী কর্মতালিকাই নয়-উগ্র মুসলিম বিদ্বেষমূলক একটি সঙ্গীতকে 'জাতীয় সঙ্গীত' বলিয়া এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া চালু করা হইল। উহাই বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত। —[আবুল কালাম শামসুদ্দীন ঃ 'লীগ রাজনীতির ক্রমবিকাশঃ মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৫১]

এ 'বন্দেমাতরম'কে নিয়ে গোঁড়া হিন্দুদের যে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনা বিরল। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলা ও নিখিলেশের আত্মকথায় এ বিষয়ে অতি উৎসাহের সমালোচনা আছে। বুদ্ধিজীবী মহলের কেউ কেউ এ অসহিষ্ণু মনোবৃত্তির নিন্দাও করেছেন। যেমন,

হাইকোর্টের অন্যতম আইনজীবী মিঃ এন. এন. সরকার (এখন স্যার নৃপেনন্দ্রনাথ) এ উপলক্ষে সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বন্দেমাতরম' শীর্ষক যে সঙ্গীতটি আজকাল জাতীয় সঙ্গীতরূপে চালাইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে, উহাকে 'জাতীয় সঙ্গীত" বলা যাইতে পারে না। প্রথম যুক্তি এই যে, সঙ্গীতটির জন্ম মুসলিম বিদ্বেষ হইতে, বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠের' অন্যতম প্রধান 'সন্তান" ভবানন্দের মুখ দিয়া উহা গাওয়াইয়াছিলেন। এই সন্তানদের ব্রত ছিল 'নেড়ে মাতাল" দিগকে এদেশ হইতে 'মেরে তাড়ানো'। সুতরাং এই সঙ্গীতে মুসলিম বিদ্বেষের গন্ধ আছে। মিঃ সরকারের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, এই সঙ্গীত পৌত্তলিকতাপূর্ণ সুতরাং যে বাংলাদেশে শতকরা পঞ্চাশজন অধিবাসী একেশ্বরবাদী মুসলমান সে দেশের জাতীয় সঙ্গীতরূপে ইহাকে চালান যাইতে পারে না। —(কালস্রোতাঃ বুলবুলঃ ফাগুনঃ ১৩৪৩)

বঙ্কিম যে বিষবৃক্ষ হিন্দু মুসলমানের ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহা নিত্য নতুন ফল ফলাইতেছে। আজ যে হিন্দু মহাসভা মুসলমানকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দিতে ও মুসলমানকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে বলিয়া শাসাইতেছেন, সংকীর্ণমনা বঙ্কিমবাবুই তাহাদের দীক্ষাগুরু। তাহার কৃপাতেই আজ হিন্দু-মুসলমানের মিলনের মধ্যস্থলে যে সুবিশাল প্রাচীর অন্তরায় স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা ভেদ করা সুকঠিন। সুতরাং স্বরাজ লাভের আশাও দুরাশা মাত্র। —[সৈয়দ শামসুল ইসলাম ঃ 'আনন্দমঠ'ঃ 'আল ইসলাহ্' ঃ ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৪০ বাংলা]

স্বরাজ অবশ্যি পরে অর্জিত হয়েছে কিন্তু সে 'স্বরাজ' নয় যার স্বপ্ন অবিচেক হিন্দু কল্পনায় ধরা পড়েছিল, যার কথা ১৯৩১-সনের ২৩শে এপ্রিল বসুমতী সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন বলে 'আল ইস্‌লাহ' ঃ সিলেট, সম্পাদক (মরহুম) মুহম্মদ নুরুল হক উল্লেখ করেছেন।

ইতিহাসের পাতায় মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত যাহা আমরা দেখিতে পাই, তাহা অনেক স্থলেই নিতান্ত কলঙ্ক-কালিমাময়। এতদসংক্রান্ত কি দেশীয়, কি বিদেশীয় পুরাবৃত্তকারগণের গ্রন্থে তাহার সত্য সুচিত্র দেখিতে পাইবার আশা অতি কম। এ দেশীয় ইতিবৃত্তকারদিগের মধ্যে

এমনও সহৃদয় ব্যক্তি অনেকেই আছেন, যাঁহারা কোনরূপ বিদ্বেষ-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া লেখনী চালনা করেন নাই। তবে যাহারা নিতান্ত ইংরেজ জাতির স্তাবক, ইংরেজের লিখিত যাহা কিছু বেদবাক্যস্বরূপ গ্রহণ করেন, তাহারাই যে সেরূপ করিয়াছেন, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব। সেইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষায়-শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গস্তুতি-পরায়ণ এদেশী ঐতিহাসিকগণের লেখনী—মাহাত্ম্যে মুসলমান রাজত্বের অতি বিভীষিকাময় চিত্রপট অঙ্কিত হইয়াছে এবং আমরা এ কথাও বলিব যে, তাহা তাঁহাদেরই স্বকপোল কল্পনা নয়, তবে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের ছায়া ও তাহা তাঁহাদেরই স্বকপোল কল্পনা নয়, প্রতিকৃতি। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের কল্যাণে যে মুসলমান রাজত্ব-যুগের ইতিবৃত্ত নিতান্ত বিকৃত হইয়াছে, একথা এ দেশীয় বঙ্গভাষার ইতিবৃত্তকার মহাত্মা রজনী কান্ত গুপ্ত মহাশয়ই তাঁহার রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রকাশ করিয়াছেন—"আজ পর্যন্ত ভারতের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। কোন কোন সংকীর্ণ-হৃদয় বিদেশীর হস্তে পড়িয়া, ভারতের ইতিহাস অনেক স্থলেই কলঙ্কিত ও অনেক স্থলে অতিরঞ্জিত বা অ রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।" —(ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইংরেজ রাজত্ব)

মৃত মহানুভব ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও প্রায় এভাবে লিখিয়াছেন—"অনেক ইংরেজ গ্রন্থকার কখনও স্পষ্টাক্ষরে, কখনও ইঙ্গিতক্রমে বলিয়া থাকেন যে, মুসলমানেরা যখন দেশের রাজা ছিল, যখন হিন্দুদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিল। ইংরাজ গ্রন্থকারেরা এইরূপে হিন্দুদিগের মনোমধ্যে মুসলমানদিগের প্রতি একটি গূঢ় বিদ্বেষ-বীজ বপন করিয়া দিতেছেন। আধুনিক ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকদিগের হৃদয়ে, মুসলমান জাতি এবং মুসলমান ধর্মের প্রতি যতটা বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে, পূর্বকালের পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত, সদাচার-সম্পন্ন সদ ব্রাহ্মণদিগের মনে তাহার অর্দ্ধাংশও দেখা যাইত না।" -('সামাজিক প্রবন্ধ' জাতীয়ভাব-ভারতবর্ষে মুসলমান)

বিদেশীয় পণ্ডিতেরা, কি ঐতিহাসিকেরা, এ দেশীয় সম্রাটদিগের চরিত্রাঙ্কনে সেরূপ সহৃদয়তার কোন পরিচয় দেন নাই। এরূপও অনুমান হয়, তাঁহারা মুসলেম সম্রাটদিগের চরিত্রে কোন কোন স্থলে কলঙ্কারোপ করিতেও ইতস্ততা করেন নাই। এ দেশীয় হিন্দু শিক্ষিতেরা, মুসলমান সম্রাটদিগের চরিত্র কুৎসা রটনা করিতে গিয়া পাশ্চাত্যগণের অনুবর্তী হইয়াছেন। অনেকস্থলে কল্পনা প্রবণতার পরিচয় দিতে গিয়া, তিলে তালও করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে ভারতীয় মুসলমান-শাসন যুগ অনেকটা বিকৃতভাবে চিত্রিত হইয়াছে! এরূপ আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি কি?

"পাঠকদিগের এ কথাও স্মরণ করা উচিত, বিদেশীদের হাতে পড়িয়া এ দেশীয়দিগের গৌরব খর্ব না হইয়া পারে না। পাশ্চাত্যদেশবাসীরা সমস্ত বিষয়েই জয়পতাকা লাভের বড়ই ইচ্ছুক। এ দেশীয়রা বর্বর, অসভ্য, কৃষ্ণকায়; পাশ্চাত্য দেশবাসিরা সুসভ্য, দয়া, ধর্মশীল, শ্বেতকায়, আচার-পূত, এরূপ হাতে কলমের, বক্তৃতায়,একটা দৃঢ় বিশ্বাস, এ দেশবাসিদিগের অন্তকরণে অঙ্কিত করিতে তাহাদিগের চিরকালই প্রবল ইচ্ছা। এ বাসনা তাঁহাদের অনেকটাই পূর্ণ হইয়াছে। পাঠকগণ এ কথাও মনে রাখিবেন, যেখানে আমরা এ দেশীয় শিক্ষিতদিগকে 'ইংরেজ-স্তাবক' বলিয়াছি, তাহার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে, তাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিত, ইংরেজ, লেখকদিগের মতের অনুবর্তী এবং তাঁহাদের লিখিত বিবরণ-সে যাহাই হউক, এ দেশের ইতিহাস, কি লোকচরিত্র, কি অন্যান্য ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপার, -অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। এ দেশীয় ইতিহাস-সমালোচক যে দুই-একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির মতামতের বিষয় আমরা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে কিরূপ সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।"

"এরূপ কি অনুমান হয় না যে, ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা, এ দেশের ইতিহাস আলোচনায় পূর্ণ অধিকার পাইয়া, যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়াছেন: এ দেশে আইন ছিল না, কানুন ছিল না, সম্রাটের মুখের কথাই আইন, তিনি যেরূপ ইচ্ছা শাসন-দণ্ড পরিচালন করিয়াছেন, এরূপ একটা বিশ্বাস, মুসলমান সম্রাটদিগের বিরুদ্ধে, হিন্দুর মনে জন্মাইয়া দেওয়াই, তাঁহাদের প্রবল ইচ্ছা বলিয়া বোধ হয় নাকি?"

"এই সমস্ত আলোচনা হইতে একটা সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধ যে, ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা ইচ্ছা করিয়াই সেরূপ করিয়াছেন। কালক্রমে ইংরেজ জাতি এ দেশের রাজ-শক্তি লাভ করেন। রাজ-শক্তি লাভ করিয়া পূর্ববর্তী সম্রাটদিগের কুৎসা না গাহিতে পারিলে, শাসিতদিগের অন্তকরণে অধিক স্থান লাভ করা কিছু কষ্টকর হইয়া পড়ে। সেই জন্যই্য তাঁহারা এদেশীয়দের ইতিহাস, লোকচরিত্র ও ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারাদি ঐরূপ বিভিন্ন প্রকারে চিত্রিত করিয়াছেন।"

"অতএব (হিন্দু-খৃষ্টানদের লিখিত) ইতিহাসসমূহ গাঢ় মনোযোগপূর্বক পাঠ করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এ দেশীয় ইংরেজকৃত ইতিহাসে মুসলমান রাজত্বের অপবাদ কলঙ্ক কুৎসা রটনার সহিত ইংরেজদিগের জাতীয় স্বার্থ-সিদ্ধি সম্পূর্ণ রূপে জড়িত। দুঃখের মধ্যে দুঃখ, আক্ষেপের অধিক আক্ষেপ,এ দেশীয় শিক্ষিতেরা অনেকেই তেমন অনুসন্ধান না করিয়া, বিচার-আচারের ধার না দারিয়া ইংরেজ লিখিত 'খেউড় পাচাল' যাহা কিছু আপ্তবাক্যবৎ বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের আস্থা, তাঁহাদের নিষ্ঠা এমনই প্রবল যে, তাহা কিছুতেই বিচলিত হইবার নয়। আমরা সেই সমস্ত ইংরেজ-স্তাবক দলের কিছু করিতে পারিব, এমন ভরসা অতি কম।"

"এই সমস্ত হইতে অনুমান হয়, এ দেশবাসী পাশ্চাত্য-বিদ্যা-পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ, ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের বিদ্বেষ-বুদ্ধি-চালিত লেখনী-প্রসূত অনেক কথাই বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাস তাঁহাদের অটল এবং ইহাও বিবেচনা হয়, সেইরূপ বিশ্বাস পোষণের পক্ষে, তাঁহারা কোনরূপ বিচার আচারের ধার ধারেন নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিত, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা, অন্য জাতিদিগের গৌরব খর্ব করিতে যেন অধিক ভালবাসেন। তাহাদিগের নিকট অপর জাতীয়, বিশেষ দেশীয়দিগের গৌরব যেন নিতান্তই অসহ্য। তাহারা ঐশ্বর্যমুগ্ধ মুসলমানদিগের গৌরব খর্ব করিতে নিযুক্ত, এরূপ কেহ মনে করিবে না। মুসলমান ভিন্ন অন্য জাতিদের গুণ-গৌরব লইয়াও অনেকে ছিনিমিনি খেলিয়াছেন।—(বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান)"

"এই সম্পর্কে হিন্দু-মুসলিম সমাজ সংস্কারক মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ লিখেছেন ঃ হিন্দু জাতি উক্ত হইতে নিম্নশ্রেণীর গ্রন্থ লেখকগণ শতাধিক বৎসর পর্যন্ত পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও সমাজকে যত প্রকার কুৎসিত চিত্রে চিত্রিত ও পৈশাচিক বিশ্লেষণে আক্রমণ করিয়া আসিতেছেন কেহ তাহার ইয়ত্তা করিতে সক্ষম হইবেন? তাহারা সম্পূর্ণ অন্যায় ও বিদ্বেষ বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া অকারণে মুসলমানদিগকে যবন, ম্লেচ্ছ, পাষণ্ড, পাতকী, পাপিষ্ঠ, পাপাত্মা, দুরাত্মা, দুরাশয়, নরাধম, নরপিশাচ, বানর, নেড়ে, ধেড়ে, এঁড়ে, অজ্ঞান এবং অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি অসংখ্য কত আখ্যায় আখ্যায়িতপূর্ব, অসীম আনন্দ উপভোগ ও আত্মযোগ সমাধা করিয়া থাকেন, কিন্তু কে কোন মুসলমান কবে তাহাদের তাদৃশ ভোগের বাধা জন্মাইয়া শফরীর ন্যায় ফর-ফর করিয়াছেন? হিন্দু গ্রন্থকারগণ সম্পূর্ণ অলীক, আসার ও মিথ্যা কল্পনার আশ্রয়ে মুসলমান বিদ্বেষিতার যে সকল চূড়ান্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা সমস্ত একত্রিত করিলে কয়েকখানি বিরাট গ্রন্থেও সঙ্কুলান হইবে না। আমরা সেইগুলির নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি কথা মাত্র এই পুস্তকে উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইয়াছি: আশা করি সুবিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী তাহাতেই জ্ঞান গর্বিত, উচ্চশিক্ষিত, উদারমতি হিন্দু জাতির উদারতা ও ভদ্রাচারের বিশিষ্ট প্রমাণপ্রাপ্তে পরিতৃপ্ত হইবেন।

"হিন্দুর পরমারাধ্য ভঙ্গভাষা সৌন্দর্য সাধক, খ্যাতনামা সু-লেখক মৃত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "কৃষ্ণকান্তের উইল" নামক পুস্তকে কল্পনা বলে তাহার ওস্তাদজী দানেস খাঁ দ্বারা কথার শুনাইয়াছেন। তাহার 'রাজসিংহে মহাত্মা আকবর বাদশাহকে একটি যুবতী দ্বারা ঝাড়ু পিটা করাইয়াছেন এবং ধর্মাত্মা আওরঙ্গের বাদশাহ মুখে কতিপয় কল্পিত সখী বা স্ত্রীলোকে দ্বারা লাথি খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। "কবিতা পুস্তকে" মুসলমান জাতিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, আসে আসুক না আরবী বানর, আসে আসুক না পারশী পামর। আরবী ও পারশী মুসলমানেরা কি বাস্তবিক বানর ও পামর? লেখকের পূর্ব পুরুষগণ কি সেই বানর ও পামরদিগের দাসত্ব করিয়া কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত হন নাই? সেই কথা কি এতই সহজেই তিনি ভুলিয়া গেলেন। "কবিতা সংগ্রহ" নামক পুস্তকে প্রাচীন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, যথা ঃ

"বড় সব ধেড়ে দেড়ে ছাগল দেড়ে নেড়ে পানে রূকে, চোড়ে ঘাড়ে, কোলে দেয় হাড়ে হাড়ে ঢুকে। পশ্চিমে মিয়া মোল্লা, কাচা খোল্লা: তোবা তাল্লা বোলে, কোলে পোড়ে তোপে উড়ে, যাবে দল খোলে, কেবল মরজী তেড়া তেড়া কাজে ভেড়া নেড়া মাথা যত, নরাধম নীচ নাই নেড়াদের মত।"

দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ মহাশয় পবিত্র মুসলমান জাতিকে "দুরাত্মা দুরাচার, ধর্মজ্ঞানহীন, দুস্য, দুর্দ্দান্ত, ম্লেচ্ছ" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন। এহেন জ্ঞান সম্পন্ন মুসলিম বিদ্বেষীর প্রতাপসিংহ উপন্যাস পাঠ করলে চিন্তাধারার আভাস পাওয়া

যাইবে। বাবু যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়, টড্ সাহেবের রাজস্থানের অনুবাদে মুসলমানকে প্রাণ খুলিয়া গালি দিয়া শান্তি পান নই। তৎপ্রণীত বঙ্গানুবাদ রাজস্থান দেখুন। "জামাই বারিক" নামক পুস্তকে বাবু দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় মুসলমান ধর্ম, সমাজ, মোল্লা, পীর, এমন কি মুসলমান মহিলাদিগের প্রতি কিরূপ জঘণ্য ভাষা ব্যবহার ও নিচে জন্মোচিত বিদ্রূপ ঠাট্টা করিয়াছেন তাহাও একবার দেখুন,

"আল্লাহ আল্লাহ বলরে ভাই নবী কর সার। মাজা দুলায়ে চলে যাবা ভব নদী পার ॥ শুনরে ভাই বিবরণ, লবদ্বারে আছে জীবন, কখন যে পালাবে বলতে নাহি পারি ॥ কোরানেতে বয়েন আছে, দুনিয়াটা ক্যাবল মিছে, খোদার নাম বিনে জানবা সকলি ঝকমারি ॥ ধ্যানে বিকেলে দুপহরে গরু ছাগল সাথে করে, নামাজ পড়বা মনডা করে স্থির ॥ মানী লোকের রাখবা মান, গরীব লোককে করবা দান, দরগায় গিয়ে ফয়তা দিবা ক্ষির ॥ ঝুট বাতামে না দিবা দেল, সত্যসে বানাবা এক্কেল, ভক্তি ভাবে করবা পূজো বাপ মার চরণ। গোনা বরাবর নাইকো বিষ, ভজে দ্বিজ গোলাম নবীশ ॥ কত কীর্তি আছেরে ভাই কওয়া নাইকো যায় ॥ দেখ সাদীর সনে দোলার বিবি ডুলি চেপে যায় ॥ ওরে কদু কুমড়া বাকলে ফেলে তুচ্ছ নেবেল ব্যাল আজগবী দুনিয়ার খেলা সর্ষির মধ্যে ত্যাল ॥ মুসলমানের মোল্লারে হাদুর মধ্যে সাধু। কদু কুমড়া ছেড়ে দিয়ে আখের মধ্যে মধু। আসমানেতে ম্যাগের খেলা করে সিংহলাদ। রাত্রির বেলায় সূর্য উঠে দিনের বেলা চাঁদ ॥ রাত্রির বেলায় ভূতি ভয়ে ডরি ওঠে ছেলে। আর হুড়কো মেয়ে ঝমকে উঠে খসম কাছে এলে ॥ বিরহিনী বিবি আমার গো বাধে নাক চুল। কলজেতে ফুটছে বিবির পঞ্চবানের হুল ॥ সায়েরে গিয়েছে স্বামী হাবলী আঁধার করে। পরাণ জ্বলে গেল বিবির কোকিলের ঠোকরে ॥ মুখ ঘামছে বুক ঘামছে বিবির ভেসে যাচ্ছে হিয়ে। খসম যদি থাকত কাছে পুঁচতো নুমাল দিয়ে ॥ পিড়েয় বসে কাঁদছে বিবি ডুবি আখির জলে। মোল্লারে ধরেছে ঠেসে খসম খসম বলে ॥ ষাঁড়ের মাথায় সিং দিয়েছে, মানসের মাথায় কেশ। আল্লাহ বলরে ভাই পালা কল্লাম শেষ।"

প্রিয় পাঠক! পাচালীগুলি একটু ধীরভাবে আলোচনা করিলেই সভ্য, শিক্ষিত, জ্ঞানগর্বিত হিন্দু লেখকদিগের ন্যায় নিষ্ঠার জ্বলন্ত চিত্র দেখিতে পাইবেন। বিবি স্বামী বলিয়া মোল্লাকে ঠাসিয়া ধরিয়াছে, এরূপ জঘন্য ও পৈশাচিক আক্রমণ কি ক্ষমারযোগ্য? —হিন্দু ধর্মরহস্য ও দেবলীলা ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

এ সমস্ত অতীত ইতিহাসই আমরা আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। বর্তমান ইতিহাস পাঠকদের ইতিহাস জানতে হলে অতীত ইতিহাসকে অবশ্যই জানতে হবে। আমরা যদি মুসলিমবিদ্বেষী রবীন্দ্র, বঙ্কিম, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তসহ প্রাচীন-আধুনিক অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের সমালোচনার প্রতিবাদ করি, তখনই আমরা মৌলবাদী নামে আখ্যায়িত হই। মৌলবাদের সংজ্ঞা কি তারা এর মর্মার্থ না বুঝেই এক বকরীর তিন বাচ্চা, "দু'টি দুধ খায় একটি দেখে লাফায়" সে অবস্থার মত এদেরও অবস্থা। মুসলমানের সন্তানেরা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী এবং এটা যে একটা কুফুরী মতবাদ সে কথাটা ইতিপূর্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের শিখানো বুলি থেকে তারা দীক্ষা নিয়েছেন—এ সম্পর্কে কিছু আভাস দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এগুলো আমাদের চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে ইতিহাস সচেতনতারই অভাব। এজন্যই এরা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে মুসলমানের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে দ্বিধাবোধ করে না। আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তোজা সাহেব সেসব অতীত ইতিহাসের কাহিনী নতুন করে বর্তমান প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করেছেন। আমরা তাঁর এহেন শ্রমলব্ধ কর্মের প্রতি মোবারকবাদ জানাই।

বিনীত

মোহাম্মদ শামসুজজামান

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী

১৮/০৮/০৫ ঢাকা।

জাতির মূল্যায়ন ও বিস্তার

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ম্যাজিক ও ভোজবাজির দ্বারা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এও সম্ভব নয় যে জেলের ভয় ও বন্দুক দেখিয়ে সাম্প্রদায়িক মানুষকে সহজে অসাম্প্রদায়িক করে তোলা যাবে। যেখানেই সাম্প্রদায়িকতা আছে সেখানেই দুই সম্প্রদায় বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অজ্ঞতা, ভুল বোঝাবুঝি,সত্য অসত্য,ক্ষোভ বিদ্বেষ, অহংকার ঔদ্ধত্য মিলিত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিহিংসা থেকে দেখা যায় দাঙ্গা,খুনোখুনি, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা দূর করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে এইসব সমস্যার সমাধান করা দরকার। শুধুমাত্র প্রশাসনের চাপ অথবা কাগুজে আইনের ভয় দেখিয়ে তা সম্ভব নয়।

ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় অনেকের মতে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। যে কোন দেশে সংখ্যালঘু দুর্বলতর সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর উপর যদি সবলতর শক্তিশালী গোষ্ঠী অত্যাচার চালায় তাহলে সেটা আদৌ বাহাদুরি নয়, বরং তা চরম পর্যায়ের কাপুরুষতা। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, পাকিস্তানের মুসলিমরা যদি সেখানকার সংখ্যালঘু খৃষ্টান, ইহুদি, হিন্দু প্রভৃতি দুর্বলতর সমাজের উপর আঘাত হানে তাহলে সেটা বীরত্ব নয়, তা হবে কাপুরুষতা বা পশুত্ব মাত্র।

আমাদের ভারতে সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুন্ডা, ইহুদি ,পার্সি, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতি বা গোষ্ঠী রয়েছে। এই সবগুলো কিন্তু সমমান বা সমপর্যায়ের নয়। যেমন সবগুলোই যে সারা পৃথিবীর সব রাষ্ট্রে ছড়িয়ে আছে তা নয়। আবার তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র আছে তাও নয়। তাদের ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে অনেক রাষ্ট্রে মর্যাদা পেয়েছে তাও নয়। যেমন ভারত সংলগ্ন নেপাল ছাড়া পৃথিবীতে কোন হিন্দু রাষ্ট্র নেই। ভারত ছাড়া হিন্দি কোথাও রাজভাষা নয়। এক দল গবেষকের মতে সংস্কৃত ভাষার বিশ্বে কোন অস্তিত্ব নেই। কেননা এমন একটি পরিবারও নেই যে বাড়ির সদস্যরা সংস্কৃতে কথা বলেন। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা 'বজ্রকলম'এর প্রথম খন্ডে হয়েছে এবং প্রমাণ দেওয়া হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে।

খ্রীষ্টান ধর্ম বহু দেশে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া পৃথিবীর বহু দেশে খ্রীষ্টান জাতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিষ্ঠা নিয়ে টিকে আছে। ইহুদি জাতিও অন্ততঃ একটা নিজস্ব রাষ্ট্র যেকোন রূপেই পেয়ে গেছে। সেখানে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি-সভ্যতা বিদ্যমান।

মুসলমান জাতি কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজর কাড়ে। আজকের হিসেবেও মুসলিম রাষ্ট্রগুলো সংখ্যায় নেহাত কম নয়। যেমন সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমীরশাহী, কাতার, আফগানিস্তান, আলজিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, ইয়েমেন, ইরিত্রিয়া, উজবেকিস্তান, উগান্ডা, ওমান, আলবেনিয়া, কাজাকাস্তান, কমোরস, কিরগিজিস্তান, ক্যামেরুন, কুয়েত, গিনিয়া, গাম্বিয়া, গ্যাবন, গিনিবিসাউ, জর্ডন, চাদ, তাজিকিস্তান, জিবুতি, তানজানিয়া, তুরস্ক, তিউনিসিয়া, তুর্কমেনিস্তান, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, নাইজার, বসনিয়া, ব্রুনই, বাহরাইন, বাংলাদেশ, বুরকিনাফাসো, মরক্কো, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, মালী, মৌরিতানিয়া, মিশর, লিবিয়া, লেবানন, সিরিয়া, সেনেগাল, সুদান, সোমালিয়া, আজারবাইজান প্রভৃতি ৫২টি মুসলিম রাষ্ট্র সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উচুঁ করে। অজ্ঞতার কারণে আরবী ভাষাকে অখ্যাত বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের জানা দরকার যে, বর্তমানে একুশটি রাষ্ট্রের সরকারি ভাষাই হোল আরবী। এ সংখ্যা বেড়েই চলবে, কমে যাবার আশঙ্কা কম।

মুসলিম রাষ্ট্র নয়, এইরকম রাষ্ট্রেও স্থায়ী মুসলমান বাসিন্দা রয়েছেন। আজকের হিসাবে অস্ট্রেলিয়ায় অর্ধকোটিরও বেশি মুসলমান বাস করছেন। তাছাড়া নিউজিল্যান্ডে শতকরা ১জন, নরওয়েতে শতকরা ১০জন, নিউক্যালিডোনিয়াতেও ১০জন, সলোমন দ্বীপপুঞ্জে শতকরা ৪০জন, ফিজিতে শতকরা ৩৫জন, পাপুয়ায় শতকরা ৯০জন আর নিউগিনিতে শতকরা ৯৫ জন মুসলমান রয়েছেন।

উত্তর আমেরিকার কোস্টারিকা, জামাইকা, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকোতে মুসলমান বাসিন্দা আছেন প্রায় এক কোটির উপর। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ত্রিনিদাদ, গিয়েনা, সুরিনাম, ভেনেজুয়েলা এবং কলম্বিয়ায় মোট মুসলিম বাস করছেন প্রায় ৩০ লক্ষ।

আফ্রিকার সোয়াজিল্যান্ড, সিসিলি, সাওস্টোমি ও প্রিন্সিপিতে মুসলমান রয়েছেন প্রায় একলক্ষ। মরিশাস, কঙ্গো, নামিবিয়া ও লিসোথোতে মুসলমান বাস করছেন প্রায় ৭লাখ। লাইবেরিয়া, জাম্বিয়া, জাইরি ও দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমান বাস করছেন প্রায় ৩০ লাখ। রোয়ান্ডা, মাদাগাস্কার, বুরুন্ডি, টোগো এবং জিম্বাবোয়েতে এক কোটিরও বেশি মুসলমান বাস করছেন। আঙ্গোলা, বেনিন, মালাবি ও ঘানাতে বসবাস করছেন প্রায় এককোটি ষাট লক্ষ মুসলমান। মোজাম্বিক, শিরোলিয়ান, আইভরিকোস্ট ও কেনিয়াতে বাস করছেন প্রায় ২ কোটি ৭০ লাখ মুসলিম।

ইওরোপে দৃষ্টি দিলে দেখা যাচ্ছে ফ্রান্স, জার্মানী ও বুলগেরিয়ায় মুসলমান বাস করছেন প্রায় পঞ্চাশ লাখ। ফিনল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া ও ডেনমার্কে মুসলমান বাস করছেন এক

লক্ষেরও বেশি। মাল্টা, স্পেন ও হল্যান্ডে বসবাস করছেন প্রায় ৬ লক্ষ মুসলমান। চেকোস্লোভাকিয়া, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম ও হাঙ্গেরিতে মুসলমান বাস করছেন প্রায় ৯ লক্ষ। নরওয়ে, গ্রীস, সাইপ্রাস ও রুমানিয়াতে দশ লক্ষেরও বেশি মুসলমান বাস করছেন। পোল্যান্ড, ইতালি ও বৃটেনে মুসলমান বাস করছেন যাঁরা তাঁরা সংখ্যায় ২২ লক্ষেরও বেশি।

একইভাবে এশিয়ায় তাকালেও দেখা যাচ্ছে, নেপালের মতো ছোট্ট দেশেও মুসলমান ৭ লক্ষ। কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও তাইওয়ানে প্রায় ২৮ লাখ মুসলিম বাস করেন। শ্রীলঙ্কাতে মুসলমান বাস করছেন প্রায় ১৫ লাখ। কাম্পুচিয়া, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে প্রায় ১ কোটি ৮৫ লাখ মুসলিম স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। ফিলিপাইনে বাস করছেন পৌনে এক কোটি মুসলিম। রাশিয়ায় মুসলমান বাসিন্দা রয়েছেন ৩ কোটি। চিনে মুসলমানের সংখ্যা ৮ কোটি, বেসরকারি মতে ভারতে মুসলমান বাস করছেন ২০ কোটিরও বেশি। [তথ্য : The Reader's Digest Great World Atlas London, The Muslim World, New Delhi, মুসলিম জাহান : অতীত ও বর্তমান, কলকাতা, ১৯৯৬]

ভারত এবং বহির্ভারতে ধর্মাচার

গোটা বিশ্ব জুড়ে এই বিশাল মুসলিম জাতির বিশ্বাস যে, কোরআন শরীফ আল্লাহর বাণী এবং হাদীস শরীফ তাদের শ্রেষ্ঠতম নবী হজরত মুহাম্মাদের (স) কোরআন কেন্দ্রিক উপদেশ। তাদের উপাস্য ও উপাসনা নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে খুবই ছোটখাটো বিষয়ে সামান্য ছিটেফোঁটা কিছু মতভেদ থাকলেও মৌলিক বিষয়ে প্রত্যেক দেশ-মহাদেশের মুসলমান একমত। যেমন মসজিদে নামাজের পূর্বে উচ্চ স্বরে আজান দেওয়া, মক্কার কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ পড়া, নামাজের পূর্বে ওজু করা, ইমামের নেতৃত্বে নামাজ শেষ করা, মৃত্যু হলে স্নান করিয়ে কাফন পরিয়ে মাটিতে কবর দেওয়া, সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার কানে আজানাদি পৌঁছে দেওয়া, পুত্রসন্তানের খত্না দেওয়া, চাঁদের হিসাবে রোজা শুরু করা এবং চাঁদ দেখে দুই ঈদ পালন করা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সারা বিশ্বের এই কোটিকোটি মুসলমানের একই গন্ডির মধ্যে থাকাটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এমনিভাবে আকিকা বা নামকরণের ব্যাপারেও সর্বজনীন প্রথা প্রচলিত। বিবাহ পদ্ধতি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, হজরত মুহাম্মাদের (স) সময় থেকে নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে কাদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ এবং কাদের সঙ্গে অবৈধ। দুজন সাক্ষী নির্ধারণ করে দেনমোহর ঠিক করে উভয়কে প্রস্তাব দেওয়া এবং তাদের স্বীকৃতি নেওয়ার নামই হোল ইসলামী বিবাহ।

মুসলমানদের পর্ব বলতে ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া সাপ্তাহিক জুমআর নামাজ ও রাতে দিনে পাঁচবার নামাজের প্রথাও একই ভাবে চলমান। সমাজে কে কতটা ধর্ম মানল বা মানল না সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। কোন নেতা বা গোষ্ঠী মনে করেন না যে, ফরজ নামাজ পাঁচবারের পরিবর্তে চার বা সাতবার। কেউই মনে করেন না যে, রোজা ৩০ দিন নয়, বরং ২০ বা ৪০ দিন। পৃথিবীর কোন মুসলমানই মনে করেন না যে, তিনি তাঁর মৃত আত্মীয়কে কবরের পরিবর্তে দাহ করবেন।

খাদ্য হিসাবে আমিষ নিরামিষ দুইই মুসলিমদের কাছে বৈধ। আমিষ হিসাবে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান একই নিয়ম মেনে চলেন। অর্থাৎ হিংস্র পশু যেমন বাঘ, সিংহ, গন্ডার এবং হিংস্র পাখি যেমন চিল, শকুন, বাজ প্রভৃতি খাওয়া নিষিদ্ধ। গৃহপালিত পশুর মধ্যে নিষিদ্ধ মাংস হোল শুয়োর, কুকুর এবং বেড়াল প্রভৃতি। কেউ আজ পর্যন্ত এই গন্ডি ভাঙেন নি, ভাঙতে চেষ্টাও করেন নি শুধু নয়, ভাঙার প্রয়োজনই মনে করেন নি।

মুসলমান জাতিকে বাদ দিয়ে ভারতে হিন্দু জাতি বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁদের কাজকর্ম খাদ্যাভ্যাস, উপাস্য ও উপাসনা পদ্ধতি, মৃতের সৎকার বা বিবাহ পদ্ধতি একসূত্রে বাঁধা নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডক্টর অতুল সুর (এম.এ., ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট) লিখেছেন : "ঋগ্বেদের সপ্তম মন্ডলে (৭/২/৫) বর্ণিত 'সমন' উৎসবের অনুষ্ঠান থেকে সায়ন 'সমন' শব্দের যে ভাষ্য দিয়েছেন তা থেকে মনে হয় 'সমন' উৎসবটা অনেকটা আজকের দিনের অলিম্পিক উৎসবের মত।" এই উৎসবে, লেখক জানিয়েছেন, "যুবতী মেয়েরা মনোমত পতিলাভের আশায় সুসজ্জিতা হয়ে যোগদান করতো। এছাড়া বারাঙ্গনাগণও ধনলাভের আশায় সেখানে উপস্থিত থাকতো। সমস্ত রাত্রিব্যাপী এই উৎসব চলতো।" লেখক আরও লিখেছেন, "বৈদিক যুগের বিবাহ সম্বন্ধে আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, নবপরিণীতার বিবাহ কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে হোত না, তার সমস্ত সহোদর ভ্রাতাদের সঙ্গেই হোত। অন্ততঃ আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রের যুগ পর্যন্ত এই রীতি প্রচলিত ছিল। কেননা, আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, কন্যাকে দান করা হয় কোন এক বিশেষ ভ্রাতাকে নয়, বংশের সমস্ত ভ্রাতাকে।" [ভারতের বিবাহের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২২-২৩]

"ঋগ্বেদে এবং অথর্ব বেদে এমন কয়েকটি স্তোত্র আছে যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যদিও বধূকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই বিবাহ করতো তাহলেও তার কনিষ্ঠ সহোদরগণেরও তার উপর যৌন মিলন বা রমণের অধিকার থাকতো। এই দুই গ্রন্থেই স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে 'দেবৃ' বা দেবর বলা হয়েছে। এই শব্দদ্বয় থেকেও তা সূচিত হয়। কেননা 'দেবর' মানে দ্বিবর বা দ্বিতীয় বর।"

"বহুপত্নী গ্রহণও মহাভারতীয় যুগে বেশ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ... মহাভারতে একস্থলে উল্লিখিত হয়েছে যে, কৃষ্ণের ১০১৬ স্ত্রী ছিল। আবার অপর স্থলে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণের ১৬০০০ স্ত্রী ছিল। মহাভারতে আরও উল্লিখিত হয়েছে যে, রাজা সোমকের একশত স্ত্রী ছিল। ...পান্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহই একমাত্র বহুপতি গ্রহণের দৃষ্টান্ত নয়। কালান্তরে গৌতম বংশীয়া জটিলা সাতটি ঋষিকে একসঙ্গে বিবাহ করেছিলেন। আবার বার্ক্ষী নামে এক ঋষিকন্যা একসঙ্গে দশ ভাইকে বিবাহ করেছিলেন। ... দ্রৌপদীর বিবাহকালে ব্যাস বলেছিলেন, 'স্ত্রী লোকের পক্ষে বহুপতি গ্রহণই সনাতন ধর্ম।' ধর্মসূত্র সমূহেও এর উল্লেখ আছে।"

"বিবাহের পূর্বে মেয়েদের যৌনসংসর্গ মহাভারতের যুগে অনুমোদিত হোত। বোধহয় আগেকার যুগেও হোত। কেননা ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা দেখতে পাই যে, মহর্ষি সত্যকামের মাতা জবালা যৌবনে বহুচারিণী ছিলেন। ... কুন্তীও কুমারী অবস্থায় সূর্যের সঙ্গে মিলনের ফলে পুত্র কর্ণকে প্রসব করেছিলেন।"

ডঃ অতুল সুর লিখেছেন, "রামের বিবাহ যে ভগিনী সীতাদেবীর সঙ্গে হয়েছিল তা দশরথ জাতকেও উল্লিখিত হয়েছে। ... স্বামী যদি বিদ্যা অর্জনের জন্য দেশান্তরে যায় তাহলে স্ত্রী দশ বা বারো বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি সেই স্ত্রী স্ববর্ণ কোন ব্যক্তি হতে পুত্র লাভ করে তাহলে তার অপবাদ বা দন্ড হবে না।" [দ্রষ্টব্য : ডঃ সুর : পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩]

"মেগাস্থিনিস তক্ষশীলায় যে প্রচলিত প্রথা থাকতে দেখেছিলেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, যাঁরা দারিদ্রের জন্য কন্যাকে সুপাত্রে দিতে পারেন না, তাঁরা যুবতী কন্যাদের হাটে নিয়ে গিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে জনতার সমাবেশ করান। যখন মধ্য থেকে কেহ বিবাহ ইচ্ছুক হয়ে এগিয়ে আসে, তখন কন্যাকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করে তাকে নিরীক্ষণ করতে দেওয়া হয়। প্রথমে সে কন্যার পশ্চাৎভাগ নিরীক্ষণ করে, পরে নিরীক্ষণ করে তার সম্মুখভাগ। যদি কন্যাকে তার পছন্দ হয় তাহলে উপযুক্ত পণ দিয়ে সে তাকে নিয়ে যায় এবং স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করে।"

শাস্ত্রকাররা বলে গেছেন যে; বালিকাদের ঋতুস্রাব হবার পূর্বে বিয়ে দিতেই হবে। ডক্টর সুর লিখেছেন, "কুমারী অবস্থায় কন্যা যতবার রজঃস্বলা হবে ততবার তার পিতামাতা ও অভিভাবকদের ভ্রূণ হত্যার পাপে লিপ্ত হতে হবে।" [দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃ. ৪৬]

অধ্যাপক সুর আরো লিখেছেন, "নরক থেকে পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করার জন্য পুত্র উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার উপর স্মৃতিকাররা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই কারণে বিবাহিত জীবনে যদি সন্তান উৎপন্ন না হয়, কি নিঃসন্তান অবস্থায় যদি কেহ মারা যায়, তাহলে তার স্ত্রী বা বিধবার 'ক্ষেত্রে' অপরের দ্বারা সন্তান উৎপাদনের বিধান স্মৃতিকাররা দিয়েছেন। এই ব্যবস্থাকে 'নিয়োগ' প্রথা বলা হোত। 'নিয়োগ' আর কিছুই নয়, স্বামীর পরিবর্তে কোন নিযুক্ত ব্যক্তিকে উৎপাদকরূপে গ্রহণ করা। ... 'নিয়োগ' প্রথানুযায়ী মাত্র এক বা দুটি সন্তান পর্যন্ত উৎপন্ন করা যেত, তার অধিক নয়। মনু এবং গৌতম মাত্র দুটি সন্তান উৎপাদনেরই অনুমতি দিয়েছেন।"

লেখক আরো লিখেছেন, "সন্তান প্রজননের জন্য স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে অপরের হস্তে সমর্পণ করা কলিযুগে নিষিদ্ধ হয়েছে।" ডঃ সুর লিখেছেন, "বৌধায়ন ও মনু উভয়েই ব্যভিচারীর জন্য মৃত্যুদন্ড ব্যবস্থা করলেন। আপস্তম্ভ বললেন যে, ব্যভিচার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুরুষাঙ্গ ও অন্ডকোষ কর্তন করে শাস্তি দেওয়া হবে এবং যদি সে কোন অনূঢ়া কন্যার সঙ্গে ব্যভিচার করে থাকে তাহলে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তাকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হবে। ... ব্যভিচারীর শাস্তিস্বরূপ নারদ

যে দন্ডবিধান করেছেন তা হচ্ছে, ১০০ পণ অর্থদন্ড, সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, পুরুষাঙ্গ ছেদন ও মৃত্যু।"

গৃহস্থ স্ত্রী উল্লেখযোগ্য অতিথির কাছে নিজেকে নিবেদন করে তাঁকে সঙ্গ দিতে পারেন। লেখক ডঃ অতুল সুর উদাহরণ দিয়ে সুদর্শনের জন্য লিখেছেন, "স্ত্রী ওঘাবতীকে অতিথি সৎকারের কাজে নিয়োজিত করে তিনি তাকে আদেশ দেন যে, প্রয়োজন হলে ওঘাবতী যেন নির্বিচারে নিজেকেও অতিথির কাছে সমর্পণ করে। কেননা, অতিথি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কেউ নেই।"

এখানে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল, বিবাহ এবং ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা যাচ্ছে না; সব যেন একাকার হয়ে গেছে। মুসলমানদের বিবাহের ক্ষেত্রে কিন্তু সারা বিশ্বে একাধিক বা বহু পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নি বা হচ্ছে না। কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে ভারতে এমন গোষ্ঠী আছেন যাঁরা সাত দেবদেবীর পূজক, তাঁরা কখনোই তাঁদের মতো সাত দেবদেবীর পূজকদের ঘরে তাঁদের ছেলেমেয়ের বিয়ে দেন না। ছয় বা আট দেবদেবীর পূজকদের ঘরে তাঁরা সম্বন্ধ পাতান।

বারোদার রাজপুত ও লেওয়াকুম্বীরাদের মধ্যে নিজের গ্রামে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। উত্তরপ্রদেশের ভান্টুদের মধ্যে বিবাহের জন্য মাতামহীর কুলের দুই পুরুষ বর্জন করার রীতি বিদ্যমান। মধ্যপ্রদেশে একটি সম্প্রদায়ে মাতৃকুলের দুই পুরুষ বর্জন করার রীতিও চালু রয়েছে। মানভূমে শগরখড়িয়া ও পাহাড়িয়াখড়িয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ বৈধ নয়, যদিও তারা প্রায় একই গোত্রের।

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে সহোদরা, পিসতুতো ও মাসতুতো বোনকে বিয়ে করা অকল্পনীয় অর্থাৎ নিষিদ্ধ। কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশে মামাতো ও পিসতুতো বোনকে বিয়ে করাই প্রচলিত ও বৈধ রীতি। আবার তাদের খুড়তুতো জেঠতুতো বোনকে বিয়ে করা অবৈধ। মান্ডালা ও বালাঘাট অঞ্চলে পিসতুতো বোনকে বিয়ে করার প্রচলন আছে, মামাতো বোনকে মোটেই নয়। মুরিয়া হিন্দুদের মধ্যে পিসতুতো ও মামাতো উভয় বোনকেই বিয়ে করার রীতি আজও বিদ্যমান। মাদুরার হিন্দুদের মধ্যে মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ে হয়, কিন্তু পিসতুতো বোনের সঙ্গে নয়। কিন্তু কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুরে পিসতুতো বোনের সঙ্গে বিয়ে বৈধ হিসাবে প্রচলিত।

নীলগিরি পাহাড় অঞ্চলে একাধিক স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বৈধ রয়েছে। ত্রিবাঙ্কুরের মুথুবন, মল-পুলায়ন ও মল-আরয়নদের মধ্যেও বহুপতিকে বিয়ে করার নিয়ম বহুদিন ধরে চলে এসেছে। হিমাচল সীমান্ত প্রদেশের মধ্যেও বহুপতি গ্রহণ করার নিয়ম আজও অব্যাহত। টোডা সম্প্রদায়ের একজন মহিলা বহুপতি গ্রহণ করতে পারে। সেই মহিলা গর্ভবতী হলে গর্ভের সপ্তম মাসে স্বামীদের মধ্যে ধনুর্বাণ অনুষ্ঠান করে সেই গর্ভস্থ সন্তানের

পিতা নির্ধারিত হয়। কাশ্মীরের লাদাখ উপত্যকার হিন্দু মেয়েরা বহুপতি গ্রহণ করেন— "তাদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই বিবাহ করে, কিন্তু সেই বিবাহিতা স্ত্রী কনিষ্ঠ ভ্রাতাদেরও স্ত্রীরূপে পরিগণিত হয়।" [দ্রষ্টব্য : ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ডক্টর অতুল সুর, পৃষ্ঠা ১১৭]

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে বহুপতি গ্রহণ করার প্রচলন রয়েছে। হিমালয়ের পাদদেশে যৌনসর বেওয়া অঞ্চলেও বহুস্বামী গ্রহণের নিয়ম প্রচলিত। উত্তর ভারতে কেরালার নায়ারদের মহিলাদের একসঙ্গে বহুপতি গ্রহণ করার নিয়ম আছে। কেরালার স্বর্ণকার আশরী জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতি গ্রহণ করার নিয়ম আজও অব্যাহত।

মধ্যপ্রদেশের বেশ কিছু জায়গায় মেয়েদের বিয়ের বয়স হচ্ছে ১৫ থেকে ৪০। ত্রিবাঙ্কুরে একটি সম্প্রদায়ে ১৫ বছরের পূর্বে কখনো বিয়ে হয় না। কাশ্মীরের লাদাখ উপত্যকার মহিলারা যেকোন সময় স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পারে। সেটাই বিবাহ বিচ্ছেদ বলে গণ্য করা হয়। উড়িষ্যা পরোজাদের মধ্যে বিধবাকে বাধ্যতামূলকভাবে দেবরকে বিয়ে করতেই হয়। সেই বিধবা দেবরকে বিয়ে করতে অস্বীকৃত হলে অর্থদন্ড আদায় করে দেবরকে দেওয়া হয়। ত্রিবাঙ্কুরের আর একটি হিন্দু সম্প্রদায়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতার পক্ষে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করা বৈধ। আসামের একটি সম্প্রদায়ে জামাতা কর্তৃক বিধবা শাশুড়িকে বিবাহ করার রীতি প্রচলিত। আসামের আর একটি সম্প্রদায় তাদের পিতার মৃত্যুর পর সন্তান বিধবা বিমাতাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে। গঞ্জাম ও কোরাপুট জেলার একটি সম্প্রদায়ে বিধবা খুড়ী বা কাকীকে বিয়ে করার নিয়ম বৈধ। মধ্যপ্রদেশের একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবার যদি অনেকগুলি ছেলেমেয়ে থাকে তাহলে সে বিবাহ না করে অপর পুরুষের সঙ্গে যথেচ্ছ যৌন সঙ্গমে প্রবৃত্ত হতে পারে। উত্তর ভারতের হিন্দু সমাজে স্বগোত্রে কখনো বিবাহ হয় না। তামিলনাড়ুর ব্রাহ্মণদের মধ্যেও ঐ প্রথা প্রচলিত। কিন্তু পশ্চিম ভারতের মারাঠারা ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দু সমাজভুক্ত কোন জাতি ঐ বিধি অনুসরণ করে না।

স্বপিন্ডবিধি বিশেষভাবে প্রচলিত আছে উত্তরভারতে। এই বিধান অনুযায়ী স্বপিন্ডদের মধ্যে কখনো বিবাহ হয় না। স্বপিন্ড বলতে ঊর্ধতন ছয় পুরুষ এবং স্বয়ং— এই সাতপুরুষ। কিংবা পুত্র থেকে অধঃস্তন ছয়পুরুষ এবং স্বয়ং— এই সাতপুরুষ বোঝায়। [মনু ৫/৬০]

"অঙ্ক কষে দেখা গেছে যে, এই নিয়ম অনুসরণ করতে গেলে অগণিত সম্ভাব্য জ্ঞাতির সঙ্গে বিবাহ পরিহার করতে হয়। এজন্য বর্তমানে স্বপিন্ডবিধিকে সংক্ষেপ করে [সাতপুরুষের পরিবর্তে] তিন পুরুষে দাঁড় করানো হয়েছে।" [ঐ, ডঃ সুর, পৃঃ ১২২]

"কৌলিন্য প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল বাংলাদেশ ও মিথিলায়। ... বাংলাদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই প্রথানুযায়ী কুলীন গোষ্ঠীভুক্ত মেয়ের বিবাহ কুলীন গোষ্ঠীতে দেওয়া

একান্ত বাধ্যতামূলক ছিল। হীনতর মর্যাদাবিশিষ্ট গোষ্ঠীতে দিতে পারা যেত না। দিলে তাকে 'পতিত' হতে হোত। ... অনেক সময় বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কুলীন কন্যার বিবাহ হত না। এই কারণে কোন কোন স্থানে কৌলিন্য কলুষিত সমাজে শিশু কন্যা হত্যার প্রচলন ছিল। আবার কোন কোন স্থলে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে পাইকারি হারে বহু বিবাহ দ্বারা কৌলিন্যের কঠোর বিধান এড়ানো যেত। ... হিন্দু সমাজে সাধারণতঃ পাত্র অপেক্ষা পাত্রীর বয়স কম হয়। কিন্তু পশ্চিম বা দক্ষিণভারতে এই নিয়ম সবসময় পালিত হয় না। ... এরূপ ক্ষেত্রে বয়সের তারতম্যের দরুণ অসামঞ্জস্য দূর করবার জন্য ছেলের সঙ্গে মেয়ের বয়সের যত বছরের তফাত, মেয়ের বিয়ের সময় তার কোমরে তত সংখ্যক নারিকেল বেঁধে দেওয়া হয়।" [পৃ. ১২৪]

দক্ষিণভারতে বহু হিন্দুর মামা-ভাগ্নীর মধ্যে বিবাহ হয়। সেই বিয়েকে বলা হয় 'বাঞ্ছনীয় বিবাহ'। সিকিমে হিন্দুদের একটি সম্প্রদায়ে মাতৃকুলে বিবাহ হয়, কিন্তু পিতৃকুলে কখনো সম্ভব নয়। [পৃ.১২৫]

এলোমেলো এইসব নিয়ম কানুন ভেঙে চুরমার করার জন্য ১৯৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ আইন পাস হয়। যাতে 'এক পত্নীত্বই একমাত্র আইনসিদ্ধ বিবাহ বলে পরিগণিত হয়েছে'।

"স্বামীর মৃত্যুর পর জীবন্ত স্ত্রীকে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলপূর্বক বা মাদকদ্রব্য প্রয়োগের প্রভাবে) স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আহুতি দেওয়া হোত।" ১৮২৯ সালে রামমোহনের সময়ে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক আইন করে এটা বন্ধ করে দেন। বালিকা, কিশোরী ও যুবতীরা বিধবা হলে তাদের উপর কঠোর সংযমের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হোত, যা বহন করতে তারা অপারগ হোত—"এর ফলে সমাজে নানারূপ দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল।" এর বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা প্রথম খণ্ডে করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর "একাই রক্ষনশীল সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, তৎকালীন সরকারকে ১৮৫৬ সালের ১৫ নম্বর আইন বিধিবদ্ধ করতে প্রবুদ্ধ করলেন। এই আইন দ্বারা বিধবার বিবাহ বৈধ করা হোল।" অর্থাৎ যেটা হোল উনিশ শতকে, হজরত মুহাম্মাদ (স) সেটা করতে পেরেছেন ছয় শতকে, অর্থাৎ তেরশো বছর আগে।

"১৮৭২ সালের ৩ নম্বর আইন দ্বারা সবর্ণে বিবাহের বাধাও দূর করা হোল। তবে এই আইন অনুযায়ী বিবাহ করতে হলে, বিবাহেচ্ছু উভয় পক্ষকেই শপথ গ্রহণ করতে হোত যে, তারা হিন্দু নয়।" ফলে প্রেম প্রণয় রক্ষা করতে গিয়ে অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল। সুতরাং আবার এক নতুন আইন তৈরি হোল— "কিন্তু ১৯২৩ সালের ৩০ নম্বর আইন দ্বারা বিধান দেওয়া হোল যে, অহিন্দু বলে ঘোষণা না করেও অসবর্ণ বিবাহ করতে পারা যাবে।" [পৃ. ১৩১]

কিন্তু ইসলাম ধর্মে, সারা বিশ্বের প্রত্যেক নারী পুরুষ বয়সে ছোট বড় যাই হোক একে অপরকে বিয়ে করতে পারে; শুধুমাত্র কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী নিষিদ্ধ ব্যক্তি ছাড়া। যেমন কোন মুসলিম বিয়ে করতে পারেন না আপন মা, বোন, বৈমাত্রেয় বোন, আপন মাসী-পিসী, পিতামহী, মাতামহী, শাশুড়ী এবং তার উর্ধ্বতন মহিলাগণকে। তাছাড়া আপন ভাগ্নী-ভাইঝি, বিধবা পুত্রবধূ, কন্যা, স্ত্রীর অপরপক্ষ বা পূর্বপক্ষের কন্যা, একসঙ্গে দুইবোন এবং দুধবোন প্রভৃতিকেও বিয়ে করা নিষিদ্ধ। বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের প্রত্যেকটি মুসলিম আজও এটা সহজভাবে মেনে আসছেন।

ভগবান মনুর বিধান ছিল বিবাহের জন্য মেয়ের বয়স হবে ৮ আর ছেলের হবে ২৪। কিন্তু ইসলামী বিধান হোল, নাবালক এবং নাবালিকার বিয়ে তাদের পিতামাতা বা অভিভাবকরা দিতে পারেন। কিন্তু কন্যা বা পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর তারা ওটা মানতেও পারে আবার অমান্য করতেও পারে। সেটা তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়।

১৯৪৯ সালের ২১ নম্বর আইন দ্বারা বিবাহ ক্ষেত্রে জাতিগত বর্ণগত শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত যতরকম বাধাবৈষম্য ছিল তা দূর করা হোল; ইসলামে যেটা হজরত মুহাম্মাদ (স) ৬০০ খৃষ্টাব্দের পরেই করে দিয়ে গেছেন। "বলাবাহুল্য, গত দেড়শ বৎসর যাবৎ সরকার চেষ্টা করেছেন আইন প্রণয়ন দ্বারা হিন্দু বিবাহকে নূতন মর্যাদা দিয়ে বিবাহিতা নারীর স্বার্থরক্ষার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিবাহিতা হিন্দু নারী আজও সামাজিক বা পারিবারিক নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে নি। সংবাদপত্রে প্রত্যহ বধূ নিধনের যে সকল সংবাদ বেরুচ্ছে, তা থেকে প্রমাণ হয় যে, সমাজ থেকে পণপ্রথা ঘটিত পাপ অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা এখনও দূরীভূত হয় নি। আজও মেয়েরা পণের বলি হয়ে রয়েছে। তাছাড়া, মধ্যযুগের বর্বর 'সতী' প্রথাকে আবার জাগিয়ে তোলা হচ্ছে।" [ডঃ অতুল সুরের ঐ বই, পৃ. ১৩৫]

ইসলাম ধর্মে বৎসরের যে কোন দিন বা রাত্রিতে বিবাহ বৈধ। কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। আবার হিন্দু ধর্মীয় এই আইন হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছেলে মেয়েরা মেনে নিতে পারছেন না। লাভ ম্যারেজ বা প্রয়োজনীয় আকস্মিক বিবাহের ক্ষেত্রে লগ্ন উপেক্ষা করে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নেন তাঁরা। বঙ্গদেশে বিবাহ হয় বৈশাখ, জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে। বাকী পাঁচ মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। আবার কোন কোন প্রদেশে প্রত্যেক বছর বিবাহ হয় না। নয়, দশ বা এগারো বছর অন্তর কোন্ বছরে বিয়ে হবে তা ঠিক করে দেন জ্যোতিষীরা। বরোদা ও মধ্যপ্রদেশে একাধিক সম্প্রদায়ের বিবাহ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে হয়। এখানেও জ্যোতিষীরা নয় দশ বা এগারো বছর অন্তর বিবাহের বছর নির্দিষ্ট করেন। এরূপভাবে দীর্ঘকাল অন্তর বিবাহের দিন নির্দিষ্ট হয় বলে সকল পরিবারই মেয়ের বয়স নির্বিশেষে পরিবারের সকল অবিবাহিতা

মেয়েদের ঐ নির্দিষ্ট দিনে পাত্রস্থ করে। এমনকি গর্ভস্থ মেয়েরও বিয়ে দেওয়া হয়। যদি গর্ভস্থ সন্তান মেয়ে হয় তাহলে বিয়ে বৈধ হোল, আর ছেলে হলে বিয়ে বাতিল হয় স্বাভাবিকভাবেই। আবার বিয়ের বছরের ঐ নির্দিষ্ট দিনে যদি পাত্র না পাওয়া যায় তাহলে ঐ কুমারীর বিয়ে একগুচ্ছ ফুলের সঙ্গে দেওয়া হয়। পরে পাত্র পাওয়া গেলে ঐ ফুলের গুচ্ছটিকে কোন কুয়োর মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় এবং সেই পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া হয়। [পৃ. ১৩৬]

বরোদার একটি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহের নির্দিষ্ট দিন ১২, ১৫ বা ২৪ বছরের ব্যবধানে ঠিক করা হয়। মধ্যপ্রদেশের আগারিয়া হিন্দুদের পাঁচ-ছয় বছর অন্তর বিয়ের দিন ঠিক করা হয়। ঐ দিনে পরিবারের সব ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। মাদ্রাজের চেট্টি হিন্দুদের বিবাহের দিন ১০ বা ১৫ বছর অন্তর ঠিক হয়। গঙ্গা ও গোদাবরীর অন্তর্বর্তী ভূভাগে ১২ বছর অন্তর সিংহ রাশিতে যখন বৃহস্পতির সংক্রমণ হয় তখন বিবাহ ও অন্যান্য ধর্মকর্ম বন্ধ রাখা বাধ্যতামূলক।

পাঞ্জাবের বিবাহ অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে 'ফেরে' বা যজ্ঞকুন্ড প্রদক্ষিণ করার নিয়ম আছে। কিন্তু উত্তর প্রদেশের বহু জায়গায় ঐ নিয়ম নেই। সেখানে একটি মন্ডপ নির্মিত হয় ও স্থাপিত হয় একটি দন্ড— সেটাকেই প্রদক্ষিণ করা হয়।

বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় কন্যার সিঁথিতে 'সিঁদুরদান' বাধ্যতামূলক প্রথা। আবার অনেক জায়গায় কাঁটার সাহায্যে আঙ্গুল থেকে রক্ত বের করে পাত্রপাত্রী একে অপরকে মাখিয়ে দেয়। মহারাষ্ট্রে প্রদক্ষিণ প্রথা প্রচলিত। আর ঐ মহারাষ্ট্রেই আর একটি শ্রেণী বরকনের উপর চাল জল ও দুধ ছিটিয়ে দেয়। আবার দক্ষিণ ভারতের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'তালিবন্ধন' প্রথা বিবাহের অপরিহার্য অঙ্গ।

বঙ্গদেশে বিবাহ হয় রাত্রে। আবার তামিলনাড়ুতে বিবাহ হয় মধ্যাহ্নের পূর্বেই। দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রই বিবাহ অনুষ্ঠানের মূল হোল তালিবন্ধন, আমাদের দেশে সিঁদুরদান, কোন কোন স্থানে 'জোয়াল পূজা'; অর্থাৎ বর ও কনের কাঁধের উপর জোয়াল চাপিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, পাত্রপাত্রী 'জোয়ালগ্রথিত বলদের ন্যায়' যুক্তভাবে সুখদুঃখের সমান অংশীদার। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে বিবাহ একদিনেই শেষ হয়ে যায়। হরিয়ানায় কিন্তু দুদিন লাগে বিয়ে হতে। [পৃ. ১৩৭-৩৮]

প্রত্যেক মুসলিমের মসজিদে প্রবেশের সমান অধিকার। যে কোন পংক্তিতে বা সারিতে তিনি দাঁড়াতে পারেন। ছোটলোক ভদ্রলোকের এই ব্যবধান সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে ডক্টর সুর লিখেছেন, "এমনকি ব্রাহ্মণেরা নিজেদের মধ্যে শুচিতা রক্ষার জন্য বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠল। এ সম্বন্ধে উত্তরপ্রদেশে প্রচলিত এক প্রবচন যথেষ্ট আলোকপাত করে। প্রবচনটা হচ্ছে— 'তিন কনৌজিয়া

তেরহ চুলি'। তার মানে, তিন কনৌজ ব্রাহ্মণ যদি একত্রিত হয় তাহলে তাদের শুচিতা রক্ষার জন্য তেরটা রন্ধনশালার প্রয়োজন হয়।" [পৃ. ১৭৫]

"হিন্দু সমাজে আমিষ ভোজন বিষয়ে ভবদেব ভট্টই প্রথম বিধান দিলেন। তার আগে বাঙালী ব্রাহ্মণ আমিষ ভোজনের জন্য উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণদের কাছে হেয় ছিল। ভবদেব ভট্ট বাঙালী ব্রাহ্মণের আমিষ ভোজনের বিধান দিলেও সেদ্ধ চাউল ও মুসুরির ডাল খাওয়ার অনুমতি দিলেন না। বাঙালী ব্রাহ্মণকে এই অনুমতি দিলেন পরবর্তী বিধানদাতা রঘুনন্দন। এরপর ব্রাহ্মণরা বিদেশি তরকারিও (আলু, কপি, টমেটো ইত্যাদি) খেতে আরম্ভ করল। উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণরা কিছুদিন তাদের গোঁড়ামি বজায় রাখল বটে, কিন্তু পরে তারাও এসব খেতে লাগল।" [পৃ. ১৭৮]

"মধ্যপ্রদেশে গোন্ড ও উড়িষ্যার কন্দ জাতির মধ্যেও আগুন জ্বেলে ধর্মানুষ্ঠান করতে দেখি এবং সেই আগুনের মধ্যে তারা জীবন্ত পশু নিক্ষেপ করে আহুতি দেয়। এইভাবে তারা নরমেধ যজ্ঞও করত।... মনে হয় পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মে যে সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল সেগুলি নবোপলীয়-তাম্রাশ্ম যুগের সন্ধিক্ষণেই দানা বাঁধতে শুরু করেছিল।" [পৃ. ২১৬-২১৭]

প্রথমখন্ডে আলোচনা করা হয়েছে যে, 'হিন্দু' শব্দটি, অনেকের মতে, চক্রান্তবাজদের আমদানি করা একটি শব্দ। কারণ হিন্দু বলে কোন অবতার ছিলেন না। বেদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারতেও 'হিন্দু' শব্দের উল্লেখ নেই। কী করলে হিন্দু হওয়া যায় আর কী করলে হিন্দু ধর্ম থেকে বেরিয়ে যায় সে আলোচনাও প্রথম খন্ডে হয়েছে। ডক্টর সুরও লিখছেন, "এ সম্বন্ধে J.H.Hutton-এর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আদিবাসী সমূহ ব্রাহ্মণ পুরোহিত গ্রহণ না করে ও গরুকে পবিত্র জীব মনে না করে এবং হিন্দু মন্দিরে হিন্দু বিগ্রহের পূজার্চনা না করে ততক্ষণ তাদের হিন্দু বলে অভিহিত করা সঙ্গত নয়'।" [পৃ. ২২৭]

মৃতের সৎকার একটি বিশেষ কর্ম। মুসলমানদের মৃতদেহ সৎকার করার কথা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বের খ্রীষ্টানদের মধ্যে সমাধি দেওয়ার ব্যবস্থাই প্রচলিত। যাঁদের হিন্দু বলে ধরা হয় তাঁদের মৃতদেহ সৎকার করার পদ্ধতি সর্বজনীন বা এক বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। পূর্ববাংলা এবং পশ্চিমবাংলায় মৃতদেহকে দাহ করা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ে সমাধি দেওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে। কচি শিশু, কুষ্ঠ রোগী, বসন্ত রোগী ও আত্মহত্যাকারী মৃতদেহকে উত্তর-দক্ষিণে শায়িত করে সমাধি দেওয়া হয়। কিন্তু সাধু সন্তদের ক্ষেত্রে সমাধি দেওয়া হয় উপবিষ্ট অবস্থায়। বান্তার জেলার মারিয়াদের মধ্যেও মৃতদেহ পোড়ানোর রীতি আছে। মৃত ব্যক্তিকে দেহের পোষাক ও গহনাসহ তাঁকে দাহ করা হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবহৃত অস্ত্র ও প্রিয়

সামগ্রী কবরের মধ্যে দেওয়া হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্তের রেঙ্গমাগণ মৃতব্যক্তিকে কবরই দিয়ে থাকেন। কিন্তু সেই কবর একটু অন্য রকম। একখন্ড সমতল পাথর চাপা দিয়েই সমাধি দেওয়া হয়। আবার কিছু সম্প্রদায় মৃতদেহ সমাধিস্থ করার একবছর পর আবার সেই মৃতদেহ বের করে দাহ করে। একে বলে 'হাড়বোরা'।

আমাদের দিকে সাধারণতঃ সৎকারের কর্মী পুরুষই হয়ে থাকেন। কোন কোন সম্প্রদায়ে মহিলারাই মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যান এবং সৎকারে বিশেষভাবে অংশ নেন। চিতা জ্বলার একদিন একরাত্রি পর তাঁরা চিতাভস্ম ও অস্থি সংগ্রহ করে দেড় হাত মাটির গর্ত খুঁড়ে ঐ ভস্ম অস্থি ও মুরগীর ডিমের খোলা পুঁতে দেন। তার উপর শেষে একটি সমাধি কুটীর তৈরি করেন। সুতরাং অমুসলমান বা হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন সর্বজনীন সৎকার নিয়ম দেখা যাচ্ছে না।

বেদের দিকে তাকালে বৈদিক দেবতামন্ডলী যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রভাব আস্তে আস্তে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। তাঁদের মূর্তি তৈরি করে খুব ঘটা করে পূজার্চনা আর দেখা যায় না। যেমন দ্যৌস্ ও পৃথিবী, অদিতি ও আদিত্যগণ, অগ্নি, সূর্য, পূষণ, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊষা, ইন্দ্র, পর্জন্য, বায়ু, মরুৎ, সোম, ত্বষ্টা, যম, প্রভৃতি দেবতাগণ। পরে পৌরাণিক দেবতামন্ডলী আবির্ভূত হলেন। যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, কার্ত্তিক, গণেশ, বলরাম, হনুমান, নীল, গঙ্গা, তুলসী, অশ্বত্থ, নবপত্রিকা প্রভৃতি। তারপরে আবির্ভূত হলেন লোকায়ত দেবদেবী। যেমন শীতলা, মনসা, ইতু, রক্ষাকালী, মঙ্গলচন্ডী, মাণিকপীর, ধর্মঠাকুর, বাবাঠাকুর, সন্তোষী মা প্রভৃতি। দুর্গা, কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তিতে পূজা অর্চনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু ঋগ্বেদে এই নামগুলো নদী হিসাবে স্তুত হোত।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির এক বিজ্ঞপ্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে, তখন যেসব পর্বের দিনে সরকারি অফিস আদালত বন্ধ থাকতো আজকের পঞ্জিকায় বা সরকারি ছুটির তালিকায় দৃষ্টি দিলে তার অনেক তারতম্য লক্ষ্য করা যাবে। ১৭৮৭ সালে হিন্দু পার্বণ উপলক্ষে ছুটির দিনগুলো ছিল এইরকম— অক্ষয়তৃতীয়া ১দিন, নৃসিংহ চতুর্দশী ১দিন, জ্যৈষ্ঠ মাসের দশমী একাদশী ২দিন, স্নানযাত্রা ১দিন, পুনর্যাত্রা ১দিন, উত্থান একাদশী ২দিন, অরন্ধন ১দিন, দুর্গাপূজা ৮দিন, তিলওয়া সংক্রান্তি ১দিন, বসন্তপঞ্চমী ১দিন, অনন্তব্রত ১দিন, বুধনবমী ১দিন, নবরাত্রি ১দিন, অন্নকূট ১দিন, রাসযাত্রা ১দিন, অগ্রহায়ণ নবমী ১দিন, রটন্তী অমাবস্যা ২দিন, মৌনসপ্তমী ১দিন, ভীমাষ্টমী ১দিন, বাসন্তী পূজো ৪দিন, হোলি বা দোলযাত্রা ৫দিন, বারুনী ১দিন, চড়ক পূজা ১দিন, রামনবমী ১দিন, জন্মাষ্টমী ২দিন। এছাড়া সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের দিন ছুটি থাকতো। "গ্রহণের দিন লোকে হাঁড়ি ফেলে দিত, রান্নার জন্য আবার নতুন হাঁড়ি ব্যবহার করতো।" কিন্তু

আজকের দিনে মানুষ আর মাটির সস্তা হাঁড়ি ব্যবহার না করে এ্যালুমিনিয়াম, তামা, কাঁসা, স্টীল প্রভৃতি দামী ধাতুর রান্নার সরঞ্জাম ব্যবহার করেন বলে আর ফেলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

"বিংশ শতাব্দীর সূচনায় এসব পরবের অনেকগুলি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আবার অনেক নূতন পরব সৃষ্টি হয়েছিল।" 'যে সব পরব বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রতিপালিত হতে দেখেছি' বলে লেখক যে লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছেন তার কয়েকটি উল্লেখ করছি। যেমন হালখাতা, গন্ধেশ্বরীপূজা, জামাই ষষ্ঠী, গঙ্গাপূজা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, পুনর্যাত্রা, পৌষপার্বণ, চড়ক বা গাজন, ঘন্টাকর্ন বা ঘেঁটুপূজা। খোশপাঁচড়া থেকে বাঁচবার জন্য ঘেঁটু পূজার সৃষ্টি হয়। [তথ্য : ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, পৃ. ২৪৬]

বঙ্গদেশে সবচেয়ে ঘটা হয় দুর্গোৎসবে। কিন্তু বিহারে সবচেয়ে বড় উৎসব ছট। উত্তরপ্রদেশে বড় উৎসব হোলি, দশেরা বা রামলীলা। পশ্চিমভারতে দেওয়ালি আর দক্ষিণ ভারতে পোংগল।

কিছু গাছগাছালিও দেবতায় পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হোল অশ্বত্থ, বট, ধাত্রী, পলাশ, তুলসী, বেল, ধান, সিজমনসা, শ্যাওড়া, ঘেঁটু, দুর্বা, আমলকী, কুল, কলা, করমকদম, শাল, খেজুর, নিম, বাঁশ ইত্যাদি।

মুসলমানদের কিন্তু শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বে নামাজ, রোযা, ঈদ, ঈদুল আজহা, হজ প্রভৃতির সময় নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়। "ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথিকে 'নষ্টচন্দ্র' বলা হয়। ঐ দিন চাঁদ দেখা নিষিদ্ধ। কেননা পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী ঐ দিন চন্দ্র গুরুপত্নীকে ধর্ষণ করেছিল। ঐ দিন গৃহস্থের বাড়ী থেকে ফলমূল চুরি করার প্রথা আছে।" [পৃ. ২৬৭]

উত্তর ভারত ও বঙ্গদেশে রামসীতা বেশি সমাদর পান। দক্ষিণভারতে তার বিপরীত। সেখানে সুব্রহ্মণ্যদেবের সমাদর বেশি। বঙ্গদেশের গাজন ও চড়কের মত কোন উৎসব বহির্বঙ্গে দেখা যায় না। বিহারের ছটপূজাও অন্য কোথাও দেখা যায় না। আমাদের দেশে বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে বাংলার হালখাতা বা ইদানীং নববর্ষ উৎসব হয়। কিন্তু উত্তরভারতে তা হয় না। উত্তরভারতে ঐ দিনে হয় ধ্বজারোপণ নামে এক উৎসব। ঐ উত্তরভারতে বৈশাখ মাসে রামনবমী পালন করা হয়।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী বলা হয়। সেইজন্য উঠানে মনসাগাছ পুঁতে সাপের পূজো করা হয়। মনসা গাছের দুপাশে গোবর দিয়ে সাপের মূর্তি তৈরি করা হয়। আবার কোন কোন স্থানে জীবন্ত সাপের পূজো করা হয়। দাক্ষিণাত্যে অঘ্রাণ মাসে শুক্লা পঞ্চমীতে নাগপূজা হয়। কোন কোন স্থানে ঐ পূজো শ্রাবণ মাসে হয়। কোথাও জ্যৈষ্ঠমাসেও হয়।

উত্তরভারতে শ্রাবণী পূর্ণিমায় 'রাখীবন্ধন' একটি বড় উৎসব। বাংলায় ঐ সময় শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রার ব্যবস্থা আছে। আবার পশ্চিমভারতে ঐ দিনটিকে নারকেল পূর্ণিমা বলা হয়। সেদিন সমুদ্রপূজার ব্যবস্থা আছে।

ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীতে বঙ্গদেশে কোন পূজো হয় না। কিন্তু মহারাষ্ট্রে ঐ সময় সবচেয়ে বেশি সমারোহের সঙ্গে পূজো হয়। বঙ্গদেশে দুর্গাপূজোর যেমন ধূমধাম, মহারাষ্ট্রে গণেশ পূজোরও সেইরকম ধূমধাম। গণপতির ভাসানও হয়। বঙ্গদেশে যখন দুর্গাপূজার ধূম চলে উত্তরভারতে সেইসময় নবরাত্রি, রামলীলা ও দশেরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আবার দক্ষিণভারতে ঐ সময় কোথাও কোথাও সরস্বতী ও আয়ুধ পূজা হয়। বঙ্গদেশে দুর্গাপূজার পরের অমাবস্যাতে সাড়ম্বরে কালীপূজা হয়। কালীপূজার দিন দীপমালায় গৃহ সজ্জিত করা হয়। আনন্দ করা হয় আতসবাজি করে। ঐ সময় পশ্চিমভারতের লোকেরা ঐ রাত্রিকে বিশেষ আনন্দ উৎসব মনে করে রাত্রি জাগরণ করেন এবং জুয়ো খেলায় মত্ত হন। জুয়োর হারজিতের উপর পরের বছরটা কেমন যাবে তা নির্ধারিত হয়। [পূর্বোক্ত, পৃ.২৮৮]

বঙ্গদেশে ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানে শাস্ত্রের নির্দেশ এই যে, এ দিন বোনেরা যম যমুনা প্রভৃতির পূজো করে ভাইকে খাওয়াবেন এবং বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুল দিয়ে ভাইকে চন্দন ও মাঙ্গলিক দ্রব্যের ফোঁটা দিয়ে বলেন : 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।' বিহারে এইদিনে দোয়াত ও চিত্রগুপ্তের পূজো করা হয়। মাঘমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে বঙ্গদেশে সরস্বতী পূজো হয়। এটা পড়াশোনা বন্ধ রাখার দিন। পশ্চিমবঙ্গে এই দিন থেকে কুল খাওয়া আরম্ভ হয়। আর এদিন নিরামিষ খিচুড়ি খাওয়া অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এই তারিখে কুলের পরিবর্তে ইলিশ মাছ খাওয়া শুরু হয়। আগেকার দিনে অনেকক্ষেত্রে সরস্বতী পূজোর দিন পড়াশোনা বন্ধ রাখা হোত না, ঐ দিনেই পড়াশোনার হাতেখড়ি হোত। সরস্বতী পূজোর দিন মিথিলা ও উত্তর বিহারে লাঙল পূজোর রীতি প্রচলিত।

বর্তমানে দুর্গাদেবীর ভাবমূর্তি সকল দেবদেবীর উর্ধ্বে। হিন্দু সভ্যতা বলে যেটি বেলুনের মত ফুলিয়ে সামনে রাখা হয়েছে এটির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে মিশে আছে বৃটিশদের বা বিলেতি সাহেবদের ধাপ্পাবাজির চক্রান্ত। বেদ, আর্য, সংস্কৃত ভাষা, শিলালিপি, মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি বা এশিয়াটিক সোসাইটির অনেক গোপন তথ্য প্রমাণ সহকারে এই বইয়ে প্রথম খন্ডে লেখা হয়েছে।

আজকাল আধুনিক সাহসী অনেক লেখক সত্য তথ্য প্রকাশ করতে এগিয়ে এসেছেন ও আসছেন। ১৯৯১ সালের আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা ক্রোড়পত্রে 'দুগ্গা বৈ গতি নাই' প্রবন্ধে প্রখ্যাত লেখক শংকর (মণিশংকর মুখোপাধ্যায়) এক তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনায়

যা লিখেছেন তার মর্মার্থ হচ্ছে ঃ দুর্গাদেবীও ফরেন থেকে আমদানি হয়েছেন। অর্থাৎ সেখানকার দেবদেবী সামনে করেই ফরেনাররা কাঠামোটা ঠিক করে দিয়েছেন। এশিয়া মাইনরের ইয়াজিলিকায়া গুহায় ৩৩০০ বছর আগেকার ৬৬ জন দেবদেবীর সঙ্গে একটি দেবী আছেন যাঁর নাম 'সুপিপলিলিউমা'। এই শব্দটির শেষ অক্ষর দুটিকে নিয়ে উমা দেবী বানানো হয়েছে। এশিয়া মাইনরের ঐ ভাস্কর্যেও সিংহবাহিনী বিদ্যমান। সেইসঙ্গে দুর্গার স্বামী শিবেরও একটি মূর্তি রয়েছে যিনি ষাঁড়ের উপর চড়ে রয়েছেন। লেখকের মতে ইনিই ভোলা মহেশ্বর। [দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ১৩-১৫]

Wisdom নামের আন্তর্জাতিক ইংরাজি পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, দুর্গাপূজার প্রচলন আমাদের দেশে সর্বপ্রথম কৃষ্ণনগরের জমিদার বাড়িতে ইংরেজের আমলে শুরু হয়। ১৯৯৭-এর ৫ই অক্টোবর আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে 'ক্লাইভের দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে নির্মল করও এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস লিখেছেন।

১৭৫৭-র ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজের পরাজয়। অন্যভাবে বলা যায়, ঐ তারিখে ভারতবাসীর পরাজয় আর ইংলন্ডবাসীর বিজয়। নবকৃষ্ণ দেব ছিলেন সাহেবদের মুন্সী বা চাকর। কোন সময় ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রাইভেট টিউটর। উন্নতি করে হয়েছিলেন তালুকদার— চার হাজারি মনসবদার। পলাশীতে সিরাজের পতনে "যাঁরা সবচেয়ে উল্লসিত হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আর কলকাতার নবকৃষ্ণদেব। কোম্পানীর জয়কে এঁরা হিন্দুর জয় মনে করলেন। ক্লাইভ চাইলেন এই জয়কে 'সেলিব্রেট' করতে। ... ক্লাইভের পরামর্শে মুশকিল আসান করলেন মুন্সী নবকৃষ্ণদেব। বাসন্তী পূজাকে পিছিয়ে আনলেন শরৎকালে। ...গড়ে উঠল একচালা প্রতিমা। প্রতিমার গা ভর্তি সোনার গয়না ঝলমল করে উঠল। দুর্গার কেশদামে গুঁজে দেওয়া হোল ২৬টি স্বর্ণনির্মিত স্বর্ণচাঁপা। নাকে ৩০টি নথ। মাথায় সোনার মুকুট।... তারপর তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সন্ধিপূজোর শুরু।... দৈনিক নৈবেদ্য দেওয়া হচ্ছে ২৩ মণ চালের।... সে বছর নবকৃষ্ণদেব আর নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে শরৎকালীন দুর্গাপূজোর মাধ্যমে ইংরেজদের বিজয় উৎসবটি পালন করলেন।... তত্ত্বজ্ঞদের মতে এর আগে শারদীয়া দুর্গাপূজো ছিলনা, ছিল বাসন্তীপূজো। ক্লাইভ নিজে খৃষ্টান, আর মূর্তি পূজোর বিরোধী হয়েও স্রেফ নিজেদের স্বার্থে হিন্দু প্রেমিক সেজে নবকৃষ্ণের দুর্গাপূজোয় ১০১ টাকা দক্ষিণা আর ঝুড়িঝুড়ি ফলমূল পাঠিয়েছিলেন। প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থে ইংরেজরা এদেশে দুর্গাপূজোকে উপলক্ষ করে গড়ে তুললেন এক অনুগ্রহজীবী তাবেদার সম্প্রদায়। নবকৃষ্ণের কাছেও দুর্গাঠাকুর ছিলেন উপলক্ষ মাত্র। ক্লাইভকে তুষ্ট করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য।... নবকৃষ্ণ ভাল করেই জানতেন মূর্তিপূজোর বিরোধী খৃষ্টান ক্লাইভকে শুধু দুর্গাঠাকুর দেখিয়ে মন ভরানো যাবে না। তাই বোধনের

দিন থেকে সাহেবদের জন্যে মদ মাংস আর নাচগানের অঢেল আয়োজন করলেন।... একটি নির্দিষ্ট আসনে এসে বসলেন ক্লাইভ, পাশের আসনে নবকৃষ্ণদেব বাহাদুর।... ক্লাইভ সেদিন পশুবলি সহ হিন্দুদের দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলিও দিয়েছিলেন।... নর্তকীদের নাচগান চলছে, চারিদিক ঘিরে কোম্পানীর বাঘাবাঘা সাহেব মেম অতিথিরা কৌচে বসে মৌজ করে তা দেখছেন। নাচ দেখতে হাতির পিঠে চড়ে এসেছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসও।"

এই সত্য তথ্য জানার পর পরাধীনতাকে যাঁরা ঘৃণা করেন, স্বাধীনতাকে যাঁরা শ্রদ্ধা জানান তাঁরা এই দুর্গোৎসবকে কী চোখে দেখবেন জানি না। যে দেবী কোন সময়ে দুহাত বিশিষ্ট, কোন সময়ে চার, কোন সময়ে আট, কখনো দশ, বারো, আঠারো এমনকি বিশ ভূজা হয়ে আবির্ভূতা, তাঁর সত্যাসত্যের মূল্যায়ন কিভাবে হবে তা বলা কঠিন। [তথ্য ও ছবি দ্রষ্টব্য : 'দেশ', ৪ অক্টোবর '৯৭, পৃ. ৭৮ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, '৯৮ প্রচ্ছদ ও পৃ. ৪৮-৫৩]

বঙ্কিমচন্দ্রও জানতেন যে লর্ড ক্লাইভের আমলেই দুর্গার সৃষ্টি। তিনি এও জানতেন যে ওটা ইংরেজদেরই কারসাজি। "বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্রুপ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, পরে দুর্গাপূজার মন্ত্রও ইংরাজিতে পঠিত হইবে।" [দ্রঃ বাঙালী জীবনে রমণী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, পৃ. ১৮] নবকৃষ্ণবাবু সৃষ্ট এবং কৃষ্ণচন্দ্রবাবু সৃষ্ট লাভজনক এই কৌশলকে অনুসরণ করে অন্যান্য বাবুযাঁরা দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষকদের রক্তশোষণ করে ধনী হয়েছিলেন, তাঁরা আরও ধনী এবং আরও মানী হবার জন্য দুর্গাপূজো শুরু করলেন। "এই তালিকায় ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, কেষ্টচাঁদ মিত্র, নারায়ণ মিত্র, রামহরি ঠাকুর, বারাণসী ঘোষ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর। ওঁরা ছাড়াও তৎকালে পূজো করতেন রমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, রাজা সুখময় রায়।" আরো যাঁরা এই পূজো করতেন তাঁরা হলেন সাবর্ণ চৌধুরী, লক্ষ্মীকান্ত গাঙ্গুলী, রানী রাসমণি, ছাতুবাবু ও লাটুবাবু, রামদুলাল দে, দ্বারিকানাথ দত্ত প্রমুখ। [তথ্য আনন্দবাজার পত্রিকা ৭.১০.৯৭, বাবুদের পূজো : কমলেন্দু সরকার, পৃ.১৬]

মুসলমানদের মধ্যে বৈধ খাদ্য বলে যেটা বিবেচিত সেটা যখন ইচ্ছা সুবিধামত খাওয়া যাবে, রোযা ছাড়া কোন বাধা নিষেধ নেই। কিন্তু হিন্দু রীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে যেসব ব্যবস্থাপনা দেখা যায় তাতে কোন্‌টা যে ধর্ম আর কোন্‌টা যে অধর্ম তা বোধগম্য হওয়া মুশকিল। যেমন অরণ্যষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠীর দিন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার 'জয়মঙ্গলবার' হিসাবেও মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার ইতু পূজোর দিন মহিলাদের মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীপঞ্চমীর দিন হিন্দু পুরুষ-নারী নির্বিশেষে মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা ঐ দিন থেকেই ইলিশ মাছ খাওয়া শুরু করেন। বিজয়া দশমীর পর থেকে ইলিশ মাছ

খাওয়া নিষিদ্ধ। দশহরার দিন ফল ভক্ষণ জরুরী। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে রান্না করা দ্রব্য খাওয়া নিষিদ্ধ। তবে একটা পথ বের করা হয়েছে— তার পূর্বের দিনের রান্না করা অর্থাৎ বাসী খাবার খাওয়া যাবে। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী, শীতলা ষষ্ঠী নামে পরিচিত। ঐ দিন ঠান্ডা খাবার খেতে হয়, টাটকা গরম খাওয়া নিষিদ্ধ। ঠিক তার আগের দিন বেগুন আলু ইত্যাদি সমেত মাসকলাই সেদ্ধ করে পরের দিন সেই কলাই দই-এর সঙ্গে খেতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে লাউ খাওয়া নিষিদ্ধ। ঐ রকম মাঘ মাসে মূলো। আরো নিষিদ্ধ খাবার হোল, প্রতিপদে কুমড়ো, দ্বিতীয়ায় ছোট বেগুন, তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থীতে মূলো, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমি শাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁইশাক, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দশীতে মাসকলাই। এই তরিতরকারি ছাড়া অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশী পূর্ণিমা ও অমাবস্যার তিথিতে স্বামী স্ত্রীর যৌনমিলন নিষিদ্ধ। তাছাড়া তেল ব্যবহার, মাছ ও মাংস খাওয়াও কঠিন ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। আজকের শিক্ষিত সমাজে এগুলো মেনে চলা শুধু কঠিন নয়, ক্ষতিকারকও বটে। ফলে আধুনিকবাদীরা ধর্মে আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং সহজ হয়ে ওঠে নাস্তিক হয়ে যাওয়া।

পূর্বে কিশোরীদের প্রথম রজোদর্শন বা স্রাব শুরু হলে বিয়ের মতো এক উল্লেখযোগ্য পর্ব পালন করা হোত। আত্মীয়স্বজনদেরও নিমন্ত্রণ করা হোত। ধুমধামের সঙ্গে এ প্রথা চলে আসছিল, কিন্তু আজ শিক্ষিত সমাজে এটাকে অশোভন ও উৎকট অসভ্যতা মনে করায় তা বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়।

পদবীর বিবর্তন

হিন্দু জাতির মধ্যে 'ছোটলোক' 'ভদ্রলোক' বলে যে শ্রেণীবিভাগ এবং নানারকম যে উপাধি তা থেকে সেই ব্যক্তি কোন পর্যায়ের তা নির্ধারণ করা বেশ কঠিন। যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি চারবর্ণ তো আছেই, তাছাড়া আছে 'তফশিল' এবং 'অতফশিল'ভুক্ত জাতি। যেমন বাউড়ি, চামার, রজক, ডোম, দোসাধ, ঘাসী, লালবেগী, মুসাহার, পান, পাসী, রাজোয়ার, ঝালোমালো, জেলে-কৈবর্ত, হাড়ি, গোঁড়ি, দোয়াই, দামাই, বিন্দ, ভুইঞা, ভুঁইমালী, বেলদার, বেদিয়া, বাইতি, বাহেলিয়া, দুলে, বাগদি, তুরি, করেঙ্গা, কেওরা, কান্দ্রা, কামি, কাদার, কোনাই, কোচ, খটিক, কেওট, কাউর, মাল, মাহার, লোহার, কোটাল, কোঁয়ার, নুনিয়া, নমঃশূদ্র, মেথর, মাল্লা, মল্ল, রাজবংশী, পোদ বা পৌণ্ড্র, পাটনী, পলিয়া, চৌপল, বাল্টার, তিয়র, শুঁড়ি, সরকি, কাঞ্জার, হালালখোর, দাবগর, ভোগতা, খয়রা, ভঙ্গী, ভূমিজ, নট, কোরারিয়ার— এঁরা সব তফশিলভুক্ত বা ছোটলোক (!) জাতি।

এই ছোটলোক ভদ্রলোকের হাটে কে যে কখন শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হবার মতো ছোটলোক থেকে রূপান্তরিত হয়ে ভদ্রলোক হচ্ছেন তার হিসেব রাখা মুশকিল। "কায়স্থরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলছে, বাগদীরা নিজেদের বর্ণক্ষত্রিয় বলছে। মেথররা নিজেদের মলক্ষত্রিয় বলছে। পোদরা নিজেদের পুড্রক্ষত্রিয় বলছে। কিন্তু কেউই চিন্তা করে দেখছেন না যে, সকলেই যদি ক্ষত্রিয় হয়, তাহলে সমীকরণ করলে পরিস্থিতিটা কী দাঁড়ায় : কায়স্থ, বাগদী, মেথর, পোদ, ক্ষত্রিয়।" [ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, পৃ. ১৮৫]

ধর্মপুরাণ নামক হিন্দু ধর্মগ্রন্থে একটি পদবী তালিকা পাওয়া যাচ্ছে— সদগোপ, কৈবর্ত, গোয়ালা, তাম্বুলী, উগ্রক্ষত্রিয়, কুম্ভকার, তিলি, যোগী, তাঁতী, মালী, মালাকার, নাপিত, রজক, দুলে, শঙ্খধর, হাড়ি, মুচি, ডোম, কলু, চণ্ডাল, মাঝি, বাগদী, মেটে, স্বর্ণকার, সুবর্ণ বণিক, কর্মকার, সূত্রধর, ধীবর, পোদ্দার, ক্ষত্রিয়, বারুই, বৈদ্য, পোদ, পাকমারা, কায়স্থ, কেওড়া প্রভৃতি।

মুসলিম সমাজে যে কয়েকটি পদবি আছে তা এক হিসাবে মূল্যহীন বলা যায়। কারণ, হিন্দু সমাজে যেমন 'ছোটলোক' ভদ্রলোক হতে পারেন না, তেমনি ভদ্রলোকেরাও সহজে 'ছোটলোক' সাজতে চান না। মুসলিম সমাজে পৌরহিত্য বা ইমামতি বলে যে

বিষয়টি আছে সেটি সারা পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের, তাঁর যে পদবিই থাক না কেন, তা করার অধিকার পূর্বেও ছিল আজও রয়েছে। সে যাইহোক, হিন্দু সমাজের পদবিগুলো যা-ই আছে তা নিয়েও এক বিরাট সমস্যা। যেমন 'কর' উপাধি ২২ রকমের আছে। 'কুণ্ডু' আছে ১৮ রকম, 'গুপ্ত' ৯ রকম, 'গোস্বামী' ১২ রকম, 'ঘোষ' ১৫ রকম, 'চৌধুরী' আছে ৩২ প্রকারের, 'জানা' ১৯ প্রকার, 'ঠাকুর' ৯ রকমের, 'দত্ত' ২৮ রকম, 'দাস' পদবিটি আছে ৭৬ রকম, 'দে' আছে ২৮ রকমের, 'ধর' ১৫ রকম, 'নন্দী' ১৯ রকম, 'নাগ' আছে ১৬ রকম, 'পাত্র' ১৮ রকম, 'পাল' ২৮ রকম, 'পালিত' ৬ রকম, 'প্রামাণিক' ২৯ রকম, 'বাগচি' ৫ রকম, 'ভাদুড়ি' ৩ রকম, 'বিশ্বাস' ৩২ রকম, 'মল্লিক' ৩৯ রকমের, 'মজুমদার' ২৪ রকম, 'রায়চৌধুরী' ১৯ রকম, 'হালদার' ২৭ রকম, 'সিংহ' ২৯ রকম, 'সেন' ২৪ রকম, 'সামন্ত' ১৩ রকম, 'সাহা' আছে ১২ রকমের, 'সরকার' আছে ৩৫ রকমের, 'হাজরা' আছে ২১ রকম, এবং 'রায়' আছে ৪৭ রকমের। এইভাবে 'মুখোপাধ্যায়' ব্রাহ্মণদের মধ্যে আছে, আবার ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও আছে। ব্রাহ্মণদের অনেক পদবি সদগোপের ভিতরেও আছে। আবার কিছু উপাধিধারী ব্রাহ্মণ বলে দাবী করেন, কিন্তু শুনলে তা মনে হয় না। যেমন চম্পটি, ঝম্পটি, খড়খড়ি, তোড়ক, মৎস্যাসি, শিহড়ি, গোচন্ড, কাবরী, শূল, বলোৎকটা, লাড়ুলি ও বাড়ুরি। এ এক বিরাট ব্যাপার।

বর্তমানে সরকার তফশিলি জাতি, উপজাতি বা 'ছোটলোক' সম্প্রদায়ের উপর করুণা বর্ষণ করায় চাকরি বাকরির কোটা নির্ধারিত হয়েছে। এই সুযোগে ভদ্রলোক বাবুরা রাতারাতি ভদ্রলোকের খোলস খুলে 'ছোটলোকে'র খোলস পরে বৈধ কাগজপত্র (?) তৈরি করে অনুন্নতদের বঞ্চিত করে চাকরি গুছিয়ে নিতে তৎপর।

ছোটলোক ভদ্রলোকের শ্রেণীবিভাজন পুরোপুরি না হলেও সিংহভাগ বা মোটা অংশটি বৃটিশেরই সৃষ্টি। ডক্টর কামিনীকুমার রায়ের 'লৌকিক শব্দকোষ', ডঃ সুকুমার সেনের 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী', ডঃ অতুল সুরের 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস', ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের 'শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ', ডঃ কোশাম্বির 'মিথ অ্যান্ড রিয়ালিটি', 'দি কালচার অ্যান্ড সিভিলাইজেশন অব এনসেন্ট ইন্ডিয়া', মিঃ উইলিয়াম হান্টারের 'এ্যানালাস অব রুরাল বেঙ্গল', এইচ রিজলীর 'ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টস অব বেঙ্গল', রোমিলা থাপারের 'পাস্ট অ্যান্ড প্রেজুডিস', রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'করপোরেট লাইফ ইন এনসেন্ট ইন্ডিয়া', খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থ এই বিষয়ের সহায়কগ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়।

তাত্ত্বিক লেখক লোকেশ্বর বসুও 'আমাদের পদবির ইতিহাস' নামে একটি মূল্যবান বই লিখেছেন। বইটি থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করতে চাইছি প্রসঙ্গ।

পদবিস্রষ্টা সুবিধাবাদীদের জন্য তিনি বলেছেন, "তাঁরা কেউ ইচ্ছামত পদবী গ্রহণ করেছেন, কেউ আদি পদবীর গায়ে সংস্কৃত ভাষার পালিশ চড়িয়েছেন, কেউবা পদবীটি আমূল বদলে নিয়েছেন। আমরা পরবর্তী সন্তান সন্ততিরা সেই পদবীকেই আদি ও অকৃত্রিম মনে করে নামের শেষে যুক্ত রেখে আত্মগর্বে আপ্লুত হয়ে আছি।"

"কারণ আদিতে কোন পদবীই ছিল না। আপনার পদবী কি বন্দ্যোপাধ্যায় বা মুখোপাধ্যায়? চট্টোপাধ্যায় বা গঙ্গোপাধ্যায়? এই পদবীগুলিকে যত প্রাচীন ভাবছেন সত্যই কিন্তু ততখানি প্রাচীনত্ব এদের নেই। ভারতবর্ষে কুত্রাপি এই পদবী ছিল না।... বঙ্গ দেশেও ব্রাহ্মণদের পদবীগুলি ছিল অন্য, ক্ষেত্রবিশেষে রীতিমত শ্রুতিকটু। আপনি কি ঘোষ, বসু, মিত্র বা দত্ত? স্বীকার করি এই শব্দগুলি খুবই প্রাচীন। কিন্তু পদবী হিসাবে এগুলির কোন প্রাচীন ব্যবহার খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।"

"এখানে প্রাসঙ্গিক বলেই উল্লেখ্য যে বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়ও পরিবর্তিত পদবী। আদি পদবী বাড়বি বা বন্দ্যঘটি, চাটুতি বা চট্ট, মুখটি, গাঙ্গুর বা গঙ্গ। মুখটি বা মুকুটি এখনো পাওয়া যায়। বাড়ব বা বাড়বি গ্রাম থেকে বাড়বি ও বন্দ্যঘটি রূপান্তর, তা থেকে বন্দ্যোপাধ্যায়।" [ঐ, পৃ. ৯ দ্রষ্টব্য]

"চাটুতি, মুখটি, বাড়বির মতই বাকচি, লাহিড়ী, সান্যাল পদবিও তো আপাতদৃষ্টে অর্থহীন।... কুশো গ্রাম থেকে সৃষ্ট পদবি কুশারী কিভাবে লোকমুখে ঠাকুর পদবিতে রূপান্তরিত হয় সে কাহিনী আজ অনেকেই জানেন।" লেখক এখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বংশের উৎস সম্পর্কে বলেছেন।

"পদবীর খোঁজে বেদ, পুরাণ, জাতক এবং কথাসরিতের পাতা, ওল্টালেও তার হদিস মেলে না। সেখানে শুধুই নাম, কোন পদবি নেই।... আধুনিক কালেও দেখা গেছে শিবনাথ ঘোষ বা কালিকাপ্রসাদ সেন ইংরেজদেরই ত্রিমাত্রিক নামের অনুসরণে (জর্জ বার্নার্ড শ বা জি. বি. এস.) নিজেদেরও এস. এন. ঘোষ বা কে. পি. সেন বানিয়ে তোলেন।... উত্তরভারতে ব্রাহ্মণদের আদি পদবীর সন্ধানে গেলে দেখা যাবে শর্মা ও স্বামী অনেক ক্ষেত্রেই বিদায় নিয়ে শিক্ষাগত উপাধি তার স্থান করে নিয়েছে। অর্থাৎ একালে নামের শেষে বি-এ এম-এ লেখার মত তারা বেদপাঠের বিজ্ঞাপন দিতেন। পন্ডিত, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্বেদী ও শাস্ত্রী উপাধিগুলি ছিল ডিগ্রি ডিপ্লোমার সমতুল্য।... একটি বেদ যিনি পাঠ করেছেন তিনি ছিলেন পন্ডিত, দুটি বেদ পাঠে দ্বিবেদী, তিনটি বেদ পাঠে ত্রিবেদী, চারটি বেদ পাঠে চতুর্বেদী। কিন্তু বংশপরম্পরায় এগুলি যে পদবী হয়ে গেল।... ব্রাহ্মণদের আদি পদবি শর্মা ও স্বামী আজ বাংলাদেশে প্রায় অনুপস্থিত।" [দ্র. পৃ.২০]

বৃটিশ তার কাজের সুবিধার জন্য ডিভাইড অ্যান্ড রুল অর্থাৎ বিভেদ ও শাসন পদ্ধতি চালাতেই উঁচু নিচুর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। পূর্বে ব্রাহ্মণ বড়ুয়া ও ডোম প্রভৃতি গোষ্ঠী সব একাকারই ছিল। এখন তা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। "একদা ব্রাহ্মণ ও বড়ুয়া ছিল পাশাপাশি। দৃষ্টান্ত :

পুখুর পাড়েতে সদা ডোমের কুড়িয়া (কুঁড়েঘর)।
ঘন ঘন আইসে যায় ব্রাহ্মণ বড়ুয়া।।" [পৃ. ২১]

পূর্বে গ্রাম বাংলায় ঝাড়ফুঁক করা, সাপে কাটা রোগীকে মন্ত্র ও ঔষধ দেওয়ার লোকদেরকে সাধারণত ওঝা বা 'রোঝা' বলা হোত। "বড় বড়ু বাড়ব-এর সঙ্গে ওঝা, মুখটির সঙ্গে ওঝা, চাটুতির সঙ্গে ওঝা যুক্ত হয়ে বাড়ুওঝা, চাটুওঝা, মুখুওঝা পদবীগুলি হয়ে দাঁড়ায় বাড়ুজ্যে, মুখুজ্যে ও চাটুজ্যে।... আচার্য ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একজায়গায় লিখেছেন, চাটু গ্রামের হিন্দি জী বা জীউ থেকে চাটুর-জিয়া, চাটুর্জ্যা, চাটুর্জ্যে ও চাটুজ্যে। ১৭৬০ সালের পর ইংরাজী রূপ দাড়ায় চ্যাটার্জী। ১৭৫০-এর পর পন্ডিতি বা সংস্কৃত রূপ হয় চট্টোপাধ্যায়।" [পৃ.২১, ৩৮]

সুনীতিবাবুর মতে 'মুখটি' বা 'মুখড়া' গ্রাম থেকেই মুখুজ্যে। 'বন্ডউরী', 'বাঁড়ুরি' গ্রাম থেকেই বাঁড়ুজ্জেদের উৎপত্তি। 'বন্দিঘটি' গ্রাম থেকে 'বন্দ' শব্দ নিয়ে বন্দ্যোপাধ্যায়। তেমনি 'গঙ্গা কুলিক' গ্রাম থেকে 'গাঙ্গৌলি' ও 'গাঙ্গুলি' শব্দটিকে সংস্কৃতের পোষাক পরিয়ে গঙ্গোপাধ্যায় বানানো হয়েছে।

এমনিভাবে বোড়াল ও বোড়া গ্রাম থেকে তৈরি হয়েছে বড়াল পদবি। কুশো গ্রাম থেকে কুশারী। ঘোষ ও ঘোষাল গ্রাম থেকে ঘোষাল আর মুকটি থেকে হয়েছে মুখটি পদবী। চাটুতি গ্রাম থেকে হয়েছে চট্ট। পাকুড় গ্রাম থেকে হয়েছে পর্কট ও পাকড়াশী। পলশা ও পোষলা গ্রাম থেকে হয়েছে যথাক্রমে পলসাঁয়ী এবং পুষালী। পোড়াবাড়ী গ্রাম থেকে তৈরি হয়েছে পোড়ারি পদবি।

গ্রামের নাম অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে বর্ধমান জেলার বাইশটি গ্রাম, বাঁকুড়ার চারটি গ্রাম, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের ন'টি করে গ্রাম, হুগলী জেলায় পাঁচটি, মানভূম জেলায় একটি এবং আরও বিভিন্ন জেলা থেকে আর সাতটি গ্রামের বন্দ্য, চট্ট, গঙ্গ, মুখটি প্রভৃতি নাম থেকেই বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টি। লেখক লোকেশ্বর বসুর মতে ব্রাহ্মণ তৈরি হয়েছে বেশির ভাগ বর্ধমান জেলায়: "সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে সেখান থেকে রাঢ়ী ব্রাহ্মণরা চতুর্দিকে নিজেদের বিস্তার করেন।" [ঐ, পৃ. ৩৯]

মোঘল আমলে অর্থাৎ মুসলমানদের তাবেদার আমলা ও কর্মচারী প্রতিনিধির উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা দিয়েছিলেন রকমারী পদবী। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন সরকার, হাজারী বা হাজরা। বর্তমানে অনেক ব্রাহ্মণের পূর্বপরিচয় নিতে গেলে দেখা যাবে তাঁরা অনেকেই হাজরা ছিলেন। লেখকের মতে "হালদার ও হাজরা উভয়ই মোঘল আমলের পদবি।" [পৃ. ২৪]

মোঘলদের দেওয়া চাকরি সূত্রেও বহু পদবীর সৃষ্টি হয়— "যেমন তালুকদার, চাকলাদার, মহলানবীশ, তরফদার, সেহানবীশ, খাসনবীশ, পত্রনবীশ, বক্‌শী, মুনশী, মুস্তাফী ইত্যাদি।" এছাড়াও মজুমদার, নস্কর, কয়াল, মীরবহর, হালদার প্রভৃতি পদবিগুলো মুসলমান আমলের অবদান।

ইংরেজ আমলে অর্থাৎ ইংরেজ শাসকরা ও তাদের গোলাম, আমলা, স্তাবক, বিশ্বাসভাজন কর্মীদের বহু উপাধি দিয়ে গেছে— "পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসকরাও রায়সাহেব, রায়বাহাদুর, নাইট, স্যার প্রভৃতি উপাধি বিতরণ করেছিলেন। অনেকেই হয়তো জানেন না যে, 'মহামহোপাধ্যায়' ইংরেজ সরকারের দেওয়া খেতাব।"

'দাস' পদবিটিকে অনেকে ঘৃণ্য মনে করে 'দাস' কে 'দাশ' বানিয়ে ফেলেছেন। "দাস কোন জাতিবাচক পদবী নয়।" কায়স্থ বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যেও দাস ছিল এবং আছে। "পঞ্চাশ ষাট বছর আগে দাস পদবীর বহুল প্রচলন ছিল, বর্তমানে প্রায় অদৃশ্য। দাস পদবীকে অপাংক্তেয় করার আগে মনে রাখতে হবে আমাদের মহাভারতের রচনাকারের নাম কাশীরাম দাস।"

মুর্শিদাবাদ জেলার 'বসু' গ্রাম থেকে বসু পদবির সৃষ্টি। বর্তমানে গ্রামটির নাম হয়েছে 'বসুয়া', বীরভূমের ঘোষ বা ঘোষাল গ্রাম থেকে ঘোষ পদবি। "আবার ঘোষ গ্রাম থেকেই ঘোষাল। ঘোষ পদবী কায়স্থদের তুলনায় গোপদের মধ্যে অধিক প্রচলিত।"

খুব খুঁটিয়ে দেখলে গবেষকরা দেখতে পাবেন যে, মানুষের তৈরি করা ছোটলোক ভদ্রলোক দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রায় সব উপাধিই বিদ্যমান। এই বড়রকম বেইমানি বঙ্গের একশ্রেণীর বাঙালিরাই ঘটিয়েছে, তারাই সৃষ্টি করেছে ভদ্রলোক ও ছোটলোকদের মাঝে বিশাল চৈনিক প্রাচীর।

"মুষ্টিমেয় বাঙালী ফার্সী শিখে (মুসলিম আমলে) উন্নতি করেন, পরে ইংরাজী শিখে। বাঙালীর সর্বাঙ্গে বর্তমানে যে প্রসাধন লক্ষ্য করা যায় তার শুরু এক শতাব্দীও নয়।" [পৃ.২৮]

শাস্ত্র প্রেমিকদের মনে রাখতে হবে যে, হিন্দুধর্ম বা হিন্দু "শাস্ত্রমতে অব্রাহ্মণ অবাঙালী মাত্রেই শূদ্র। অবশ্য বহু জাতি ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করে। কিন্তু সমুদয় দাবীর পিছনে কোন যুক্তি নেই।" [পৃ. ৩২]

ইংরেজদের তৈরি করা কঠিন চক্রান্ত সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য হওয়া সুদীর্ঘ সময় ও কঠিন শ্রম সাপেক্ষ। আমাদের মস্তিষ্কে বেদ এমনভাবে বাসা বেঁধেছে যে তার সত্যতার উপর যেন কোন প্রশ্নই হতে পারেনা। তাই পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে ঋগ্বেদটি হচ্ছে এক নম্বর খাঁটি জিনিস। যেটি পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। মূল ঋগ্বেদ একটিই আছে, তাও আবার লন্ডনে (!)। আর তা সংগ্রহ করলেন কে? সাহেব পন্ডিত ম্যাক্সমূলার। কোত্থেকে পেলেন ঐ রত্নটি? রাশিয়া থেকে। ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ অর্থাৎ অবিভক্ত ভারতবর্ষে কোথাও মিলল না ঋগ্বেদের একটি কপি অথবা একটি ছেঁড়া পাতাও। লোকেশ্বর বসুও লিখেছেন, "মনু সংহিতার তো একটি মাত্র পুঁথি ইংরেজরা উদ্ধার করেন দক্ষিণভারত থেকে। তাও সেটি খুব প্রাচীন নয়। শাস্ত্রবাক্য কণ্ঠস্থ থাকতো বলেই আঞ্চলিক প্রভাবে কেউ কেউ দু চারটি শ্লোক যে প্রক্ষিপ্ত করেন নি (অর্থাৎ ভেজাল দেন নি) এমন মনে করার হেতুও নেই।" [পৃ. ৩৪]

বড়কর্তারা চাকর বাকরদের মাথায় যা ঢুকিয়ে দেন তাই নিয়েই তাজা থাকে আমাদের মগজ। যেমন উপনিষদের মূল্যবান উদ্ধৃতি 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'। কিন্তু এটি একটি অসত্য প্রচার। আমাদের দূরদর্শনেও উপনিষদের উক্তি মনে করে এটিকে মূলমন্ত্র করা হয়। আসলে ফরাসী দার্শনিক মিঃ কুঁজার উক্তি এটি। আমদানি করেছেন ঠাকুর বাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। [মতান্তরে : অমিতাভ চৌধুরী, দ্রঃ শারদীয় আজকাল; ১৪০৪, পৃ. ১২৪]

উপাধি ভক্তদের মনে রাখা উচিত মুসলমান ও ইংরেজ আমলে যেনতেন প্রকারে যাঁরাই পয়সা কামাতে পেরেছেন বা ধনী হয়েছেন তাঁরাই তখন ভদ্রলোক হয়ে গেছেন। লোকেশ্বর বসু লিখেছেন, "সেকালের কৌলিন্যও এভাবেই গড়ে উঠেছিল।

'দালান গোত্র পুষ্করিণী গাঞি
ইহা ছাড়া কুলীন নাই॥
যদি থাকে দুই এক ঘর
লোহার সিন্দুক আর টিনের ঘর॥'

সুদূর অতীতের কথা বাদ দিলে ইংরেজ আগমনের আগে বাঙালীর ধন দৌলতের পরিচয় বলতে কি বোঝাতো তাও এই ছড়াটির মধ্যেই পাওয়া যায়। ... আগেই বলেছি ভারতবর্ষে তিন শতাধিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে। ... পাঁড়ে, দুবে, তেওয়ারী, চৌবে, সুকুল, দীক্ষিত, মিশির, পাঠক, ওঝা, বাজপেয়ী বা তার দশটি শুদ্ধ রূপ" ইত্যাদি। [পৃ. ৩৭]

'বজ্রকলম'-এর প্রথম খন্ডে জানানো হয়েছে যে, রাজত্ব ছাড়াই রাজা মহারাজা বানানো হয়েছিল কাদের। লেখকও লিখেছেন, "রাজত্বহীন রাজা মহারাজাও ইংরেজরা

বানিয়ে গেছেন। কখনও বড় জমিদার, কখনও ধনাঢ্য ব্যক্তিকে কখনও বা রাজকীয় ব্যক্তিত্ব বোঝাতো। আবার শুধুই লোকমুখে কেউ প্রিন্স হয়ে গেছেন।"

আজকের পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ আসামের দিকে তাকিয়ে দেখে কেউ কি অনুমান করতে পারবেন যে, গগনচুম্বী প্রাসাদ, হোটেল, বড়বড় ফ্যাক্টরি, মিলমালিক ও কোটিকোটি টাকার পুঁজিওয়ালাদের উন্নতির উৎস মুসলমান রাজা বাদশা বা মোঘলদের সুনজর? আর পরিপূর্ণ পুষ্টিলাভ বা আঙুল ফুলিয়ে কলাগাছ বানানোর কাজটি করে গেছে ইংল্যান্ডের বৃটিশ সরকার? মোঘল ও বৃটিশদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, মোঘলরা অবিভক্ত ভারতের উদ্বৃত্ত ধনসম্পদ বিদেশে পাচার করে নি। দেশের সম্পদ দেশেই রেখে নিজেরা মিশে গেছে মৃত্যুর সঙ্গে। কিন্তু বৃটিশ শুধু উদ্বৃত্ত নয়, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক হৃৎপিন্ড নিংড়ে ধনসম্পদ কাঁচামাল ড্রেন থিওরী পদ্ধতিতে পৌঁছে দিয়েছে তাদের স্বদেশ ইংল্যান্ডে। অন্যদিকে মোঘল শাসকদের সময়ে অমুসলমান সম্প্রদায়ের যে সব ভাগ্যবানদের বেছে নেওয়া হয়েছিল নিঃসন্দেহে তাঁরা উপকৃত হয়েছিলেন। যাঁদের নেওয়া সম্ভব হয় নি তাঁদের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে দিয়ে অর্থাৎ তাদের চাকরি কেড়ে নিয়ে বা তাদের জমির মালিকানা কলা কৌশলে ছিনিয়ে নিয়ে ঐ ভাগ্যবানদের দেওয়া হয় নি। কিন্তু বৃটিশ আমলে উন্নততম সাড়ে সাতশ বছরের রাজত্বপ্রাপ্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের চাকরিগুলো ক্রূর কৌশলে কেড়ে নিয়ে এবং তাঁদেরকে জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত করে বেছে নেওয়া ভাগ্যবান দলটিকে ধনী মানী ও জ্ঞানী সম্প্রদায়ে পরিণত করা হয়। যেটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক চিন্তার বিষয়।

লোকেশ্বর বসু লিখেছেন, "জমিদার বলতে মোঘল যুগে বোঝাতো ক্ষুদ্র অঞ্চলের শাসক, এবং তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান।... কিন্তু ইংরেজ যুগে হিন্দুরা আবার জমিদার হলেন। কার্যক্ষেত্রে এঁরা কিন্তু জামিনদার। এই জমিদারী প্রথার বয়স মাত্র দেড়শো বছর। পলাশীর যুদ্ধের সময়েও কোন বিশিষ্ট বাঙালী হিন্দুর দেখা মেলে না। পরে যে বাঙালীরা কলকাতায় ছুটে এলেন, তাঁদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছিল, তেমনি ছিল অন্যান্য জাতি। সে সময় তন্তুবায় এবং বণিকরাই ছিল ধনী।... এই সময় ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ব্যবসা করে, নানাভাবে তাদের উপকার করে, দোভাষী হয়ে জাহাজ ঘাটায় মাল নামানোর কুলি সংগ্রহ করে দিয়ে অনেকেই কপাল ফেরালেন। এদের মধ্যে ধনীরা জমিদারী কিনলেন ইংরেজদের কাছ থেকে। কিন্তু সে জমিদারী আসলে খাজনা আদায়ের ঠিকাদারী। তবু দু-তিন পুরুষেই তাঁরা বনেদী বনে গেলেন। [বসু, পৃ. ৬৩]

পদবির কথা বলতে গেলে মহিলাদের সম্পর্কে বাদ দেওয়া যায় না একটা কথা। "ব্রাহ্মণরা বাংলাদেশে অন্য সমস্ত জাতিকে শূদ্র ও সংকর অভিধা দিয়ে তাঁদের স্ত্রীদের

পদবী দেন দাসী।... সেকালে কায়স্থ জাতির বিবাহিত রমণীরাও ছিলেন দাসী। পঞ্চাশ বছর আগেও বহু বিখ্যাত কায়স্থ রমণী নামের শেষে দাসী লিখতেন।... কিন্তু বর্তমানে দাসী সম্পূর্ণ লুপ্ত। এখন সকলেই দেবী।... প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী ভূস্বামীরা নিজেদের দেব ভাবতেই অভ্যস্ত ছিলেন, অতএব জমিদার গৃহিনীরা দেবী চৌধুরানী হবেন না কেন!" [পৃ. ৭৬-৭৭]

সাহেবরা যা করে তাই আমাদের কাছে চরম ও পরম বস্তু। সাহেবদের নামের সঙ্গে অনেক পশুর নাম মিশে একাকার হয়ে গেছে। যেমন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স নামক চলচ্চিত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জনৈক ফক্স। মার্চেন্ট অব ভেনিস নাটকে পোর্সিয়া এসেনিয়া ইত্যাদি নামগুলো মিষ্টি মনে হলেও পোর্সিয়া মানে শূকর আর এসেনিয়া মানে গাধা। পূর্বোক্ত শব্দ দুটির একটি উল্‌ফ মানে নেকড়েবাঘ আর দ্বিতীয়টি ফক্স অর্থাৎ খেঁকশিয়াল। কলকাতার হগ মার্কেট হগ সাহেবের নামেই হয়েছে। হগ মানে শূকর। হিন্দু পদবি 'দাস' এবং 'দাশ'-এর যেমন বানানের পার্থক্য দেখানো হয়েছে এখানেও হগের একটি 'জি'-এর বদলে দেওয়া হয়েছে দুটি 'জি'। তেমনি আমাদের দেশীয় পদবীতেও সিংহ, বাঁদুড়ী, হাতি, ঘোড়া বা ঘোড়ুই, বাঘ বা বাগ ইত্যাদি বিদ্যমান। অবশ্য ইংরেজী ঢঙে আবার রং পালটে গেছে। যেমন ঠাকুর হয়েছে Tagore। হাতি হয়েছে Hati। বাঘ থেকে Bag প্রভৃতি।

নবভারতের সূতিকাগৃহ কলকাতা

চলমান ধারণার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ চমকে উঠবেন। বারবার আমরা যেটা বলতে চাইছি সেটা হোল, আমাদের স্বর্ণময় ভারত যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে ধ্বংস হয়ে থাকে এবং সাম্প্রদায়িকতার অক্টোপাস যদি ভারতবাসীকে গ্রাস করে থাকে তাহলে বলতে হয় যে, এই কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র ছিল আমাদের অবিভক্ত বঙ্গদেশ। সুতরাং বাঙালীদের অনেকেই সংযুক্ত ছিলেন ঐ বৃহত্তম ষড়যন্ত্রে। এই সাংঘাতিক তত্ত্বটি ভারতের বাঘা বাঘা বুদ্ধিজীবীরা সমর্থন করলে তাতে আর সন্দেহ থাকে না মোটেই। তাই কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর বক্তব্য ও সমর্থনসূচক মন্তব্য তুলে দেওয়া হোল।

(ক) "এই কলকাতাকে কেন্দ্র করেই বৃটিশরা ভারতেসাম্রাজ্য স্থাপন ও বিস্তার করে। এ রাজ্য শাসনকাল শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতের অন্ধকারের কাল। শোষণ, অত্যাচার, রক্তঝরা আর স্বজন হারাবার বেদনায় সমাকীর্ণ। আর এই ভারত-শোষণের অর্থে ইংলন্ডে হয়েছে শিল্প বিপ্লব— এই শোষিত শক্তির দাপটে ইংরেজরা বিশ্বময় এমন সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে যেখানে সূর্য অস্ত যায় না। আর, এ বিজয়বৈজয়ন্তীর সূচনা হয়েছে জব চার্নকের কলকাতায় পদার্পণে। .কলকাতার ইতিহাস সমগ্র বাঙালীর ইতিহাস, আরও বড় করে বলা যায় গোটা ভারতের ইতিহাস।"

(খ) "পলাশীর ক্ষেত্রে ইংরেজ পক্ষের সামরিক জয়লাভের সুদূর প্রসারী ফলাফল আলোচনা প্রসঙ্গে স্যার যদুনাথ সরকারের মতো প্রবীণ ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, এখান থেকেই বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল।"

(গ) প্রচার ও অপপ্রচারের প্রধান প্রয়োজনীয় মাধ্যম সংবাদপত্র। ইংরেজরা ভারতে কোথায় প্রথম শুরু করেছিল সংবাদপত্রের মহড়া, প্রশ্ন উঠলে উত্তর আসবে— ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের জন্ম কলকাতা শহরেই।

(ঘ) ১৬৬০ সালে কলকাতার পত্তনের কয়েক বছরের মধ্যেই এ স্থানকে ইংরেজরা চূড়ান্তভাবে বেছে নিল।

(ঙ) ইংরেজরা ব্যবসায়িক সূত্রে এদেশে এসে সর্বপ্রথম ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে প্লে হাউস নামে এক নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করে।

(চ) কলকাতার নগরে রূপান্তরণ ঔপনিবেশ বণিক স্বার্থের তাগিদেই— পরে যা সাম্রাজ্য লিপ্সায় আরও আগ্রাসী উদ্ধত হয়েছিল।

(ছ) লক্ষ্যণীয় এইটুকু, তখনকার সারা ভারতের রাজধানী কলকাতাতেই ঘটেছিল সমস্ত স্বদেশী চিন্তাচেতনা, রাজনৈতিক আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা ও বিকাশ। সারা দেশের স্নায়ুকেন্দ্র কলকাতা থেকেই তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশী রাজশক্তি ও অন্যান্য সাম্রাজ্যলোলুপ বিদেশী শক্তির সঙ্গে ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যেই বাণিজ্যের অজুহাতে ইংরাজ শক্তি যে কলকাতাকে কেন্দ্র করে ভারত উপমহাদেশ জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের পরিকল্পনা করেছিল তা ছিল দিনের আলোর মতই পরিষ্কার।

উপরোক্ত 'ক' থেকে 'ছ' পর্যন্ত কথাগুলো যাঁরা বলেছেন তাঁরা সকলেই বিখ্যাত বরণীয়, যেমন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শোভন সোম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক এবং বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণধর মহাশয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবনারায়ণ গুপ্ত, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকপ্রশান্ত কুমার দাশগুপ্ত, নীরদবরণ হাজরা এম.এ., পি-এইচ.ডি. প্রমুখ।

ইংল্যাণ্ডের পাঠানো বৃটিশ প্রতিনিধিরা ব্যবসার তুলাদণ্ড নিয়ে কাজ শুরু করলেও গোটা ভারতবর্ষ দখল করার কামনা বাসনা তাদের প্রত্যেকের মস্তিষ্কে ছিল। সুচতুর বিদেশী বণিকেরা একটি 'বেস্ট পয়েন্ট' খুঁজছিল। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেল তারা 'কালা আদমি'র ভারতবর্ষের বঙ্গদেশ। তারা হিসেব করে দেখেছিল সেটাই হবে তাদের বাছাই করা স্থান বা বাছাই করা ঘাঁটি যেখানকার জনসাধারণকে তারা কাজে লাগাতে পারবে যেমন খুশি তেমনভাবে। তাদের হিসেব করতে ভুল হয়নি যে, এমন জায়গা খুঁজে নিতে হবে যেখানে জলপথে যাওয়া আসা করা যাবে সহজে কারণ তখন আকাশপথের যানবাহনের আবিষ্কার হয়ে ওঠেনি। সেখানকার মানুষের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য থাকবে যে, তাদের অধিকাংশের চরিত্র এমনই হবে যারা অর্থের জন্য এমন কোন কাজ নেই যা পারবে না। আর একটি বৈশিষ্ট্য থাকবে— তারা হবে অত্যন্ত অনুন্নত, অসভ্য ও অশিক্ষিত। আমাদের দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য জানিনা, এই বঙ্গ এবং বঙ্গবাসীকেই বেছে নিল তারা তাদের ক্রূর চক্রান্তের প্রেক্ষিতেই।

এই বঙ্গদেশের নাম কেন 'বঙ্গ' হোল এ নিয়ে ঐতিহাসিকেরা বহুরকমের মত পোষণ করেছেন। কিন্তু আসল সত্য আমাদের মত বাঙালীর শুনতে কটু বা রূঢ় হলেও এই যে, আমরা ছিলাম সাঁওতাল, কোল, ভীল, বাউড়ি প্রভৃতি গোষ্ঠী। তার প্রমাণে বলা যায়, আদিম সাঁওতাল ও কোল জাতির দেবতাকে বলা হয় 'বোঙ্গা' আর দেবীকে বলা হয় 'বোঙ্গী'। সারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো গোটা বঙ্গদেশও ছিল কালো চামড়ার মানুষে ভরা। কি করে আমাদের রঙের পরিবর্তন হোল তার বিস্তারিত আলোচনা আমরা

প্রথম খণ্ডে করেছি। তার মর্ম নির্যাস হোল . মুসলমানদের রক্তে মিশেছে আরব, ইরান বা পারস্য ও আফগান প্রভৃতি সাদা চামড়া বিশিষ্ট মানুষের রক্ত। আর অমুসলমানদের রক্তে মিশেছে বিলেতী, ফরাসী ও পর্তুগীজ রক্ত। আবার একটি উদ্ধৃতি দিতে বাধ্য হচ্ছি— "বঙ্গে প্রথম সাঁওতাল, কোল, বাউড়ি, ওরাওঁ প্রভৃতি অনার্য জাতির বাস, কোল, মোঙ্গল, দ্রাবিড় আর্যের মিশ্রণে বাঙ্গালীর উৎপত্তি, বঙ্গে আর্য নিবাসের আধুনিকত্ব, আদিম সাঁওতাল, কোলদিগের দেবতা 'বঙ্গা' ও দেবী 'বঙ্গী' হইতে দেশের বঙ্গ এই নাম প্রাপ্তি। [দ্রষ্টব্য বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, পৃ. ভূমিকা ২, লেখক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ১৯১৫-তে ছাপা। আনন্দবাজার, প্রবাসী, বঙ্গবাসী, বসুমতী, দর্শক, ভারতবর্ষ, The Pioneer, Amrita Bazar Patrika প্রভৃতি তদানীন্তন বহুদামী দামী পত্রিকা সমর্থিত এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসাপ্রাপ্ত এই বইটি।]

আর একটি কথা বলে রাখা ভাল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রথমে তৈরি হয়েছিল দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে। একটি হোল সিভিলিয়ান অফিসার ও বৃটিশ বুদ্ধিজীবীদের সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা আর দ্বিতীয়টি হোল একটি প্রভুভক্ত অনুগত স্তাবকদল তৈরি করা। শান্তিনিকেতনের কোন শাখা প্রশাখা না থাকলেও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল বৃটিশদের সহকারী কেন্দ্র—"শান্তিনিকেতনকে বস্তুত কলকাতার উপক্ষেত্র বলা যায়। বিশেষতঃ রবীন্দ্রকালে।" [ডঃ নীরদবরণ হাজরা : কলকাতা ইতিহাসের দিনলিপি, পৃষ্ঠা ভূমিকা ৬]

একটা প্রশ্ন মনে আসবে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হবার আগেই বৃটিশরা এসেছিল। তাহলে তখন তাদের বা তাদের তাবেদারদের উচ্চশিক্ষার কী ব্যবস্থা ছিল? তার উত্তরে বলা যায়, কৃষ্ণনগর কলেজ ছিল সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মা। ওখান থেকেই নিজেদের লোকেদের পড়াশুনা করিয়ে সার্টিফিকেট দেওয়া হোত এবং স্তাবক ও দালাল শ্রেণীর লোকেদের উচ্চশিক্ষাও ওখানে দেওয়া হোত। একটি উদ্ধৃতি : "কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবারও আগে। এককালে এখানে এম. এ. এবং ল'ও পড়ানো হোত।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ৮]

বৃটিশ দালাল, হিন্দু দালাল ও মুসলমান দালাল শ্রেণীর সৃষ্টি ও কর্ম সম্পর্কে প্রথমখণ্ডে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে কেমনভাবে স্যার, রায়বাহাদুর, বিদ্যাসাগর, খানবাহাদুর, রাজা-মহারাজা প্রভৃতি বেইমানি-তকমা দান করা হয়েছিল।

ভাস্কর সেতুপতি, অজিত সিং, সুঢল দেব, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, ইন্দ্রচন্দ্র, সত্যানন্দ ঘোষাল, নরেন্দ্রকৃষ্ণ, প্যারীমোহন মুখার্জী, ঈশ্বরীপ্রসাদ, প্রিয়মোহন মুখার্জী, রাধাকান্তদেব, রণজিৎ সিং, কুমুদচন্দ্র সিং, সুবোধ মল্লিক, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, জানকীনাথ রায় প্রমুখ বৃটিশের তাবেদার কর আদায়কারী জমিদার বা জামিনদার— এঁরা সকলেই পেয়েছিলেন 'রাজা' উপাধি।

পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিং, রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, জানকীনাথ বসু, গৌরীশঙ্কর, মধুসূদন রাও, ভূতনাথ দে, শরৎচন্দ্র সান্যাল, জীবনদাস, বল্লভ দাস, রাজেশ্বর মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ সরকার, গঙ্গারাম, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীননাথ সান্যাল, রাধানাথ দাস, গোপীমোহন, কুমার হরিনাথ নন্দী, বৈদ্যনাথ, শিবচরণ নন্দী, রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব, রামশঙ্কর সেন, যাদবচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র দাস, যাদবকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীনাথ পাল, বৈকুণ্ঠনাথ বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ রায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, ক্ষৌনিশ চন্দ্র, চুনীলাল বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, রাজেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রমথনাথ মল্লিক, জলধর সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, হরিসাধন দত্ত— এঁরা সব বৃটিশের পরমতর হিতৈষী বা অনুগত সাহায্যকারী; এঁরা প্রত্যেকেই উপাধি পেয়েছিলেন 'রায়বাহাদুর'।

রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ, ঈশ্বরচন্দ্র সিং, কমলাকৃষ্ণ দেব, লক্ষীসর সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামেশ্বর সিংহ, কালীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র রায় প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর, শ্রীশচন্দ্র নন্দী এঁরা সকলেই উপাধি পেয়েছিলেন 'মহারাজ'। সুঢল দেব, বিপিনকৃষ্ণ বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজকুমার ব্যানার্জী, প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, নীলরতন সরকার, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, শঙ্কর নায়ার, বিশ্বেশ্বর আয়ার, আর. এন. মুখার্জী, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিজয়চাঁদ সিংহরায় এঁরা ইংরেজি জানা সহযোগী। প্রত্যেকেই পেয়েছিলেন 'স্যার' উপাধি।

রমেশচন্দ্র দত্ত, স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী, স্যার সি.ভি. রমন, স্যার যদুনাথ সরকার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এঁরা প্রত্যেকেই 'সি. আই. ই.' অর্থাৎ Companion of the Indian Empire (ভারত সাম্রাজ্যের সহযোগী) উপাধি পেয়েছিলেন। মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের 'স্যার', 'খানবাহাদুর', C.I.E. ইত্যাদি উপাধি পাওয়ার কথা এবং তাঁদের ইতিহাস প্রথমখণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে।

এইসব 'স্যার' ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত পণ্ডিতেরা সকলেই যে খুব পণ্ডিত ছিলেন তা নয়। এমন কিছু অপণ্ডিতও এই 'স্যারে'দের দলে ঢুকবার সুযোগ পেয়েছেন যাঁরা আসলেই মূর্খ। কিন্তু বৃটিশের বিশ্বাসভাজন হওয়া, বিশেষ করে বিপ্লবীদের দমিয়ে দেওয়া, লুকিয়ে

থাকা বিপ্লবীদের ধরিয়ে দেওয়া, অকথ্য অত্যাচার চালানো, অনাদায় কর আদায় করতে অকথ্য রোলার চালানোর বিনিময়েই হয়েছিল তাঁদের এই উপাধি। একটা উদাহরণ দিলে কথাটি তথ্যপূর্ণ হয়। মহারাজা জেনারেল স্যার প্রতাপ সিং ইংলণ্ডে গিয়ে এক সম্ভ্রান্ত বৃটিশ মহিলাকে ইংরেজিতে বলতে চেয়েছিলেন— প্রত্যেক মুহূর্তেই এই ইংলণ্ড আমার ভাল লাগছে। সুন্দর ঘাসের উপর সম্ভ্রান্ত বৃটিশ পুরুষ ও মহিলারা এই যে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছেন এটা আমার খুবই ভাল লাগছে। কিন্তু জেনারেল স্যার তো ইংরেজি বলতে পারতেন না, নিজের মতো করে যে ইংরেজি বলেছিলেন তা হুবহু এই— "Lekin, lady, I every time happy this England, horses gentlemen, ladies gentlemen and grass is gentlemen."

সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে দিল্লির দরবারে লর্ড কার্জন ও তাঁর স্ত্রী হাতিতে চড়ে গিয়েছিলেন। এটা বৃটিশের হিতাকাঙ্খী স্যার প্রতাপের খুব ভাল লাগেনি। তাই তিনি খুব বিনয়ের সঙ্গে ইংরেজি ঝেড়ে বলেছিলেন, "You eating knife and fork I eating knife and fork, I not knowing this knife and fork. Great Mogul he knowing how mount this elephant. You not knowing. You sitting howdah in uniform with English lady. Great Mogul he mount properly, he dressed in white moslin and squat by himself on elephant's back. You sitting howdah, we laughing you not knowing."

এই দুটি ইংরেজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজি জানা ছাত্রদেরকে পড়তে দিলে তারাও হেসে গড়িয়ে পড়বে। আমি এক ঘণ্টা পর ভাত খেয়ে স্কুল যাব, এর ইংরেজি যদি কেউ এরকম লেখে— I one bell eat rice then I go school তা যেমন হবে ঠিক সেরকমের ইংরেজি হোল ঐ দুটি।

প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সাহেবদের বানিয়ে নেওয়া ইতিহাস মাত্র। যাদের বৌদ্ধ এবং জৈন বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল তাঁরা এবং উদ্যোক্তাদের অনেকে বাঙালী ছিলেন। যেখানে ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে ছক কষে ভবিষ্যতে প্রমাণ করার জন্য তাদের রেডিমেড ইতিহাসের ভিত্তিস্থাপন করা হয়েছে।

ভারতের সমগ্র অমুসলমানদের ইসলাম ধর্মের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ নষ্ট করে দেওয়ার জন্য বৃটিশের পরামর্শে ভারতের সহযোগীদের দ্বারা প্রচার করানো বা লেখানো হোল যে, ইসলাম ধর্ম একটা সাধারণ ধর্ম মাত্র। ভারতে বহু বড় বড় ধর্ম ছিল যেমন বৈদিক ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, বাউল ধর্ম, শৈব ধর্ম, তান্ত্রিক ধর্ম ইত্যাদি। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, অশোকের যেমন অস্তিত্ব ছিল না, তেমনই

জৈন বৌদ্ধ বলে কিছুই ছিল না। এসব কারসাজি আরম্ভ হয়েছে বৃটিশ আসার পর। একটি সুন্দরী মহিলাকে যেমন অশোক সাজানো হয়েছে, সেইরকম খুব লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মহাবীর এবং বুদ্ধের ছবি দুটি প্রায় একই। কিছু হিন্দুকে বেছে নিয়ে তাঁদেরকেই বৌদ্ধ এবং জৈন সাজানো হয়েছিল। তাঁরাও বৃটিশের তাবেদারি করতে নেমে পড়েছিলেন অভিনয়ে। কিন্তু ঠাকুর পূজার সনাতন মোহ ত্যাগ করতে না পেরে গণেশ লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা বাড়িতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডেকে এনে করিয়ে নিতেন। অথচ জৈন এবং বৌদ্ধরা মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধী এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। ঈশ্বরে অবিশ্বাসীদের কি করে ধর্মনেতা বানানো হয় সেও এক ভাববার কথা। একটি উক্তি, "জৈন ধর্ম সন্নাসীর ধর্ম। এই ধর্ম গৃহীর পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। এই জন্য জৈন মতাবলম্বী গৃহী হিন্দুগণ গণেশ লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতাকে ব্রাহ্মণ ডাকিয়া পূজা করান।... ভগবানের অস্তিত্বে জৈনগণ বিশ্বাসী নয়।" [দ্রঃ বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ধনঞ্জয় দাস মজুমদার, পৃষ্ঠা ১২১]

যোগেশচন্দ্র রায়

হিন্দু ধর্ম থেকেই বৌদ্ধ ধর্ম তৈরি করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলেন, "ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম কোন আলাদা ধর্ম, তার আলাদা ধরণের মন্দির , আলাদা ধরণের পুরোহিত ছিল এমন কথা তোমরা ভেবনা। বৌদ্ধধর্ম সবসময়েই হিন্দু ধর্মের ভেতরেই।" [বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ৮৪১]

ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথও অক্সফোর্ডের ইতিহাসের ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :"The Phrase 'Buddhist Period' found in many books is false and misleading."

আমরা সেলাই করা পোষাক মোটেই পরতে জানতাম না। কেউ ধর্মের নাম করে উলঙ্গ, কেউ অর্ধোলঙ্গ, কেউ শুধু কৌপীন পরা, খালি পা, মাথায় জটা আর বেশির ভাগ মানুষ মাথার চারিদিক মুণ্ডিত করে মাঝখানে চুলসহ টিকি রাখতেন। আশ্চর্যের কথা এটাই যে সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুণ্ডার মত একটি জাতি বা গোষ্ঠী থেকে বাঙালীদেরকে বেছে নিয়ে সারা ভারতে তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের দিয়ে ভারতবাসীকে পিটিয়ে, কারাগারে দিয়ে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে, ফাঁসি দিয়ে, গুলি করিয়ে ভারতবর্ষকে দাবিয়ে

নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে শোষণের মোটা অংশ নিয়ে চলে গেল বৃটিশ আর একটা ছোট্ট অংশ দিয়ে গেল আমাদের বাঙালীদের। পরিবর্তন হয়ে গেল আমাদের সমাজের, পরিবর্তিত হোল আমাদের পরিবেশ, পোষাক, গায়ের রং এমনকি চরিত্র পর্যন্ত অনেকখানি।

প্রথম খন্ডে আলোচনা করা হয়েছে ব্রাহ্ম ধর্ম সম্পর্কে। ওটি এমন একটি ধর্ম যেটি হিন্দু ধর্ম বিরোধী, খৃষ্টান ধর্ম-নিকটবর্তী অথচ খৃষ্টান ধর্ম নয়। প্রথমেই তৈরি করা হোল 'রাজা' উপাধিপ্রাপ্ত রামমোহনকে। তারপরেই আসরে নামানো হোল তাঁর সহধর্মী ও সহকর্মীদের। যেমন কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। তাঁদের পাঠানো হোল দক্ষিণ ভারতে। প্রতাপচন্দ্রের প্রচারের প্রাবল্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রে হৈ চৈ পড়ে গেল। কিন্তু প্রতাপবাবুর মূল কর্মক্ষেত্র ছিল বোম্বাই (মুম্বই)।

বঙ্গবাসীকে দিয়ে সারা ভারতবর্ষকে বশে আনতে হলে যাদেরকে নেতা বানানো হবে তাদের কিছুটা শিক্ষিত হতেই হয়। সেইজন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হবার আগে থেকেই বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বা তাদের গৃহভৃত্যের কাজ দিয়ে বা ছোট ছোট স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা চালু ছিল। ঐ সময়কার তথাকথিত শিক্ষিত, যারা স্কুল ফাইনাল বা ম্যাট্রিক পাশ ছিল না অথচ তাবেদারি গোলামি ও বেইমানিমূলক কাজ করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মত ও যোগ্য, তাদের জন্য বৃটিশ সরকার ব্যবস্থা করে ফেলল এবং ঠিক হোল যে, তারা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় না বসেও ডিগ্রী পরীক্ষায় বসতে পারবে। [তথ্য : কলকাতা ইতিহাসের দিনলিপি, পৃ. ৭৫, ১ম খন্ড]

কৃষ্ণনগর কলেজ থেকেই এম. এ. এবং ল' পড়ানোর কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এবার কলকাতা থেকে হুড়হুড় করে ডিগ্রী পাওয়া রেডিমেড নেতা বের হতে লাগলো। এবং তাদের ছড়িয়ে দেওয়া হোল বিভিন্ন দেশ প্রদেশে। উড়িষ্যার তখন নাম ছিল উৎকল। ১৯০১ সালে সেখানে যত বাঙালী পাঠানো হয়েছিল তার সংখ্যা দশ লাখ সাত হাজার ছশ' চল্লিশ। কর্ণেল হারকোট সাহেব গোটা উড়িষ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে যাঁকে ডানহাত বানিয়েছিলেন তিনি হলেন বাঙালী নরেন্দ্রনাথ রায়। আর পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বৃটিশকে খুশি করতে অসম্ভবকে সম্ভব করে পেয়েছিলেন 'রায়বাহাদুর' উপাধি।

মেদিনীপুর জেলাটিকে উড়িষ্যা থেকে টেনে এনে বাঙলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় বাঙালীদের পরামর্শেই। পুরীর যত মঠ আছে তার মধ্যে অনেক মঠ বাঙালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যেমন গোবর্ধন মঠ, রামানুজ মঠ, রামানন্দ মঠ, গুরুনানক ছাত্ত বা কাউলী মঠ, কবীর মঠ, মুলুকদাস মঠ, গঙ্গামাতা মঠ, জটিয়াবাবাজীর মঠ, বিদুর মঠ, রাধাকান্ত মঠ প্রভৃতি। এই বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের পিছনেও ছিল বিলেতি বুদ্ধি। বিজয়কৃষ্ণ নাকি বিরাট সাধক ছিলেন। [দ্রঃ ঐ, পৃ. ৪৯]

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে ডাকা হোত টি. এন. মুখার্জী বলে। লেখাপড়া বেশি জানতেন না। মাসিক পাঁচ টাকা মাইনের চৌকিদার ছিলেন। কর্মপটুতার জন্য হয়ে গেলেন উচ্চপর্যায়ের পুলিশকর্তা। মাইনে পাঁচ টাকা থেকে হয় মাসে ছশ' টাকা। স্যার উইলিয়াম হান্টার তাঁকে কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের উচ্চকর্মী হবার সুযোগ করে দেন। পরে কলকাতা মিউজিয়ামের সুপারিনটেনডেন্ট পদে তাঁকে অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনি তাঁর সহোদর দাদা রঙ্গলাল বাবুর সঙ্গে সহযোগিতা করে বিশ্বকোষ সৃষ্টি করেন। বেশি লেখাপড়া না জেনে ইংরেজি পুস্তক Art Manufacture of India, Visit to Europe বইগুলো লিখে ফেললেন কি করে তাও ভাববার বিষয়।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

মিউজিয়াম বা যাদুঘর সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায়, এটিও একটি চক্রান্তাগার। প্রথম খন্ডে যে সমস্ত চক্রান্তাগারের কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা শিক্ষিত লোকেদের প্রভাবিত করা যায়। কিন্তু নিরক্ষর ও অশিক্ষিত লোকদেরকেও সত্য ভুলিয়ে মিথ্যার দিকে আকর্ষিত করতে কিছু Practical জিনিসপত্র দেখিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করতে ও ভুল বোঝাতে সৃষ্টি করতে হয় কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বা যাদুঘর। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির শাখা হিসাবে তৈরি হোল কলকাতা যাদুঘর। প্রস্তাবক ছিলেন ডঃ ন্যাথিয়ানেল ওয়ালিচ। প্রথমদিকে যাদুঘর বা মিউজিয়াম কী মানুষ-তা বুঝতো না। চিড়িয়াখানার মতো মৃত জীবজন্তুতে সাজিয়ে আরও দর্শনীয় করা হোল। দর্শকের ভীড় হতে শুরু হোল। মানুষ বিশ্বাস করতে শিখলো পুরাতন সভ্যতার (!) কথা, নানা শিলালিপি, প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ ইত্যাদির কথা। ১৮৭৫-র ১ লা জুন গণনা করে দেখা হোল ১৭ ই মে থেকে ৩১ শে মে এই ১৫ দিনে যাদুঘর দেখেছিলেন ৫৮০১ জন মানুষ। ১৮৯৮-এর ৪ ঠা মার্চ দেখা গেল, ফেব্রুয়ারী মাসে ৪৬,১৬২ জন দর্শক যাদুঘর দেখেছেন। ১৮৯৯-এর মে মাসে ১৮,৪১২ জন দর্শক এসেছিলেন। ঐ বছরের অক্টোবরে যাদুঘর দেখেছেন ৪৩,২৬৪ জন। ডিসেম্বরে যান ৪৭,৮৩১ জন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারিতে যান ৫৭,৫৯৫ জন। মার্চ মাসে ৩৩,০৫৫ জন, এপ্রিল মাসে ২৭,১২৫ জন নারী পুরুষ যাদুঘর দেখেছেন।

১৯০০ সালের ডিসেম্বরে মাত্র ২৩ দিনে ৬২,১৯৪ জন দেখেছেন, জুনে ২২ দিনে দেখেছেন ৫৩,০৭৭ জন, জুলাই মাসে ৫৭,৯০৩ জন, সেপ্টেম্বরে ৫০,৯৭৩, নভেম্বর মাসে ১১ দিনে ১৮,৪৪৮ জন, ডিসেম্বর মাসে ৫১,২৮৪ জন দেখেছেন। ১৯০২-এর জানুয়ারিতে ৫৯,১০৭ জন, মার্চে ৪২,৮২০ জন, এপ্রিলে ৩৪,৪৬৬ জন, জুলাই মাসে ৪১,৫৩৮ জন, আগস্টে৪০,৭৫৫ জন, অক্টোবরে ৪৮,৪৮১ জন, নভেম্বর মাসে ২১,৯২৭ জন এবং ডিসেম্বরে ৪১,২৪২ জন যাদুঘর দেখেন।

১৯০৩-এর জানুয়ারিতে ২১ দিনে ৫১,৩৭৮ জন আসেন। এপ্রিলে ২৯,৩৪৪, সেপ্টেম্বরে ৫০,৫৬৪ জন এবং ডিসেম্বরে ৪৬,১৬০ জন যান যাদুঘর দেখতে।

১৯০৪-এর জুনে ৪৪,৮৩০ জন, জুলাই মাসে ৫৭,৭৩০, আগস্টে ৪৯,৬৭১ জন, ঐ বছর পূজোর মাসে ১,০১,২৯১ জন, ডিসেম্বরে ৫২,২৪৭ জন দেখেন ঐ যাদুঘর।

১৯০৫-এর জানুয়ারিতে ৬৪,৩২৪, ফেব্রুয়ারিতে ২১ দিনে ৫০৬১ জন, এপ্রিলে ৩৯,৪৩৬ জন, আগস্টে৫১,৪৭৯ জন, সেপ্টেম্বরে ৫১,১৬৪, নভেম্বরে ২৬,৭০৪ এবং ডিসেম্বরে ৫৬,৩৯০ জন দর্শন করেন।

১৯০৬-এর জানুয়ারিতে ৫৮,৭৯৩, অক্টোবরে ৫৮,৮৬০, নভেম্বরে ৩১,৪৩৯, ডিসেম্বরে ৭১,০১৫ জন দেখেছেন এই যাদুঘর।

১৯০৭-এর জানুয়ারিতে ২২ দিনে ৭৮,৯১৬, জুনে ২১ দিনে ৪৬,৬০৩, ডিসেম্বরে ৫২,৬১৭ জন দেখেছেন।

১৯০৮-এর জুলাইয়ে ৪৩,৯৬৫, অক্টোবরে ৯৭,৬৯৪, ডিসেম্বরে ৩৮,১৪৮ জন দেখেছেন।

১৯০৯-এর অক্টোবরে ৮৯,০৫৪ জন দেখেছেন এই যাদুঘর।

১৯১৩-র জুলাই মাসে ৭২,৭৮০ জন দেখেছেন। ঐ বছরের সেপ্টেম্বরে ১,৫৮,০৯১ জন, নভেম্বরে ৩১,৪৬৮ জন এবং ডিসেম্বরে ৭৩,৩৪১ জন এসেছেন।

১৯১৪-র ফেব্রুয়ারিতে ৭০,৫১৫, মার্চে ৬৯,৭৮০, জুনে ৭২,০৭৪, জুলাইয়ে ৫৬,৮৩৫, সেপ্টেম্বরে ৯৯,৬৯৬ জন দেখেন ঐ যাদুঘর।

১৯১৫-র জুনে ৬৭,৪৫০ এবং জুলাইয়ে ৫৬,৯১৪ জন দেখেছেন। ১৯১৬-র জানুয়ারিতে ৭২,৯৭১, মে মাসে ২৮,০৫৩, জুলাইয়ে ৬২,৬৭৫, অক্টোবরে ১,০৪,২৩৩ জন এবং নভেম্বরে দেখেছেন ২৫,২৫৭ জন।

১৯১৭-র জানুয়ারিতে ৬৮,১৪৮, মে মাসে ৫৫,৩৬৬, জুলাইয়ে ৬০,২১৫, আগস্টে ৪৮,৯৭১ এবং ডিসেম্বরে ৮৩,০১৬ জনের আগমন ঘটেছে ঐ যাদুঘরে।

১৯১৮-র জানুয়ারিতে ৭১,৪২৬, ফেব্রুয়ারিতে ৬৭,৫৩৯ জন, মার্চে ৬৫,৯০৪, মে মাসে ২৯,৮৯২, জুলাইয়ে ৭১,০৬৮, নভেম্বরে ৪০,৬২৪ জন মানুষ দর্শন করেন যাদুঘরের।

প্রমথনাথ বসু

১৯১৯-এর জানুয়ারিতে ৭৪,৪২৬ এবং জুনে ৮০,৩০০ জন দেখেছেন কলকাতার যাদুঘর।

১৯২০-র এপ্রিলে ৬৭,১৯৬ এবং ডিসেম্বরে ৮১,৩৭৩ জন দেখেছেন ঐ মিউজিয়াম।

১৯২১-এর ফেব্রুয়ারিতে ৭৩,৯৭৪ আর সেপ্টেম্বরে ৭০,৩০৮ জন দেখেছেন কলকাতার এই যাদুঘর।

[তথ্যসূত্র : কলকাতা ইতিহাসের দিনলিপি, ডঃ নীরদবরণ হাজরা, পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ]

শুধু কলকাতার যাদুঘর যদি এতো মানুষ দেখে থাকেন তাহলে সারা ভারতের অন্যান্য যাদুঘরগুলোতে প্রত্যেক বছর কি বিপুল সংখ্যক মানুষকে এই চক্রান্তের শিকার হতে হয় তা অনুমান করা যায় সহজেই।

জনসাধারণের মধ্যে যাদুঘরের প্রভাব সফল হচ্ছে দেখে বৃটিশ সরকার আরও অনেকগুলো যাদুঘর তৈরি করে ফেললো ভারতের বুকে। আজও নেহায়েত সাধারণ মানুষরা মনে করেন যে, যাদুঘর দেখা একটা তামাশা। কিন্তু তামাশা নয়, ওটা ছিল তমসাচ্ছন্ন চক্রান্ত।

প্রথম খন্ডে চক্রান্তাগারের আলোচনায় মিউজিয়াম বা যাদুঘর সম্বন্ধে আলোচনা ছিল না। মিউজিয়াম শব্দটির প্রকৃত অর্থ শিক্ষিতদের আড্ডা এবং অধ্যয়নের স্থান। বাংলায় যাদু মানে ইন্দ্রজাল, কুহক, মায়া, ভেল্কি, ভোজবাজি, বশীকরণ প্রভৃতি। অর্থাৎ মানুষকে ধোকা দিয়ে তার সঠিক বিবেক বুদ্ধির উপর আবরণ সৃষ্টি করে সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য বলে দেখানো বা শেখানো। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। সংবাদপত্র থেকে সঞ্চিত কিছুদিনের যাদুঘর দর্শনের খতিয়ান খুলে দেখা গেল ঐ ক'বছরে সরকারি ছুটি বা বন্ধের দিন বাদ দিয়ে মোট ৪৬,২৬,৪১৬ (ছেচল্লিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার চারশো ষোল) জন মানুষকে যাদু বা ভেল্কি দেখানো হয়েছে।

কি করে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ যাদুঘরের সর্বময় কর্তা হয়ে গেলেন ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

১৮৬৬-'৬৭ তে যখন উড়িষ্যায় মারাত্মক দুর্ভিক্ষ শুরু হয় তখন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হবার সম্ভাবনায় তা নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব যাঁকে দেওয়া হয়েছিল তিনি বামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়। তিনি সক্ষম হয়েছিলেন কাজ উদ্ধার করতে এবং সেইসঙ্গে নিজেরও আখের গুছিয়ে নিতে। তিনিও ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে 'রায়বাহাদুর' উপাধিপ্রাপ্ত হন। তাঁর নিজ গ্রামে একটি দিঘি সংস্কারের নামে সরকারকে দরখাস্ত করলে, ঐ বাঙালী রায়বাহাদুরকে ৯,২০০ টাকা দেওয়া হয়; যে সময় মাসিক ১৫ টাকা রোজগার করে সাধারণ মানুষ সংসার চালাতেন।

নতুন একটি সঙ্গীতের ধারা প্রচলন করতে দায়িত্ব নিয়ে তা পালন করেছিলেন যিনি তিনি হচ্ছেন বাঙালী যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী। এই ভাবে যোগেশচন্দ্র রায়, উপেন্দ্রনাথ মৈত্র, কালীপদ বসু প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দ কটক বা উড়িষ্যা গড়তে সাহায্য করেছিলেন। অধ্যাপক যোগেশবাবুকে ১৮৮৮ তে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজে বদলি করে বিশেষ শক্তি দেওয়া হয়েছিল। ক্রফ্‌ট্ সাহেব আবার কটকে ডেকে নিলেন তাঁকে। কারণ কটকের চক্রান্তাগারে সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা, রসায়নে ইসলামী শব্দ বাদ দিয়ে সংস্কৃত শব্দ তৈরি করতে প্রয়োজন হয়েছিল তাঁকে। আবগারী বিভাগের জনৈক সাহেব বন্ধুর অনুরোধে বিলেতি মদ বাদ দিয়ে সস্তায় কোন দেশি মদ প্রস্তুত করার দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। তিনি প্রথম সাদাসিধে গরীব মানুষের সর্বনাশ করতে চাল থেকে 'চুল্লু' মদ্ সৃষ্টি করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রশংসা করেছেন তাঁর। তাছাড়া তিনিও ঐ সব যজ্ঞের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন পূর্ণভাবে। 'স্যার' টাইটেল পেতে তাঁরও অসুবিধা হয়নি। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় যোগেশবাবুর 'শঙ্কু নির্মাণ', 'রত্নপরীক্ষা' পুস্তকের প্রশংসা করেন।

বাঙালী রাধানাথ দাসকে বর্ধমান বিভাগের স্কুল পরিদর্শকের পদ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল কটকে। সরকারের পক্ষ থেকে দমনকার্যে খ্যাতি লাভ করে হয়েছিলেন 'রায়বাহাদুর'। এমনিভাবে বাঙালী হরিবল্লভ বসুও সরকারের কাছ থেকে পুরস্কৃত হয়েছিলেন 'রায়বাহাদুর' হয়ে।

প্রথম খন্ডে আলোচনা হয়েছে যে, 'বেদ' 'আর্য' 'সংস্কৃত' 'পালি' 'তামিল' 'দ্রাবিড়' প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে যে বিরাট চক্রান্ত এবং গবেষণা চলছিল তার একটা বিশেষ ঘাঁটি ছিল পুরী। পুরীর সঙ্গে নবদ্বীপের চক্রান্ত প্রক্রিয়ার যোগাযোগ ছিল নিবিড়। শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখেছেন, "আমি যখন কটকে যাই উড়িষ্যা যে তখন বাংলার শাসনতন্ত্রভুক্ত ছিল তাহা নহে, বাংলার প্রাদেশিক সাধনার সঙ্গেও অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল ... তখন পুরী আর নবদ্বীপ 'এ ঘর ও ঘর' বলিয়া বিবেচিত হইত। সর্বদা লোক

যাতায়াত করিত ... সে সময়ের উড়িষ্যার চিন্তানায়কেরা সকলে না হউন অন্ততঃ অনেকেই বাংলা ভাষার অনুশীলন করিতেন এবং উড়িষ্যার স্কুলে অধিকাংশ স্থলে বাংলা ভাষাই শেখানো হইত।" [পৃ. ৪৫৪]

নীলমণি চক্রবর্তী

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, এই জ্ঞানেন্দ্রবাবুকেও কটকের কোন এক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

মুসলমান আমল থেকে পঞ্জিকার যে ব্যবহার ছিল সেটাকে উল্টে দেবার জন্য ১৯০৪-এ বোম্বাইয়ে জ্যোতিষীদের একটি সভা হয়েছিল। তাতে যোগেশবাবু Hindu Almanac Reform (হিন্দু পঞ্জিকার সংস্কার) নামে একটি পুস্তক লিখে পাঠান। ঐ পুস্তকটিতে মুসলিম পঞ্জিকা প্রথার কবর রচনা করে পঞ্জিকার নতুন একটি রূপ দেওয়া হয়। সেটি লন্ডনের রয়াল এস্ট্রোনমিকাল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানকার প্রভুরা অত্যন্ত খুশি হয়ে ঐ সোসাইটির সদস্য এবং আরও চারটি সোসাইটির সদস্য করে নেন তাঁকে। আর সাহেবদের গোড়াপত্তন করা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের লাইফ মেম্বার বা আজীবন সদস্য করে নেবার আদেশ আসে। 'বাঙ্গালা ভাষা' 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' সৃষ্টি, বিশেষ করে "বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ রচনায় যোগেশবাবু, আচার্য রায় এবং ত্রিবেদী মহাশয় প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণের ন্যায় পরিষদ পত্রিকায় তাঁহার উদ্ভাবিত অসংখ্য শব্দ প্রকাশ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখক এবং অনুবাদকের পথ অনেকটা সুগম করিয়া দিয়াছেন।" [পৃষ্ঠা ৬৫] বৃটিশ খুব খুশি হয়ে 'রায়সাহেব' উপাধিটিও দেয় ঐ বাঙালী বাবুকে। তাছাড়া অক্ষয়কুমার ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ বসু, জানকীনাথ বসু, গৌরীশঙ্কর রায় প্রভৃতি কলকাতা থেকে আমদানি হওয়া বাঙালী নেতারা কর্মরত ছিলেন ঐ উড়িষ্যায়।

গৌরীশঙ্কর রায় এবং জানকীনাথ বসু 'রায়বাহাদুর' উপাধি পেয়েছিলেন। জানকীনাথ বসুর পুত্র হচ্ছেন সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষবাবুকে সরকার কোন উপাধিই দেয়নি, বরং দিয়েছে কারাগারের যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা ও প্রতারণার পুরস্কার। কষ্ট পাওয়া জেলখাটা সুভাষবাবুকে দেশের জনগণ উপাধি দিয়েছেন 'নেতাজী'।

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়কে করা হোল দারোগাবাবু। তাঁর ছোট ভাই যাদব চন্দ্রকে দারোগা করে পরে পদ দেওয়া হোল ডেপুটি কালেক্টরের। তাঁরই স্বনামধন্য পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং বহু পদ ও উপাধিপ্রাপ্ত 'সাহিত্য সম্রাট'।

তখন বড় বড় জমিদার ছিলেন উপেন্দ্রনাথ রায়, মন্মথনাথ দে, যোগেন্দ্রনাথ বসু, হরেন্দ্র নারায়ণ রায়, রাধাকান্ত রায় প্রমুখ। সকলেই কলকাতার বাঙালী, কাজ করেছেন উড়িষ্যায়। চারুচন্দ্র মিত্র, মোহিনীমোহন চক্রবর্তী (ডিস্ট্রিকট ইঞ্জিনিয়র), শরচ্চন্দ্র বসু (সিভিল সার্জেন), হরিপদ সরকার (এ্যাসিস্ট্যান্ট সিভিল সার্জেন) এঁরা সকলেই উড়িষ্যায় হাজির হয়েছিলেন বাংলা থেকে। হেমেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও তুলসীরাম ঘোষ ছিলেন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। আগমন বঙ্গ থেকে।

বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বামড়ার রাজা স্যার সুঢল দেবের জ্যেষ্ঠপুত্র শচীদানন্দকে ইংরেজি পড়াবার। তিনি 'উড়িষ্যা ইন দ্য মেকিং' নামে একটি বই লিখলে সেটি লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ঐ আজব বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য করার জন্য আশুতোষ মুখার্জীকে আদেশ দেওয়া হয়। স্যার আশুতোষ সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে অধ্যাপনার বিষয় বলে স্বীকৃতি দিয়ে দেন।

কটকের সমস্ত স্কুলগুলোর ইন্সপেক্টর মধুসূদন রাও ছিলেন একজন 'রায়বাহাদুর' প্রাপ্ত বাঙালী নেতা।

রমেশচন্দ্র দত্ত উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার ছিলেন। ঐ বাঙালী সহযোগীকে সরকার C. I. E. উপাধি সেই সঙ্গে 'স্যার' উপাধিও দিয়েছিলেন।

বাঙালীর চরিত্রের অদ্ভুত চিহ্ন হিসাবে বলা যায়, সাধারণ ইংরেজি স্কুলগুলো শুধু উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাত্রদের পড়ানোর জন্যই ছিল। আর অনান্যদের ('ছোটলোক'দের) স্কুলের নাম ছিল 'অনার্য বিদ্যালয়'—"বামড়া রজ্যে যে রাজ ইংরেজি বিদ্যালয় আছে, তথায় হিন্দু ছেলেরাই পড়িয়া থাকে। আর একটি স্কুল আছে, 'অনার্য বিদ্যালয়'। এখানে আদিম অনার্য জাতীয় ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়া থাকে। রাজ্যের সর্বত্রই এই প্রকার প্রাথমিক বিদ্যালয় বা পাঠশালা আছে।" [বঙ্গের বাহিরে বাঙালী, জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, পৃ. ৮৪]

লন্ডন পাশ করা প্রমথনাথ বসু, যোগেশচন্দ্র দাস, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে লালাবাবু, বিপিনবিহারী রায় প্রভৃতি বিখ্যাত বাঙালী ব্যক্তিরদেরও কর্মক্ষেত্র ছিল উৎকল বা উড়িষ্যায়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের একটি হিসাবে উৎকলে ১ লাখ ১৩ হাজার ভাগ্যবান বাঙালী আসেন বলে জানা যায়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের সময় হতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি রেডিমেড নেতাদের হুড়হুড় করে মধ্যপ্রদেশে পাঠানো শুরু হয়। ১৮৮১ তে যখন লোক

গণনা হয়েছিল তখন দেখা গেছে নাগপুর বিভাগে ১৩৩, জব্বলপুর বিভাগে ৪৪৯, নর্মদা বিভাগে ১৮২, ছত্তিশগড় বিভাগে ১২৫৬ এবং সমগ্র মধ্যপ্রদেশে ২০২০ জন বাঙালীকে পাঠানো হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে। ১৯১১-র লোকগণনায় দেখা গেল, ২৫৪০ জন বাঙালী বৃটিশ অধিকৃত মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের অধিবাসী।

গোবিন্দচন্দ্র সেনমুন্সী

২৪ পরগণার টাকীর রামদেবের পুত্র রামকান্ত মুন্সী বড়লাট হেস্টিংস স্যার কর্ণওয়ালিশ ও স্যার জন শোরের কাছে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ প্রভৃতি জেলায় এমন কর্ম দেখালেন যে, "লাট হেস্টিংস বাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুইখানি তালুক, মণিমুক্তাখচিত শিরোপা, ব্যজন এবং হীরকখচিত কোষসহ তরবারি খিলাত দিয়াছিলেন।"

গোবিন্দ চন্দ্র সেন মুন্সী, ঈশ্বরচন্দ্র রায়বাহাদুর প্রভৃতি বাঙালী নেতারা ভালই আসর জমিয়েছিলেন সেখানে। এমনিভাবে গোবিন্দবাবু, শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বীরেশ্বর দত্ত, কৈলাশ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীনাথ হুড় বড়বড় কাজে নিয়োজিত হয়ে মুগ্ধ করেছিলেন ইংরেজ সরকারকে আর নিজেরাও লাখ লাখ টাকা রোজগার করেছিলেন। জিনিসপত্রের দর সস্তা ছিল বলে তাঁদের অবস্থা হয়ে গিয়েছিল আঙুল ফুলে কলাগাছ। মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, তখন এক নম্বর চালের দর ছিল এক টাকায় ২৮ সের, গরুর খাঁটি দুধ এক টাকায় চোদ্দ সের, এক নম্বর ঘি টাকায় তিন সের। একটি হিসাবে বলা যায়, প্রতিদিন পোলাও কোরমা আর ঘিয়ের খাবার খেয়ে সারামাসে তখন ছ'-সাত টাকা ব্যয় হোত মাত্র।

প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন বা বিকৃত নামে 'সিপাহী বিদ্রোহে'র সময় আমাদের বাঙালীরা যেভাবে ইংরেজকে রক্ষা করেছেন এবং দেশবাসীর পরিকল্পনাকে উল্টে দিয়েছেন তা বড় হৃদয় বিদারক। গোবিন্দবাবুর বৃটিশ সেবার কথা উদাহরণ স্বরূপ মনে করিয়ে দেওয়া যায় : "তিনি এই সময় ৪র্থ সংখ্যক মাদ্রাজ ক্যাভালরির কাপ্তেন সি. আর. স্টেনফোর্থকে বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের পক্ষে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন সাহেব তাহা ভুলিতে না পারিয়া চার বৎসর পরে একখানি প্রশংসাপত্র লিখিয়া ছিলেন — "Govind Chandar Sen, ... in 1857, made himself generally useful to me during the time I

was at Sitabaldee in that year when the disturbance in the irregular cavalry was settled..."

গোবিন্দবাবু ইংরেজের এতই প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের বিপ্লবী নেতা কাদির খাঁন সহ আটশো জনের প্রাণদন্ড দেবার কথা হয়। শেষে কোর্ট মার্শাল ল' মকুব রেখে নাগপুরের রেসিডেন্ট ও সিভিল মিলিটারি কর্তা হিসাবে তাঁকেই দায়িত্ব দেওয়া হয় তিনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। "এই পত্রাদেশ অবগত হইয়া পুনর্বিচার আরম্ভ হয়।" যাঁদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তাঁদের নেতা কাদির খাঁনের জন্য বলা হয়েছে "ইঁহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিলে ক্ষত হইত না; কেবলমাত্র দাগ হইত এই ব্যক্তি ফাঁসি কাষ্ঠ হইতে ছয়বার দড়ি ছিঁড়িয়া ভূমিতে পড়ে। তথাপি তাহাকে সীতাবলদি হিল কোর্টের উপরে ফাঁসি দেওয়া হয়। এইরূপ করিয়া আরও ছয়জনের ফাঁসি দিয়া তাহাদের মৃতদেহ চুনপূর্ণ গর্তে ফেলিয়া ভস্ম করা হয়।"

হরিমোহন সেন, রামজীবন চক্রবর্তী, বিপিনকৃষ্ণ বসু বাহাদুর এঁরা সব সরকারের খাস ব্যক্তি ছিলেন। অবশ্য বিপিনবাবু সেজন্য স্যার, C. I. E. প্রভৃতি উপাধি পেয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে পেয়েছিলেন নাইট উপাধিও। যেসব নেতাদের নাম করা হয়েছে বা হচ্ছে তাঁরা বেশির ভাগই ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। তার মধ্যে দু একজন খৃষ্টধর্ম প্রকাশ্যেই গ্রহণ করেছিলেন। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের কাজ শুরু হওয়ার পরেই তিনশো ঘর বাঙালী সেখানে উপস্থিত হন সগৌরবে। তারাদাসবাবু, ভূতনাথবাবু এবং বিহারীলাল বসু তিনজনেই প্রতিষ্ঠিত বাঙালী। ভূতনাথবাবুর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে সরকার তাঁকে দিয়েছিলেন 'রায়বাহাদুর' উপাধি। নাগপুর কলেজকে মনের মত করে চালাতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে কৈলাস চন্দ্র দত্ত এবং আরও কিছু বাঙালী সহযোগী আনা হয়। তার মধ্যে একজন খৃষ্টীয় মিশনারী হেষ্টী সাহেবের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ব্রজেন্দ্রবাবুও পেয়েছিলেন 'স্যার' উপাধি। পরে তাঁকে মহীশূর ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর করে দেওয়া হয়। এইভাবে জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র, মন্মথনাথ ভট্টাচার্য, রাজেশ্বর মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি করা নেতা ছিলেন।

জব্বলপুরে জল সরবরাহ, জব্বলপুর ও মান্ডালার মধ্যে রাজপথ নির্মাণ এবং ওয়াবোরা কয়লাখনির দায়িত্বে যাঁকে আনা হয়েছিল তিনি পূর্ববঙ্গীয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৮২-তে তাঁকে আসামে বদলি করা হয়।

জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র ব্যারিষ্টার ছিলেন। তিনিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর 'স্যার রিচার্ড নর্থ প্রমুখ প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের ভুরি ভুরি প্রশংসা লাভ করেন।' জ্যোতিষচন্দ্র, মিঃ এল. পালিত উভয়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত ব্যক্তি। জ্যোতির্ষচন্দ্র বিলেত ফেরা বাঙালী নেতা; বৃটিশকে মুগ্ধ করে 'একশত গিনির (স্বর্ণমুদ্রা) দুইটি বৃত্তি ও অন্যান্য বৃত্তিও লাভ করেন।' তিনি ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্রের নাতি। [দ্র: দি ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ, ৮.২.১৮৮৯]

বিপিনকৃষ্ণ বসুও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দামী নেতা হিসাবে মধ্যপ্রদেশে এসে হতে পেরেছিলেন এ্যাডিশনাল জুডিসিয়াল কমিশনার। সরকারকে খুশি করে তিনিও হয়েছিলেন 'স্যার'।

বিপিনকৃষ্ণ বসু

এইভাবে নাগপুর বিভাগ ছাড়াও ১৯১১-তে ভান্ডারায় আঠারো জন, বালাঘাট বিয়াল্লিশ এবং বরধায় পনেরো জন বাঙালীকে কলকাতা থেকে সাপ্লাই করা হয়েছিল। বালাঘাটের গভঃ স্কুলের হেডমাষ্টার এ. এল. মুখার্জী এবং সেই সঙ্গে সি. কে. চ্যাটার্জী খুব নাম কিনেছিলেন। মিঃ চ্যাটার্জী পেয়েছিলেন 'রায়বাহাদুর' উপাধি। নাগপুরে বাঙালীদের থিয়েটার এবং দুর্গাপূজোর প্রচলন করায় বেশি খুশি হয়েছিল সাহেবরা। তখনকার জব্বলপুরের যত নেতা ছিলেন সকলেই বাঙলা থেকে আমদানি করা। যেমন শ্রীনাথ বসু, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বীরেশ্বর দত্ত, হরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। কালীবাবু খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

অম্বিকা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতেই দুর্গাপূজোর ব্যবস্থা হয়। এইভাবে বাঙলার দেবদেবীগণও সর্বভারতীয় হতে থাকেন।

আর এক বাঙালী হলেন দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। প্রথম শ্রেণীর সহযোগী হওয়ায় পেয়েছিলেন 'স্যার' উপাধি। কৈলাসবাবু, জীবনচন্দ্রবাবু, শ্রীশ চন্দ্র রায় প্রভৃতি বাঙালী সহযোগীরা সরকারের কাছে নাম কিনেছিলেন। অর্থবৃদ্ধি হতে হতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ও জমিদাররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন গোকুল দাস। সরকারের শাসন ও শোষণে সাহায্য করে পেয়েছিলেন 'রাজা' উপাধি। সেই সময় জব্বলপুর কলেজের অধ্যাপক তড়িৎ কান্তি বক্সী বলেছিলেন, গোকুল দাসকে যদি জব্বলপুরের 'রাজা' বলা হয় তবে 'শ্রীশ বাবুকে কিংমেকার সহজেই বলা যায়'।

১৮৯৮-এ প্যারীচাঁদ মিত্র এখানে এসে বহু খনির স্বত্বাধিকারী বা মালিক হন। লন্ডন ফেরত বাঙালী মিঃ ই. দত্ত ১৯১৫-তে জব্বলপুরে আসেন এবং প্রতিষ্ঠিত হন। জীবনদাস

ও বল্লভদাস শুধু প্রতিষ্ঠিতই হননি, 'রায়বাহাদুর' উপাধিও পেয়েছিলেন। মোহনচন্দ্র স্কুল কলেজে না পড়েই কাজ চালাবার মত বিদ্যে শিখে অতিরিক্ত এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদ লাভ করেন। হরিদাস গোস্বামী এখানে এসে ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার হন। উমাচরণ মুখোপাধ্যায়, সাধারণ মানুষ যাঁকে 'মামা' বলতেন, খুব গাঁজা সেবন করতেন। খুব অল্প লেখাপড়া জেনেই ডেপুটি কমিশনার অফিসে ক্লার্ক হতে পেরেছিলেন তিনি। এখানকার হাসপাতালগুলোতে বাঙালী যে সমস্ত ডাক্তার আমদানি করা হয়েছিল তাঁরা হলেন ডাঃ রাধানাথ, ডাঃ উপেন্দ্রমোহন, 'রায়বাহাদুর' উপাধিপ্রাপ্ত বিখ্যাত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বরাট প্রমুখ। অধ্যাপক হিসাবে যাঁদেরকে নিয়ে আসা হয়েছিল তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন বাঙালী। যেমন, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, অপূর্বচন্দ্র দত্ত, হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। কোর্টের উকিল যাঁরা এখানে ছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই আগত বঙ্গদেশ থেকে। যেমন, ব্রজেন্দ্রনাথ, কুঞ্জবিহারী, শরৎ চন্দ্র মুখার্জী, পি. সি. দত্ত প্রমুখ। শরৎ চন্দ্র সান্যাল সেশন জজ ছিলেন এবং ছিলেন 'রায়বাহাদুর' প্রাপ্ত ব্যক্তি।

যাঁর হাতে দিল্লির দরবারের বন্দোবস্তের ভার দিয়েছিল ইংরেজ সরকার, তিনি হচ্ছেন গঙ্গারামবাবু। 'রায়বাহাদুর' উপাধি সহ অনেক শংসাপত্রও পেয়েছিলেন তিনি।

মধ্যপ্রদেশ গিয়ে জজ হয়েছিলেন গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়। স্যার এ্যান্টনি মধ্যপ্রদেশের উন্নতি ও বিচার বিভাগের সংস্কারের জন্য একজন সুযোগ্য জজ কলকাতা হাইকোর্ট থেকে চেয়ে পাঠালে তাঁকেই পাঠানো হয়। এঁর বাবাও ছিলেন বিখ্যাত ব্যক্তি ভূদেব মুখোপাধ্যায়। যিনি ছিলেন লেখক এবং বৃটিশের পরামর্শদাতা। বৃটিশের সহযোগী বলেই পেয়েছিলেন C. I. E. উপাধি।

কিরণচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক তড়িৎকান্তি বক্সী, দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বরাট— মধ্যপ্রদেশ গড়ার পিছনে এঁদের অবদান ছিল যথেষ্ট। এখানে বাঙালী ছেলেদের হিন্দি ভাষা শেখাবার স্রোত এনে দিয়েছিলেন তাঁরা। ভারতের রাজভাষা যে হিন্দি হয়েছে তার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন ঐ বাঙালী ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৯২৪-এ বাঙালীদের একটি সম্মেলন হয়েছিল রায়পুরে। তাতে কোথায় ক'ঘর বাঙালী স্থায়ী হয়েছিল তার মোটামুটি হিসাব পাওয়া গেছে। নরসিংপুরে দু'ঘর, বালাঘাটে দু'ঘর, ইটারসিতে দু'ঘর, দ্রুগে তিন ঘর, খান্ডবা ও অমরাবতীতে পাঁচ ঘর করে, সাগরে ছ'ঘর, দামোতে ও রায়গড়ে চার ঘর করে, রাজনন্দ গাঁয়ে দু'ঘর, কাটনীতে দশ ঘর, রায়পুরে ষাট ঘর, জুকেহীতে সাত ঘর, জব্বলপুরে ১৩৬ ঘর, আর নাগপুরে চারশো ঘরের বেশি বাঙালী গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছিলেন তখন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭-তে সৃষ্টি হয়। তার পূর্বে অল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং প্রকৃত শিক্ষিত লোক তৈরির ব্যবস্থা নানাভাবে করা হোত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়ে যাবার অর্থই হোল সারা ভারতবর্ষের গোলাম তৈরি করার কারখানার রূপায়ণ। স্বামী বিবেকানন্দ এটা উপলব্ধি করে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই বলেছিলেন— ''কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কুড়ি বছরের বেশি হোল মেয়েদের জন্য ওর দরজা খুলে রেখেছে। আমার মনে আছে, যে বছর আমি বি. এ. পরীক্ষা পাস করি সে বছর কয়েকজন ছাত্রীও ঐ পরীক্ষা পাস করে। বিদেশী প্রবর্তিত স্কুল কলেজগুলোর উদ্দেশ্য অনেক কেরানী, পোষ্টমাষ্টার, টেলিগ্রাফ অপারেটর প্রভৃতি তৈরি করে অল্প অর্থের বদলে প্রয়োজনের উপযুক্ত একদল কাজে পটু চাকর পাওয়া। এটাই হোল শিক্ষার আসল রূপ।''

ভূতনাথ দে

[দ্রষ্টব্য বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র, পৃ. ৬৯০]

বিবেকানন্দের এই কথা বাস্তবিকই সত্য। কারণ বাঙালী গোলাম ও চাকরদের যে বেতন দেওয়া হোত তাতে তাঁরা হঠাৎ ধনী হলেও ঐ পদে ইংরেজ যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের বেতন ও সুযোগ সুবিধা ছিল বহু বেশি।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা ডাকঘরের হিসাব অফিস ভেঙে তার একটা অংশ নাগপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে সরকারের অনুগ্রহে পাঁচশত বাঙালীকে সেই অফিসের কাজে নাগপুরে আসতে হয়। শুধু তাই নয়, সরকার ঐ বাঙালীবাবুদের জন্য বাংলা ভাষা শেখবার স্কুলও গড়ে দেন। সেই স্কুলকে মিডল স্তর পর্যন্ত উন্নীত করা হয়। বাঙালী সহযোগী স্যার বিনয়কৃষ্ণ বসুর ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। জব্বলপুরের স্কুলগুলোতে বাঙলা শেখার ব্যবস্থা ছিল না। বাঙালীবাবুদের প্রার্থনার প্রেক্ষিতে ১৯০১ সালে সুব্যবস্থা হয়ে যায়। সেইসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য বাংলা লাইব্রেরিও সৃষ্টি হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন কিরণকৃষ্ণ মিত্র, অধ্যাপক অপূর্ব দত্ত ও রায়বাহাদুর ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বরাট। মধ্যপ্রদেশের সমস্ত স্কুলে বাংলা ভাষাও অন্যতম ভাষা হিসাবে গৃহীত হোল। 'বাঙালীদের বাস হিসাবে হেড কোয়ার্টার জব্বলপুরের পরই সাগরের উল্লেখ' করতে হয়। সাগরেও হুড়হুড় করে বাঙালী কর্মী আমদানি হয়। '১৮৫৭ অব্দে এখানে সিপাহী বিদ্রোহ অতিশয়

ভীষণভাব ধারণ করিয়াছিল।' স্যার হিউরোজ বাঙালীবাবুদের সাহায্যে বিপ্লবীদের কঠিনভাবে দমন করতে পেরে খ্যাতিলাভ করেন। আদিত্যরাম ভট্টাচার্য, কুঞ্জবিহারী গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙালীবৃন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন সেখানে। হরিনাথ দে, রায়বাহাদুর ভূতনাথ দে এবং রায়বাহাদুর তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন সেখানে। রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ দে খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন প্রকাশ্যেই। বাকী যেসব বাঙালীবাবুদের পরিচয় দেওয়া হোল বা হচ্ছে তাঁরা অধিকাংশই ব্রাহ্ম ধর্মের বলে পরিচয় দিতেন। মজার কথা হোল, ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান হলেও ভিতরে ভিতরে তাঁরা অনেকেই হিন্দু ধর্মের প্রতি প্রীতি রেখে হিন্দু ধর্মীয় আচার নিজ পরিবার ও পরিবেশের মধ্যে পালন করে যেতেন।

জ্যোতিপ্রসাদ মুখার্জী, ইঞ্জিনিয়ার হরিনাথ চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতি বাঙালী বাবুরা ছিলেন যথেষ্ট নামকরা ব্যক্তি। 'রাজা' প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে দেশলাইয়ের যে কারখানা করেছিলেন, অল্প বেতনের রেলের সিগনালার অমৃতলাল বসু নামে এক কর্মচারী তার দায়িত্ব নেন। চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েতে কন্ট্রাকটারি করে প্রায় দু'লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। এবং সেই সমস্ত উপার্জন এই কারখানায় নিয়োগ করেন। এইভাবে ডাঃ এল. চৌধুরী, ব্যারিষ্টার রায়বাহাদুর এইচ. মিত্র, হরিদাস চ্যাটার্জী, সত্যপ্রসন্ন মিত্র, প্যারীলাল ব্যানার্জী, কুঞ্জলাল গাঙ্গুলী, মর্তন্ডরাম মজুমদার, ডাঃ পি. এন. সেন প্রভৃতি বাঙালী ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন পূর্ণভাবে।

আর এক বিখ্যাত বাঙালী হরিদাসবাবু। ইনি চিনি তৈরি ও খেজুর চাষ করে বিরাট ব্যবসায়ী হন। তাঁর ব্যবসায় একটার নাম দিয়েছিলেন হরিদাস চ্যাটার্জী এন্ড কোম্পানী। আর খেজুর ও চিনি ব্যবসার নাম দিয়েছিলেন ডেট এন্ড কেন সুগার কোম্পানী। তিনি সে বাজারের লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ হরিদাসবাবুর বাড়ীতে একমাস অবস্থান করেন। স্বামীজী একমাস কী করেছিলেন কেন সেখানে ছিলেন— এ আলোচনার স্থান এটা নয়। বেটুল নামক স্থানে মারাঠী, হিন্দি, গোন্ড ও কর্কী ভাষা প্রচলিত ছিল। এখানে ১৯১১-তে ১০২ জন বাঙালী পাঠানো হয়েছিল।

বেরারে ১৯১১-তে ১৫৪ জন বাঙালী ছিলেন। জ্যোতমলে ৩২ জন বাঙালী ছিলেন। দক্ষিণ পাটনা, শোনপুর ও বামড়ায় ১৬৪ জনকে আনা হয়েছিল। রায়গড়েও ছিলেন ৪২ জন। ১৯১৬-তে ইংরেজের আদেশে নিজাম গভর্নমেন্ট রাজ্যের ধর্মগুলোর মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্মকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন নিজাম রাজ্যভুক্ত অজন্তা গুহাগুলো বৌদ্ধধর্মের মহাতীর্থ। প্রত্নতাত্ত্বিক, চিত্রশিল্পী, ঐতিহাসিকদের সন্ধানভান্ডার ও মহামিলন স্থান এই অজন্তার

প্রচার কাজ শুরু হয়ে গেল। অসিতকুমার হালদার ও নন্দলাল বসুর মত চিত্রকর ও শিল্পীদের দু-দুবার পাঠানো হোল সেখানে। ১৯০১-এ ১৯৪ জন বাঙালী পৌঁছে গিয়েছিলেন। বাঙালীর আধিক্যে হায়দ্রাবাদের এক স্থানের নাম হয় বাঙালীগোড়া। এই গোড়া 'গড়' শব্দ থেকেই তৈরি।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

নিজাম বাহাদুরের মন্ত্রীর নাম সালারজঙ্গ। তাঁকে ইংরেজরা আগেই বশ করে ফেলেছিল। সালারজঙ্গকে এই আঁতাতে রাজী হবার জন্য দেওয়া হয় 'স্যার' উপাধি। যাঁকে দিয়ে স্যার সালারজঙ্গ বা নিজামকে প্রভাবিত করা হোত সেই বিখ্যাত বাঙালী হলেন গোবিন্দবাবু। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ গোবিন্দবাবুকে অনেক বুঝিয়ে ছিলেন যে তিনি যেন ইংরেজবিরোধী হয়ে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। রাণী তাঁকে ২২ ভরি সোনার গহনাও দিয়েছিলেন। শেষ সিদ্ধান্তে তিনি বলেছিলেন যে, কোম্পানীর 'নিমক খাইয়া অন্য দলে যাওয়া সঠিক হইবে না'।

আর এক বাঙালী নেতা হলেন মধুসূদনবাবু। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল, মধুসূদনবাবুর হাতে তখন ছিল সরকারের প্রচুর অর্থ। সিপাহী বিদ্রোহের বিপ্লবী নেতারা তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে টাকাপয়সা নেবার চেষ্টা করলে তিনি সেসব জীবন পণ করে রক্ষা করেছিলেন এবং ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পালিয়েছিলেন। বিপ্লবীদের ভয়ে সারাদিন লুকিয়ে রাত্রে স্ত্রীলোকের পোষাক পরে হাঁটাপথে পালিয়ে গিয়ে লর্ড গফ্ ও জেনারেল হ্যাভলকের সৈন্যদলে মিলিত হন। জেনারেল মধুসূদনবাবুকে বলেছিলেন— 'এ দুর্দিনে আপনার রাজভক্তি ও সাহস আমাদের মনে থাকবে।' অবশ্য পরে তাঁকে প্রাপ্য পুরস্কার হিসাবে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে বহাল করেছিল সরকার। তাঁরই সহপাঠী বন্ধু মন্নুলালকে সালারজঙ্গ কর্তৃক ডেকে আনিয়ে নিজাম রাজ্যের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পদে বসানো হয়েছিল।

১৮৮৭-তে ইন্টারন্যাশনাল এগজিবিশন হয় কলকাতায়। নিজামের সপরিবারে যাওয়া এবং থাকা খাওয়ার দায়িত্ব পড়েছিল মধুসূদনবাবুর উপর। তিনি পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের প্রাসাদ ভাড়া করে নিজামের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐ উপলক্ষে

মধুসূদনবাবু হিসাব দিয়েছিলেন সে বাজারের দেড় কোটি টাকা মাত্র। 'কানপুরে তাঁহার হস্তে যখন ইংরেজ সরকারের প্রচুর অর্থ ছিল তখন জনৈক বন্ধু এবং অন্যান্য দুই একজন লোক তাঁহার হস্তে ন্যস্ত বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করিবার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন।' কিন্তু ইংরেজভক্ত মধুসূদনবাবু উত্তর দিয়েছিলেন, 'দাদা টাকার চেয়ে বিশ্বাসের দাম অনেক বেশি।' এই বিরাট নামকরা ইংরেজের বিশ্বস্ত বাঙালীবাবুর বাড়ীতেই '১৮৯২ অব্দে স্বামী বিবেকানন্দ হায়দ্রাবাদ আসিয়া তাঁহার বাসায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন।' বৃটিশের ঐ রকম বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে চাকরির বয়স শেষ হবার পরও চাকরিতে বহাল রাখা হয় এবং ৭৩ বছর বয়সে পেনসন পেতে শুরু করেন। বৃটিশের দালাল নিজাম বাহাদুরের কর্মচারী স্যার সালারজঙ্গের সহায়তায় নিজামের ফালকনামা প্যালেস, ফখ্রুল মুলকের শৈলাবাস, চারমিনারের নবশ্রী ও মুসী নদীর উপর প্রশস্ত সেতু তৈরিতে তাঁর ইতিহাস মিশে আছে।

সরোজিনী নাইডুর বাবা ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। ঐ বিলেত ফেরা বাঙালীকে মধুসূদনবাবুর 'রামর্শে সালারজঙ্গের সহায়তায় হায়দ্রাবাদ রাজ্যে শিক্ষার উন্নতি করার জন্য নিযুক্ত ক'রা হয়েছিল। অঘোরনাথের আদি নিবাস বর্ধমান জেলার পাটুলী গ্রাম।

ডাঃ নিশি কান্ত চ্যাটার্জী বিলেত থেকে ফিরে এসে ইংরেজের সুদৃষ্টিতে পড়ার ফলে ১৮৮৩-র ২২শে ফেব্রুয়ারি যখন কলকাতায় ফেরেন তখন তাঁকে সম্মান জানানোর ব্যবস্থা করা হয়। অভ্যর্থনার দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন আনন্দমোহন বসু, রজনী রায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ব্রাহ্ম নেতা কেশব সেন ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অনেকে। ডাঃ পি. কে. রায়ের বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকা থেকেও ইংরেজ প্রেমিকরা অনেকে এসেছিলেন। সেখানে ইংরেজি ও দেশীয় গান বাজনা ও নানারকম খানাপিনা সেইসঙ্গে থিয়েটারের গান এমন জাঁকজমকের সঙ্গে হয়েছিল যে ইংরেজ জজ্ মিঃ ব্রাট স্বয়ং বাজনার তালে তালে নেচেছিলেন।

নিশিকান্তবাবু দশটি ভাষায় পন্ডিত ছিলেন। লর্ড রিপন বাহাদুর তাঁকে পররাষ্ট্র বিভাগে খুব বড় পদ দেবার জন্য স্টেট্ সেক্রেটারিকে পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় ইংরেজ বিরোধী বিপ্লবী মাওলানা চেরাগ আলির একটি উর্দু বইয়ের ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর সংগৃহীত তথ্যভান্ডার থেকে কিছু তথ্যও সরবরাহ করে বইটিতে যোগ করেছিলেন তিনি। অনুবাদের পর নাম হয় A Histoary of Zageers। এই কথা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজে জবাব হয়। তাঁর সমস্ত উন্নতির মই কেড়ে নেওয়া হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হোল, এত বড় একটা পান্ডিত্যের স্বীকৃতি

এবং তাঁর ইতিহাস দেশীয় বাবুরা কিভাবে ভুলে গেলেন? যদি বৃটিশের ভয়েই তা হয়েছিল মনে করা যায় তাহলে দেশ স্বাধীন হবার পরে কাগজের উপর সামান্য কালি ছড়িয়েও কি নিশিকান্তবাবুকেঅমর করা যেত না?

ত্রৈলোক্যনাথ শীল, নন্দলাল শীল, সিদ্ধমোহন মিত্র প্রভৃতি বাঙালী বাবুরা হায়দ্রাবাদে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। ভাগ্যবান সিদ্ধমোহন মিত্র আরবী ফারসী বই-এর উদ্ধৃতি দিয়ে কোরআন হাদীসের অংশ যোগবিয়োগ করে মুসলমানদের গো হত্যার বিরুদ্ধে একটি গ্রন্থ তৈরি করেন। ভারতে হিন্দু মুসলমানের ভবিষ্যৎ লড়াইয়ে কাজে লাগবে বলেই হয়তো বিলেতে সেটির প্রশংসা হয় এবং রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে স্থান পায়।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ডাঃ বরোদাচরণ মিত্র, এস. কে. মুখার্জী, কালীদাস দত্ত, কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙালীরা হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত বাবু ছিলেন। এইভাবে বোম্বাই এবং গোয়াতেও প্রচুর পরিমাণে বাঙালী সহযোগীদের পাঠানো হয়েছিল।

মারাঠী লুন্ঠনকারী অখ্যাত শিবাজীকে বিখ্যাত করার গোড়াপত্তন যিনি করেছিলেন তিনি বাঙালী পন্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী। বাঙলার দেবদেবীগণ বাঙালীদের সঙ্গেই ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। ষষ্ঠী এবং দুর্গাপূজো বাঙালীদের মাধ্যমেই মহারাষ্ট্রে পৌঁছেছে।

ইংরেজরা ভারতে সর্বপ্রথম কুঠী স্থাপন করে সুরাটে। ধর্মানন্দবাবু যখন সুরাটে উপস্থিত হন তখন তিনি বলেন, "পবিত্র মন্দিরের দ্বারদেশে গিয়া দেখিলাম কেহ প্রণাম করিতেছে কেহ হাতজোড় করিয়া দন্ডায়মান আছে। কেহ পুষ্প নিক্ষেপ করিতেছে, কেহ স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছে, কেহ নাচিতেছে কেহ গাহিতেছে ইত্যাদি। ... ইত্যবসরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম একটি গৃহে শ্রী গৌরাঙ্গের এবং আর একটি গৃহে শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার যুগল মূর্তি বর্তমান। দুইটি মূর্তি অতীব মনমোহন। মহাপ্রভুর মূর্তির সম্মুখে অনেকগুলি হস্তলিখিত গ্রন্থ বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া রক্ষিত আছে; একখানি বড় পুস্তকের আবরণের উপরে বাঙ্গালা ভাষায় বড় বড় অক্ষরে 'ভক্তমাল' এবং আর একখানি অনতিবৃহৎ গ্রন্থের কাপড়ে 'শ্রী চৈতন্যমঙ্গল'— এই কথাগুলি লেখা আছে। গুজরাট মন্দিরে বাঙ্গালাগ্রন্থ ও বাঙ্গ

লা অক্ষর দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলাম। ... একজন হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব কহিলেন, মহাশয়! যাঁহার চরণ কৃপায় জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়াছিল সেই করুণানিধি শ্রীশ্রী গৌরচন্দ্রের এই মন্দির এবং এই সম্পত্তি। সম্মুখস্থ উদ্যানটিও তাঁহার। এই মন্দির একটি বাঙালী বৈষ্ণবীর আশ্চর্য কীর্তি।" [তথ্য, ঐ, পৃ. ২১৭] অতএব ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম ও মতবাদের গোড়ায় বাঙালীবাবুদের ভূমিকা এক দুর্বোধ্য বিস্ময়।

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত হিন্দু ধর্মপ্রচারক হিসেবে যাঁর খুব নামডাক তিনি হচ্ছেন শ্রী বিশ্বরূপ। তিনিও বাঙালী এবং বাঙালী শ্রী গৌরাঙ্গর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। গুজরাটে একটি মন্দিরের নাম 'গৌড়ীয় গদি'। কেউ কেউ এটাকে 'মাঈজী কা আখড়া' বলে থাকেন। এ সবই বাঙালী বাবুদের কীর্তি।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সুরাট ইংরেজের হাতের মুঠোয় আসে। "তখন হইতে চাকরী সূত্রে এখানের বাঙালীর প্রবাসবাসের সূত্রপাত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে চিকিৎসা, বিচার ও পূর্তাদি বিভাগে বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ বাঙালীরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বাবু ভূতনাথ চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"

এইভাবে কালদগী, আহমেদাবাদ, ভরোচ, সুরাট, হায়দ্রাবাদ, নাসিক, ধারবার ও পুনা প্রভৃতি স্থানে বাঙালীরা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন ইংরেজের সহায়তায়।

পন্ডিতরা বলেন "শূর্পনখার নাসাচ্ছেদন হইতে স্থানের নাম নাসিক।" টলেমি তাঁর ভূগোলে নাসিকের উল্লেখ করেছিলেন। "কথিত আছে সত্যযুগে ইহার নাম ছিল পদ্মনগর। ত্রেতায় ছিল ত্রিকন্টক। দ্বাপরে জনস্থান এবং কলিতে নাসিক। বাল্মিকীর রামায়ণে অবশ্যই জনস্থানই বর্ণিত হইয়াছে।" আধুনিক গবেষকদের অনেকে মনে করেন এই সব ধর্মীয় কাহিনী বাঙালী বাবুদের দ্বারা বাঙলার বাইরেই ইংরেজের সহায়তায় বিশেষ পরিকল্পনায় প্রস্তুত হয়েছে।

নাসিক থেকে ত্রিশ মাইল উত্তরে কালিকাতীর্থ আশ্রমের তীর্থস্থান বলে সুনাম আছে। সেটির উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতার নাম গৌরস্বামী। তিনিও বাঙালী। আহমাদনগরে প্রতি বৎসর জুন মাসে যাঁকে কেন্দ্র করে মেলা বসে সেই সাধু বা সন্ন্যাসী 'বাবা বাঙালী'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিও বাঙালী।

"সেন্সস রিপোর্ট হইতে জানা যায়, বোম্বাই প্রদেশের রাজধানী ও বাণিজ্য স্থানগুলিতেই অধিক বাঙালীর বাস।" ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের যে তথ্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর পুস্তকে দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ১৭১৯ জন বাঙালীকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। ১৮৮১-তে ৬৩৪ জন বাঙালী ছিলেন সেখানে। ঐ সময় "পশ্চিম কর্নাট বিভাগে একজন, দাক্ষিণাত্য বিভাগে তিনজন, কোঙ্কন বিভাগে আট জন, গুর্জর বিভাগে সতেরো জন, সিন্ধু

বিভাগে সাতষট্টি জন এবং বোম্বাই শহরে পাঁচশত আটত্রিশ জন বাঙালী বাস করিতেছিলেন।"

সরকারের চোখে কাজের লোক হিসাবে বাঙালী তৈরি করার কারখানা ছিল কলকাতাতেই। যেমন সংস্কৃত কলেজ, হেয়ার স্কুল, এ্যাঙ্গলো হিন্দু স্কুল, হিন্দু স্কুল, হিন্দু মেট্রপলিটন কলেজ, হিন্দু বেনেভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন প্রভৃতি। ঐ সমস্ত স্কুল কলেজের বেশিরভাগই বর্তমান, হয় পুরনো নামে অথবা নাম পরিবর্তন করে। আর কৃষ্ণনগর কলেজের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এবার একটি উদ্ধৃতি : "যখন বোম্বাইয়ের জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পরামর্শ চলিতেছিল, তখন বঙ্গদেশে মহাত্মা ডেবিড্ হেয়ার, ডি. এল. রিচার্ডসন ও ডিরোজিওর শিষ্যমন্ডলী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ডা. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

তখন হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজ হইতে বাঙালী ছাত্রগণ গবর্নমেন্ট কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়া নানা বিভাগীয় কর্মে ও দূরদূরান্তে প্রেরিত হইতেছিলেন।" এমনকি যে বছর বঙ্গে কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশান স্থাপিত হয় সেই বছর অর্থাৎ ১৮২৩ সালে বোম্বাইয়ের গভর্নর মাননীয় মিঃ এলফিনস্টোন ১৩ই ডিসেম্বর তারিখের মিনিটে যা লেখেন তা হোল, "A great deal appears to have been performed by the Education Society in Bengal, and it may be expected that the same effects should be produced by the same means at this residency. But the number of Europeans here is so small and our connection with the Natives so recent, that much greater exertions are requisite on this side of India than on the other."

[দ্র: History of English Education in India by Syed Mahmood, 1895, p. 36]

অমৃতলাল চক্রবর্তী সম্পাদক ছিলেন শ্রী বেঙ্কটেশ্বর সমাচারের। তিনিও বাঙালী। সিন্ধুতে আগত স্বামী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, নন্দলাল সেন দুজনেই বাঙালী। বোম্বাই

প্রবাসী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদপত্রে লিখেছিলেন, "আমরা বোধহয় তিনশতের উপর বা আরও অধিক বাঙালী এখানে আছি।" ওখানে কালীপূজো করার জন্য কালীবাটী প্রতিষ্ঠা এবং পূজোর দিনে সমস্ত বাঙালী একজায়গায় একত্রিত হওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা। মণিমাণিক্যের ও বাদ্যযন্ত্রের বিখ্যাত দোকান যাঁর ছিল তিনি বাঙালী অক্ষয় কুমার মিত্র। তাছাড়া বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত মণিমাণিক্য ব্যবসায়ী এবং অলঙ্কার নির্মাতা চন্দ্রকুমার দাসও বাঙালী। বাঙালী বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় মোতিবাজারে মূল্যবান পাথর ও গহনার বিরাট দোকান করেছিলেন। কল্লোদেবী রোডের বসু কোম্পানী, এসপ্লানেড রোডের মজুমদার কোম্পানী ও গ্রান্ড রোডের দত্ত কোম্পানী ইত্যাদি সবই আগত বাঙালীদের প্রতিষ্ঠান।

বোম্বাইয়ের জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রিত করতে সরকারের অনুগত অথবা কড়াহাতে শায়েস্তা করতে অনেক নিষ্ঠুর বিলেতি সিভিলিয়ান সাহেব আমদানি করতে হোত। কিন্তু এত সাহেব সিভিলিয়ান পাওয়া যাবে কোথায়? তাই ভারতবর্ষের প্রথম বাঙালী সিভিলিয়ান তৈরি করা হোল যাঁকে তিনি ঠাকুর পরিবারের কবি রবীন্দ্রনাথের ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। "ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন যে বৎসর বোম্বাই প্রদেশে ব্রাহ্মধর্মের বীজ বপন করিয়া যান, সেই বৎসরেই ভারতের সর্বপ্রথম সিভিলিয়ান মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানকার বিচারক পদে বৃত হইয়া আগমন করেন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই স্বনামখ্যাত বাগ্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ধর্মপ্রচারে বহির্গত হইয়া এ প্রদেশে ব্রাহ্মমন্দিরের ভিত্তিশিলা নিহিত করেন। তাহার ফলে আহমেদাবাদে ব্রাহ্মসমাজ, সাতারায় য়ুনিয়ন ক্লাব, জ্ঞানসমাজ, ১৮৬৭ অব্দে বোম্বাইয়ে প্রার্থনা সমাজ ও রামমোহন আশ্রম এবং হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা সমাজ মহামতি রাণাডে কর্তৃক স্থাপিত হইলেও ইহার প্রথম আচার্য ছিলেন বাঙালী।"

অনেক বাঙালীর নাম উল্লেখ করা হোল এবং হচ্ছে। কিন্তু এঁরা বেশিরভাগই হিন্দুধর্ম ত্যাগী ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। ব্রাহ্ম ও হিন্দু ধর্মের পার্থক্যের সবিশেষ আলোচনা প্রথম খণ্ডে করা হয়েছে।

অপ্রিয় তিক্ত কথা হলেও সত্য যে, আমাদের গোটা বঙ্গদেশে মহিলারা যে পোষাক পরতেন তা ভদ্রসমাজের উপযুক্ত ছিলনা। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী প্রথম মহিলা যিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে সমুদ্র পার হয়ে ইংলন্ড গিয়েছিলেন, তিনি পার্শী রমণীদের শাড়ী ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখে বঙ্গের মহিলাদের জন্য নতুন পোষাকের উদ্ভাবন করেন। পার্শী জাতি এসেছিল পারস্য বা মুসলিম রাষ্ট্র ইরান থেকে। সুতরাং ইসলাম ধর্মের প্রভাব তাদের উপর পড়েছিল বলেই উলঙ্গ অর্ধোলঙ্গ পোষাক তাদের ভূষণ ছিলনা।

তাদের শাড়ীর সঙ্গে ব্লাউজ, অন্তর্বাস, সায়া, জুতো এবং মোজা পরার রীতি ছিল। শ্রী দাসও লিখেছেন, "পার্শী রমণীদের সুবেশ দর্শনে বঙ্গমহিলার পরিচ্ছদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। সুতরাং পার্শী শাড়ীর সংস্করণ করিয়া তাঁহার (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) স্ত্রী এক নূতন পরিচ্ছদের উদ্ভাবন করিলেন। এবং তদবধি এই রীতি বঙ্গমহিলার আদর্শ পরিচ্ছদ বলিয়া গৃহীত হইল।" ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, "আমি তো বোম্বাইকেই নিজের দেশ মনে করি। এদেশ আমার হাড়ে মাসে জড়িত।"

ডা. নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়

চারুচন্দ্র দত্ত, মেজর বি. ডি. বসু, জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল (C. I. E.), ডাঃ ডি. এল. রায়, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির মৈত্র প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষিতরা সকলেই ছিলেন বাঙালী। বিখ্যাত ব্যক্তি অধ্যাপক বি. কে. মুখার্জী স্বেচ্ছায় খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন।

বোম্বাইয়ে যাঁরা পত্র পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন সতীশ চন্দ্র সেন, এন. আর. ভট্টাচার্য, অমৃতলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি নামকরা প্রবাসী বাঙালী। পুনার একটি হোস্টেলের নামই ছিল 'পুনা বাঙালী ছাত্র নিবাস'। ধরণীধর দাস মোরাদাবাদে আর দীননাথ হাজরা জব্বলপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, ভবধর চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিন্দ্রনাথ বসু, বনমালী দাস, চন্দ্রকুমার সরকার, স্যার রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙালী প্রবাসী ছিলেন পুনায়। বনবিভাগের ডিভিশনাল অফিসার হয়ে আসেন হরিপদ মিত্র। তিনি ছিলেন ধনী এবং মানী ব্যক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাবার পূর্বে বহুদিন যাবৎ তাঁর বাড়ীতে ছিলেন। কী করছিলেন, কেন ছিলেন সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মহীশূর যুদ্ধে হায়দার আলির পুত্র টিপু সুলতান নিহত হবার পরই মহীশূর বৃটিশের হাতে আসতে শুরু হয় আর তখন থেকেই সেখানে বাঙালী আমদানিরও ব্যবস্থা হয়— ইউরোপীয় আদর্শকে কেন্দ্র করে মহীশূরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় হয়। তবুও আগত বাঙালীরা তাদের কাজকর্ম, চালচলন ও পোষাক পরিচ্ছদে বাঙালীত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলেন— "ডাক্তার স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন মহীশূর প্রবাসে থাকিয়া এ

বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি ১৩২৬ সালের বৈশাখে শান্তিনিকেতনে নববর্ষের উপদেশ প্রসঙ্গে মহীশূর সম্বন্ধে তাই বলিয়াছেন ... ভারতলক্ষ্মী যে মৈসুর হইতে বিদায় লইয়া যান নাই তাহার প্রধান কারণ, দুই তিন পুরুষ ধরিয়া এখানকার রাজারা দেশী শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছেন। স্যার শেষাদ্রি আয়ারের মত মন্ত্রী ও শিক্ষকের হাতে ইঁহারা মানুষ হইয়াছেন।"

জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী ছিলেন সুযোগ্য বাঙালী দেওয়ান বাহাদুর। অধ্যাপিকা কুমুদিনী খাস্তগীর মহীশূরের প্রবাসিনী হন সরকারের ইঙ্গিতেই। মাদ্রাজের অবসরপ্রাপ্ত একাউন্ট্যান্ট জেনারেল কৃষ্ণলাল দত্তকে বিশেষ গোপন কাজের জন্য কলকাতা থেকে মহীশূরে আনানো হয়েছিল। "কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয় কিছুদিনের জন্য মৈসুর দরবারের কোন বিশেষ কার্যের ভার লইয়া তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এবং কার্য সুসম্পন্ন করিয়া প্রশংসার্জন করিয়াছিলেন।"

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পদ পেয়েছিলেন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের। 'রাজতন্ত্রপ্রবীণ' এবং 'স্যার' উপাধিও পেয়েছিলেন তিনি। ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ও একজন নামকরা আগত বাঙালী। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠিত মঠ সাধনাশ্রম সেবা সমিতি উল্লেখযোগ্য। এগুলোর প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দই। মহীশূরের জেলে বন্দীদের ধর্মকথা শেখাবার দায়িত্ব দিয়ে যাঁকে নির্বাচন করা হয়েছিল তিনি বাঙালী সোমানন্দ স্বামী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র এলবিয়ন ব্যানার্জী খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য সরকার থেকে নানা পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়ে 'টাইগার ইন দ্য সার্ভিস' এবং 'স্যার' উপাধি পেয়েছিলেন। কিছুদিন ইউরোপ ভ্রমণ করে এসে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রিত্ব দেওয়া হয়েছিল স্যার এলবিয়নকে। বাঙ্গালোরে মাদ্রাজ হতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে পাঠানো হয় একটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য। সেইসঙ্গে সৃষ্টি হয় বেদান্ত সভা। পরে সেটার ভার পেয়েছিলেন স্বামী আত্মানন্দ ও স্বামী বিমলানন্দ। তারপর স্বামী বোধানন্দ এসে দায়িত্ব নিলে এবং পরে আমেরিকা গেলে স্বামী আত্মানন্দ আবার কার্যভার নেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ বাঙ্গালোরে এসে ভিত্তি স্থাপন করেন মঠের।

মহীশূরে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে একটি টেম্পল তৈরি করে তার ভিতরে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের চিত্তাকর্ষক মূর্তি স্থাপন করা হয়। আর সেখানে প্রত্যেক রবিবারে রামনাম কীর্তনের ব্যবস্থা চালু হয়। এই রামনাম কীর্তন দাক্ষিণাত্যের বহুস্থানে প্রচারিত ও প্রচলিত হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার উদ্দেশ্যে বাঙালী মনমোহন গাঙ্গুলী এই মঠে এসে পৌঁছেছিলেন। ওখানে উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বে ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। তিনি

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ। মাদ্রাজে বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল হোম বাঙালীদেরই কীর্তি। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ইংরেজের প্রাচ্য বিষয়ক গবেষণার একজন সহযোগী ছিলেন। বৃটিশ মিউজিয়ামে বহু বইপুস্তক হস্তলিপির আকারেই ছিল; ১৯১০ পর্যন্ত সেগুলো ছাপা হয়নি। এসবই শীল মশাই জানতেন। ১৯১১-তে যখন লন্ডনে 'ইউনিভার্সাল রেসেস কংগ্রেস' অনুষ্ঠিত হয়, তার সভাপতি হয়েছিলেন বাঙালী স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। 'প্রাচীন হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল'— এর উপর একটি আজগুবি তত্ত্ব ও তথ্যে সাজানো পুস্তক লিখে বৃটিশকে মুগ্ধ করেছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের কেমনভাবে কি কি কাজে লাগতে পারে, শুধু শিক্ষার প্রচার ও প্রসারই নয়, শাসন শোষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কী, তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করে ও করিয়ে সরকারের কাছে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টি আশুতোষ মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে থাকলেও তাঁকে শীল মশাই-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয়েছে। বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'হিন্দুদের রসায়ন বিদ্যা' সম্বন্ধে ইংরেজি পুস্তকটিতেও স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান— "পরলোকগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করিবার সময় নানা বিদ্যা বিষয়ে যেরূপ জ্ঞানের পরিচয় দিতেন, তাহার অনেকটা শীল মহাশয়ের সহিত পরামর্শের ফল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রাচীন হিন্দুদের রসায়ন বিদ্যা সম্বন্ধে যে ইংরেজি পুস্তক আছে তাহার একটি বিস্তৃত অংশ শীল মহাশয়ের লেখা।" [শ্রী দাস, ঐ, পৃ. ২৭০]

জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী

লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে দখল করা কুর্গের রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে একজন কমিশনারের হাতে সেখানকার শাসনভার দিয়েছিলেন। কুর্গ যখনই বৃটিশের হাতে এল তখনই বাঙালীদের হয়ে গেল পোয়াবারো। হুড়হুড় করে বাঙালী এনে তাদেরকে দিয়ে শাসন শোষণের কাজ চালানো হোল প্রচন্ড উদ্যমে। কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা যায় সেখানে বাঙালী পৌঁছেছিলেন ১৩,২৬৩ জন।

মাদ্রাজের অবস্থাও ঠিক ঐরকমই। সারা ভারতবর্ষের প্রধান ঘাঁটি হিসাবে বাংলার পরই স্থান ছিল মাদ্রাজের। মাদ্রাজে বাঙালীদের তৈরি করা আখড়া ছিল প্রচুর। যেগুলো

বাঙালী বৈষ্ণব ও গোস্বামীদের কীর্তি। বাঙালীরাই প্রথমে মাদ্রাজে আলুর প্রচলন করে। সেইজন্য অন্ধ্রপ্রদেশে আলুকে তখন 'বাঙ্গালা দুম্পলু' বলা হোত। প্রথম বাঙালী পাঠানো হয় ৪৬ জন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ১১৭৩-তে। তখনকার ভিজিগাপাটাম শহরে ইস্ট কোস্ট ট্রেডিং কোম্পানী নামে যে বিরাট ব্যবসা ছিল তার মালিক ছিলেন বাগবাজারের বাঙালী অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিখ্যাত বাঙালী শিল্পী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় 'মছলিপত্তন অন্ধ্রজাতীয় কলাশালা'র প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা ও দীক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন তিনি। বঙ্গের প্রভাব সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে অন্যভাবে বললে বলা যায়, ভারতীয় প্রাচীন নারী পুরুষের পোষাক পরিচ্ছদ সংস্কৃতি ইত্যাদির চিত্র অঙ্কনের ব্যাপারে নেপথ্যে ছিল ইংরেজের এক বিশ্বজোড়া পরিকল্পনা। তারই একটি কেন্দ্র বাঙালী প্রমোদবাবুর দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু ও অসিত কুমার হালদার ছিলেন অবন ঠাকুরের শিষ্য। প্রমোদবাবু সেখানে 'সারদা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা নিজের আঁকা সরস্বতীর মূর্তিসহ প্রকাশ করেন। ঐ ছবিটি অশ্লীল বলে হৈ হৈ কান্ড হয়। সমস্ত পোষ্টমাষ্টার ও ডাককর্মীরা ওটা বিলি করতে ঘৃণা এবং অস্বীকার করেন। পোষ্টমাষ্টার জেনারেল প্রচ্ছদের অশ্লীলতার জন্য ইংরেজিতে যা লিখেছিলেন তার ভাবার্থ এই : প্রচ্ছদপটটি কেবল নগ্নতার ভাবমাত্রই প্রকাশ করছেনা বরং এতে অতিরঞ্জিত স্থূল অমার্জিত রুচি প্রকাশিত হয়েছে যা কখনোই প্রকৃত আর্টের সীমার ভিতর আসতে পারেনা।

সেই সময় মাদ্রাজ আদিয়ার ব্রহ্ম বিদ্যাশ্রমের প্রিন্সিপ্যাল কলারসজ্ঞ ডঃ জে. এইচ. কজিন্স সাহেবের হাতে পড়ে ঐ পত্রিকার একটি কপি। ১৯২৩-এর ১১ই সেপ্টেম্বর কজিন্স সাহেব ইংরেজিতে যে মন্তব্য করেছিলেন তার সারমর্ম হোল, তিনি ঐ অশ্লীল চিত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তার একটি অংশ হচ্ছে : যেখানে স্বর্গীয় পবিত্রতা ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করার প্রয়াস নেই, এবং যেখানে সুমার্জিত দৃষ্টি ও সংযম দৃষ্টি অন্তর্মুখী করিয়া তোলে, সেখানে অতিরঞ্জিত অমার্জিত স্থূল অশ্লীলতা দেখতে পাওয়া বড় আক্ষেপের কথা। সাহেব শিল্পীর এই বাণী প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে ডাকবিভাগ, অন্ধ্রের জনসাধারণ এক কথায় সকল ভারতবাসীর দৃষ্টিভঙ্গী বিদ্যুৎগতিতে পরিবর্তিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী প্রমোদবাবু দুর্নামের পরিবর্তে সম্মানিত হতে থাকেন দারুণভাবে। [পৃ. ২৮০]

দক্ষিণ বেজওয়ারায় (বা বর্তমান বিজয়ওয়াড়ায়) বাঙালীদের জন্য একটি পাড়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। নেলোর জেলায় রেলওয়ে পোলগুলো পরিদর্শন করার জন্য সুপারভাইজার পদে এসেছিলেন বাঙালী অশ্বিনী কুমার সেন। মাদ্রাজ নগরে 'বাঙালী পাড়া' 'বাবুবাজার' 'শম্ভুচন্দ্র দাস রোড' প্রভৃতি নামগুলো প্রচুর পরিমাণে বাঙালী আসার

প্রমাণ দেয়। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও মাদ্রাজে আসেন। তিনি পূর্বেই খৃষ্টান হয়ে খৃষ্টান মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের একটি হিসাবে দেখা যায় সেখানে ছিল ১২৭৩ জন বাঙালীর উপস্থিতি। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজে আসেন। ইউরোপ থেকে ফিরে পাঁচবছর পর এখানে ধর্মোপদেষ্টার স্থায়ী বাসস্থান করবার প্রয়োজন হয় এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে বাছা হয়। স্বামী বিবেকানন্দের চেষ্টায় 'ব্রহ্মবাদিন' মাসিক পত্রও প্রকাশিত হয় এখান থেকে।

এলবিয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, হরেন্দ্রলাল ঘোষ, হরিপদ ঘোষ, বিলাতফেরা ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ধর, রমণীমোহন ঘোষ, রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন সেন, ইঞ্জিনিয়ার সতীশচন্দ্র মজুমদার, নন্দলাল শীল প্রভৃতি মাদ্রাজের বিখ্যাত সব ব্যক্তিই ছিলেন বাঙালী। বি. সি. সান্যাল, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, সিভিলিয়ান মিঃ এ. দত্ত, মিঃ এম. ঘোষ, মিঃ আর. কে. ব্যানার্জী এঁরা সকলেই বাঙালী। চিঙ্গলপুট জেলার সেন্ট টমাস মাউন্টের বাঙালী বাজার বাঙালী উপনিবেশের স্মৃতি বহন করে। দুর্লভ গোস্বামী নামের এক বিখ্যাত বাঙালীর ইতিহাস অস্বীকার করা যায় না; যাঁর ডাক নাম ছিল দুলু গোঁসাই।

মাদ্রাজের বরোদা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হয়ে যিনি আসেন তিনি বাঙালী ঋষি অরবিন্দ ঘোষ। রাজনৈতিক কারণে জেল হয়। মুক্তির পর আশ্রম করেন পন্ডিচেরিতে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোর ইংরেজদের হাতে আসে। প্রথম খন্ডে আলোচনা করা হয়েছে কল্পিত সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির চক্রান্তাগার বিষয়ে অনেক কথা। সমগ্র ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে ঐ চক্রান্তের কাজ চলছিল তারমধ্যে বহির্বঙ্গের তাঞ্জোর অন্যতম। ঐ জেলার সরস্বতীমহল পুস্তাকাগারটি একটি দর্শনীয় স্থান। এখানে শুধু ১৮,০০০ সংস্কৃত হস্তলিখিত পুস্তক এবং ৮,০০০ তালপত্রে লেখা পুঁথি আছে। এগুলো প্রকৃতই প্রাচীন কিনা তা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের একটি হিসাবে দেখা যায় ঐ সময় এখানে বাঙালী আমদানি হন ৩৫৪ জন।

ঐ বছরে কানাড়ায় আগত মোট বাঙালী ছিলেন ১০৬ জন। বাঙালী চৈতন্যদেবের

ত্রিবাঙ্কুরে আগমন উল্লেখযোগ্য। ১৯১১-তে এখানে ২৬ জন, পদ্মনাভপুরে ১ জন, ত্রিবান্দ্রমে ১০ জন ও কুইলনে ১৫ জন বাঙালী প্রবাসী হন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস অনুযায়ী দেখা যায়, দক্ষিণভারতে ইংরেজ সরকারের করুণায় ৪২৪৫ জন ভাগ্যবান বঙালী এসে বসবাস করেন। কোচিনে ২ জন, মহীশূরে ২০ জন, হায়দ্রাবাদে ৬৬ জন, ত্রিবাঙ্কুরে ৯৮ জন, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ৬২৬ জন বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ১৬৭৫ জন, আর মধ্যপ্রদেশে ছিলেন ২৭৪৮ জন ভাগ্যবান বাঙালী।

সিংহলে এত বেশি বাঙালী পাঠানো হয়েছিল যার সঠিক হিসাব দেওয়া মুশকিল। তবে মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—"এখন যাঁহারা সিংহলে বাস করেন, এককালে তাঁহারা বাঙালী ছিলেন।"

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সমগ্র সিংহল দখল করে। সিংহলের কোন প্রকৃত ইতিহাস তখনও পর্যন্ত ছিলনা। ইংরেজ অধিকারের দু বছরের মধ্যে সাহেব মিঃ টার্নার একটি ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেলেন যেটার নাম দেন EPITOME OF THE HISTORY OF CYLON আর রটিয়ে দিলেন 'মহাবংশ' গ্রন্থ অবলম্বন করে সেটি লিখেছেন তিনি। মহাবংশ বলে কোন সঠিক ইতিহাস গ্রন্থই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি।

ডাঃ গুডিভ চক্রবর্তী, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র ও রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস ছিলেন বাঙালী। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ থেকে ফিরে স্বামী বিবেকানন্দ এখানে পদার্পণ করেন। জাফনার হিন্দু কলেজ প্রাঙ্গনে স্বামীজী বক্তব্য রাখেন। এই হিন্দু কলেজ নামটি যে কলকাতার অনুকরণে বাঙালীবুদ্ধি প্রসূত তাতে সন্দেহ নেই। অজয়নাথ ঘোষ, ভূপেশচন্দ্র দাস, হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র সর্বাধিকারী প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত ভাগ্যবানেরা সকলেই ছিলেন বাঙালী। সুধাংশুনাথ বসু, অধ্যাপক যামিনীকুমার ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত সকলেই ছিলেন বাঙালী, যাঁরা এখানে হয়েছিলেন প্রতিষ্ঠিত।

আধুনিক ইতিহাসবিদদের অনেকের মতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম পরিকল্পিত ধর্ম। আসামের কথা বলতে গিয়ে বলা যায় যে, "মণিপুরে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম বাঙালীর অবদান। বৌদ্ধধর্মের পরে বৈষ্ণব ধর্ম যখন পূর্বাঞ্চলে প্রাধান্যলাভ করিতেছিল, শান্তিপুরের গোস্বামীরা তখন মণিপুর রাজবংশ ও মণিপুরীদের ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিণত করিয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।"

১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি আসাম ইংরেজদের অধিকারে আসে। আর ইংরেজদের অধিকারে আসা মানেই হোল, আমাদের কাঙালী বাঙালী জাতির ভাগ্য খুলে যাওয়া। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮৪১

জনকে সেখানে পাঠানো হয়েছে। দশ বছর পর ১৯০১-এর হিসাবে দেখা যাচ্ছে আরও ৭৯ হাজার ৪৪৬ জনকে পাঠানো হয়েছে। তার দশ বছর পরের হিসাবে দেখা যায় যে, আরও ২ লাখ ৭৪ হাজার ৮৪৩ জন বাঙালীকে বঙ্গ থেকে পাঠানো হয়েছিল আসামে।

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

আসামের কামাখ্যা গৌহাটি জেলার অন্তর্ভূক্ত। কামাখ্যার অদূরে যে বিখ্যাত ভুবনেশ্বরী মন্দির আছে সেখানে বাঙালী স্বামী অভয়ানন্দ কাটিয়েছিলেন একটানা ১৯/২০ বৎসর। তার আশপাশের এলাকায় বাংলা ভাষার খুবই প্রচলন ছিল। 'বাঙ্গালা স্কুল পাঠশালা বহুদিন হইতেই এখানে স্থাপিত ছিল।' এখানকার সরকারি বিদ্যালয়গুলোতেও ব্যবস্থা ছিল বাংলা ভাষা শিক্ষার। মন্দিরের আশপাশে বাস করতেন হাজার ঘরেরও বেশি বাঙালী। এইভাবে কাছাড়েও বাঙালীদের প্রভাব ইংরেজের করুণায় ছড়িয়ে পড়েছিল। লুসাই সংলগ্ন লামডিঙ-এ চা বাগানের মালিক প্রতিপত্তিশালী বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বাঙালী। সেই সময়কার আসামের রাজপথগুলো বাঙালী কন্ট্রাক্টর দ্বারা তৈরি। সুদীর্ঘ আসাম-বেঙ্গল রেলপথও বাঙালীদের দ্বারা তৈরি। "উচ্চশিক্ষাসুলভ বৃত্তিগুলোতে শিক্ষা, চিকিৎসা, ওকালতি এবং ব্যবসায় বাণিজ্য ও গবর্নমেন্টের চাকরির ক্ষেত্রে বাঙালিরই প্রায় একাধিপত্য ছিল।" [পৃ. ৩৭৯]

গোয়ালপাড়ায় শ্মশানঘাট -অবধূত-যোগাশ্রম উল্লেখযোগ্য। এই আশ্রম বাঙালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। স্বামী হরিহরানন্দ অবধূত, স্বামী শচ্চিদানন্দ অবধূতরাও ছিলেন বাঙালী। গৌরীপুরের শম্ভুচন্দ্র লাহিড়ী, গোয়ালপাড়ার জয়নারায়ণ শর্মা, শ্যামলনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি. এল. দে, রামনাথ দত্ত, রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়— এঁরা সকলেই ছিলেন বাঙালী। গৌহাটির উকিল কালীচরণ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন মালিক ছিলেন কামরূপ জেলার বিস্তৃত জমিদারির। ছোটলাট বাহাদুর উপেন্দ্রনাথের আনুগত্য ও কর্মকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দিতে ইচ্ছা করলে তিনি তা পছন্দ করেন নি—"কিন্তু কৃতজ্ঞ গবর্নমেন্ট পরবর্তী সুযোগে সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে সম্মানের নিদর্শনপত্র 'সার্টিফিকেট অব অনার' দিয়া তাঁহার সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন।"

ধুবড়ির বিখ্যাত উকিল পিয়ারীমোহন দত্ত। উনিও সরকারের রায়বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ডিব্রুগড়ের উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বামী নিগমানন্দ, স্বামী মুক্তানন্দ, কল্যাণীপ্রসন্ন বসু সকলেই ছিলেন বাঙালী। শিলং বাজারের মধ্যস্থলে যে কো-অপারেটিভ্ স্টোর, তা বাঙালীদেরই কীর্তি।

১৯০১-এ চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে মার্শম্যানের সঙ্গী হয়ে একজন বাঙালী খাসিয়া দেশের বহু সিপাহীকে খৃষ্টান করার কীর্তি দেখান। তিনি পূর্বেই খৃষ্টান হয়েছিলেন এবং তাঁর বাবা মুকুন্দচন্দ্র পালও খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন।

বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবের জীবনী, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি খাসিয়া ভাষায় যিনি প্রচার করেছিলেন তিনি বাঙালী নীলমণি চক্রবর্তী। অথচ অদ্ভুত আশ্চর্য কথা হোল, তিনি ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের লোক। ঐ নীলমণিবাবুই ১৮৮৯-এ মস্মই ও শেলাতে দুটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর ব্রাহ্মসঙ্গীতগুলো খাসিয়া ভাষায় অনুবাদ করে বাংলা সুরে গাইতেন ও গাওয়াতেন। তিনি সংকীর্তনে ঢোল বাজানোর পরিবর্তে খোল বাজানোর নিয়ম প্রচলন করেন। পাঁচটি স্কুল আর পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে ১৪ টি ব্রাহ্মসমাজ, চারটি ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র, একটি হাসপাতাল, নারী সভা, সঙ্গীতসভা, নীতি বিদ্যালয়, বিতর্কসভা প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ঐ নীলমণিবাবু। তারপরে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে বিনোদবিহারী রায়ের হাতে দিয়েছিলেন ঐ দায়িত্ব।

শিবনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র মুখার্জী, অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য, মিঃ স্যামুয়েল রায় এঁরা সকলেই বাঙালী। আর্থিক স্বার্থের জন্য নিজের ধর্ম ত্যাগ করে, কেউ হয়েছিলেন ব্রাহ্ম কেউ হয়েছিলেন খৃষ্টান।

ঠিক এইভাবে ব্রহ্মদেশের অবস্থাও তাই। পূর্বেই বলা হয়েছে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সম্বন্ধে। ব্রহ্ম দেশে নাকি বহু বৌদ্ধ ছিল। প্রচারটা এইভাবেই হয়েছে। কিন্তু আসল সত্য এটাই যে, বঙ্গ থেকে বাঙালীরা গিয়েই বৌদ্ধ শরবত পরিবেশন করেছেন— "যদিও অনেকে মনে করেন সিংহল হইতে ব্রহ্মে বৌদ্ধ ধর্ম আসিয়াছে, কিন্তু আমাদের মনে হয় ইহার চেয়ে বাঙ্গালা দেশ হইতেই যে এই দেশে বৌদ্ধ ধর্ম আসিয়াছে ইহাই সঙ্গত।" [পৃ. ৪০২]

ব্রহ্ম দেশের 'স্বাবলম্বী' পত্রিকার মর্ম উপলব্ধি করে বলা যায় যে, সে দেশে ব্রাহ্মণেরা সকলেই বাংলা থেকেই রপ্তানিকৃত। ১৯০১-এর সেন্সাসে ব্রহ্মদেশে বাঙালী যান ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩৪ জন। ১৯২১-এ ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৩৯ জন বাঙালী সেখানে ছিলেন বলে জানা যায়। 'স্বাবলম্বী' পত্রিকার মতে বাংলা থেকে ভাগ্যবান বাঙালী গিয়েছিলেন পাঁচ লাখ। [দ্রষ্টব্য ঐ, পৃ. ৪০৩]

"পেগুর অন্তর্গত সুধর্ম সদ্ধর্ম নগর আধুনিক থাটোঁ [Theyton] পূর্বে বৌদ্ধবিদ্যার পীঠস্থান ও বাঙালী-বৌদ্ধ উপনিবেশ ছিল। দশম শতাব্দীতে এশিয়া বিখ্যাত বঙ্গের গৌরব শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর এখানে আসিয়াছিলেন।" তিনি এসেছিলেন বঙ্গের তমলুক থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজদের অবির্ভাব হয় ব্রহ্মদেশে। তার সঙ্গে সঙ্গেই খুলে যায় বাঙালীদের ভাগ্য— "ক্রমে তথায় ইংরেজাধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগের বাঙালীদের নিকট ব্রহ্মের দ্বার উন্মুক্ত হয়। ... এদিকে ইংরেজ বাহাদুর হিন্দু কালা পল্টন (কালো সৈন্য) ও দেশীয় কর্মচারীবর্গ সঙ্গে লইয়া ভারতের চতুর্দিকেই রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে ব্রহ্ম সীমান্ত পর্যন্ত অধিকার করেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ব্রহ্মের রাজা ও প্রজা সকলেই পার্শ্ববর্তী বাঙালীদের সাহসহীন, খর্বদেহ, কালা বিদেশী, জাতমানার দল বলিয়া ঘৃণা করে ও ইংরেজকে সাত সমুদ্র তের নদীর পারের মুষ্টিমেয় দ্বীপের লোক, অতদূর হইতে পরের দেশে আসিয়া, রাজাদের সিংহাসনচ্যুত করিবার এবং যাহাতে তাহাদের কোনই হাত নেই সেসব রাজ্য অধিকার করিবার তাহাদের কিসের মাথাব্যথা ইত্যাদি বলিয়া নিন্দা করিতে থাকে।"

ডা. গুডিভ চক্রবর্তী

বৃটিশের বর্মা অধিকারের পর ভাগ্যবান বাঙালীদের স্রোত আসতে শুরু হয়। বাঙালীরা রেঙ্গুনে প্রতিষ্ঠা করেন কালীবাড়ি, পালন করেন দুর্গোৎসব, করেন ব্রহ্মময়ী সেবক সমিতি ইত্যাদি। এইভাবে বাঙালীরা বিস্তার করেন তাঁদের আধিপত্য। কামাখ্যানাথ গুপ্ত, বি. বি. চট্টোপাধ্যায়, ডঃ জে. ব্যানার্জী, ডঃ এফ. আর. সেনগুপ্ত, এডভোকেট এম. ব্যানার্জী, এডভোকেট বি. মুখোপাধ্যায়, পোষ্টমাষ্টার কে. সি. চক্রবর্তী, জেল সুপার বিপিনবিহারী চক্রবর্তী, উকিল এইচ. গুহ, এ্যামেথিন জেলার সিভিল সার্জন ডাঃ এম. এল. বসু, উকিল এস. সি. গুহ, উকিল বি. কে. হালদার, পোষ্টমাষ্টার এস. পি. ঘোষাল, পূর্ত বিভাগের সাব ডিভিশনাল অফিসার এন. বি. রায়, চিফ জেলার মিঃ মুখার্জী, জেনারেল কন্ট্রাক্টর বি. বি. মুখার্জী, উকিল এস. মুখার্জী, জরিপ বিভাগের একস্ট্রা এ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার ডি. এল. ব্যানার্জী, সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার পি. সি. সেনগুপ্ত, উকিল শরৎশশী মুখার্জী, ব্যারিস্টার এস. মুখার্জী, এ. সি. মুখার্জী, এল. কে. মিত্র, পি. এন. বোস, কে. ব্যানার্জী এবং এল. এম.

মুখার্জী এঁরা সকলেই প্রতিষ্ঠিত সরকার অনুগত ভাগ্যবান বাঙালী। বিখ্যাত ব্যবসায়ী জে. এল. নন্দী এন্ড সন্স উল্লেখযোগ্য বাঙালী প্রতিষ্ঠান। শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল ও চুনীলাল বসু মহাশয়দ্বয় বাঙালী ছিলেন ও উঠেছিলেন চরম শিখরে এবং পেয়েছিলেন বৃটিশের আনুগত্যের চিহ্ন 'রায়বাহাদুর' উপাধি।

শুধু রেঙ্গুন শহরে বাঙালী আনানো হয়েছিল ২৬ হাজার ৯৩২ জন। ইনসিনে ৫ হাজার ৯২৭ জন, হান্তাউড়িতে ৭ হাজার ৮৬৬ জন, থারাউড়িতে ২ হাজার ৫৬০ জন, পেগুতে ৬ হাজার ১৬৭ জন, প্রমে ১ হাজার ১৩৬ জন এবং বেসিনেওতে ৫ হাজার ২৫৩ জন ভাগ্যবান বাঙালী আনানো হয়েছিল। আর একবার মনে করিয়ে দেওয়া যায় যে, বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচিত ও নির্ধারিত এই বাঙালী ভাগ্যবানদের মধ্যে মুসলমান জাতি, হরিজন, আদিবাসী প্রভৃতিরা ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন উপেক্ষিত প্রায়।

ব্যারিস্টার লক্ষ্মীচন্দ্র সেন, ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্র সেনরা ছিলেন সেখানে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান যাওয়ার সময় তাঁদের বাড়ির অতিথি হয়েছিলেন এবং তাঁকে দেওয়া অভিনন্দন পত্রটি তিনি স্বয়ং পাঠ করেছিলেন। কালীদাস মুখোপাধ্যায়, উকিল দেবেন্দ্রনাথ পালিত, অক্ষয়কুমার দে, ইঞ্জিনিয়ার অহিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রলাল মজুমদার, অঘোরনাথ চ্যাটার্জী, শশিভূষণ নিয়োগী, এটর্নী মিঃ এ. সি. ধর এঁরা সকলেই ছিলেন সেখানকার ধনী এবং মানী বাঙালী প্রবাসী। মিঃ ধর ব্রহ্মদেশের মেয়েকে বিয়ে করে পুত্রের নাম রেখেছিলেন উইলিয়াম ধর। ইঞ্জিনিয়ার হরিসুন্দর রায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে, শিবনাথ রক্ষিত, জয়চন্দ্র দত্ত, শশিকুমার ঘোষ এঁরা ছিলেন বড় বড় কন্ট্রাকটর; টাকা কামিয়েছিলেন বিনা বাধায়। রেঙ্গুন বিদ্যাসাগর রিডিং রুম, ইন্ডিয়ান সেমিনারি, বেঙ্গল একাডেমি, রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ও দুর্গাবাড়ি সব বাঙালীদেরই অবদান। তাছাড়া বেঙ্গল ক্লাব, বাঙালী যুবকসমিতি, বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাব, চট্টল বৌদ্ধ সমিতি, বেঙ্গল সুহৃদ সম্মিলনী, বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, রেঙ্গুন মহিলা সমিতি, বাঙ্গালী বালিকা বিদ্যালয়, বাঙালী সমবায় ঋণদান সমিতি, আর্য সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ, আর্য সঙ্গীতালয়, বঙ্গনাট্য সমাজ, বাংলা সাহিত্য সম্মেলন উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রেঙ্গুন থেকে তিনটি বাংলা মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজ বের হোত সেগুলোও নিঃসন্দেহ বাঙালীদের গৌরব। অবশ্য শেষের দিকে মুসলমানেরা সরকারি প্রচেষ্টায় নয়, নিজস্ব প্রচেষ্টায় ভাগ্য অন্বেষণে অনেকেই ব্রহ্মদেশে পৌঁছেছিলেন। তাঁরাও নিজেদের মধ্যে সীমিত ক্ষমতায়, সরকারি সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই তৈরি করেছিলেন খাদেমুল ইসলাম স্কুল, মোসলেম সমিতি, বেঙ্গল মহমোডান এসোসিয়েশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। মুসলমানরা বেশিরভাগই কাঠ, পরিবহন প্রভৃতি ব্যবসা, শ্রমিক ও শ্রমিক-ঠিকাদার হিসাবে কাজ করতেন।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে দেশের লোক জানেন যে, দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীদের বন্দী রাখা হোত সেখানে। পূর্বে ছিল অস্বাস্থ্যকর স্থান, মশাগুলো হতো মাকড়সার মতো বড়, একহাত লম্বা এক ইঞ্চি মোটা বিছে, ভাইপার নামক বিষধর সাপে পরিপূর্ণ। অধিবাসীরা ছিল নিগ্রোদের মত কালো, বুনো, উলঙ্গ এবং মানুষ-খাদক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্যাপ্টেন আর্চিবল্ড ব্লেয়ারকে পাঠান। তারও পূর্বে দীনেমারেরা বাস করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বাঁচতে পারেননি। ব্লেয়ারের নাম অনুসারে সেখানকার এক স্থানের নাম হয় পোর্ট ব্লেয়ার। সিপাহী বিদ্রোহের নেতা বাছা বাছা ২৭০ জন বিপ্লবীকে প্রথমে সেখানকার জেলে পাঠানো হয়। একবার আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বাস করার অযোগ্য বলে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ইংরেজ সিদ্ধান্ত নেয় যে তাদের শত্রু বন্দীদের জন্য ঐ জায়গাই উপযুক্ত। "সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ অব্দের মাঘ মাসে ভারত গবর্নমেন্ট এই দ্বীপপুঞ্জে দন্ডিতদের নির্বাসন উপযোগী স্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ডাঃ ওয়াকারকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন একজন বাঙালী ওভারসিয়র, দুইজন বাঙালী ডাক্তার ও নৌবাহিনীর জনৈক কর্মচারীর পরিচালনাধীন ৫০ জন রক্ষীসেনা।" ওয়াকার সাহেবের অত্যাচারে বিপ্লবী কয়েদীরা জেল থেকে পালিয়ে যেতেন কিন্তু আন্দামানের উলঙ্গ নরমাংসভোজী বুনোদের হাতে নিহত হতেন এবং খাদ্যে পরিণত হতেন তাঁরা। আন্দামানের পরিবেশ বাসের উপযুক্ত করার জন্য ক্যাপ্টেন হার্ডটন আপ্রাণ চেষ্টা করে পরিস্থিতির পরিবর্তন করেন। বাঙালী ডাক্তার দীননাথ দাস চিকিৎসক হিসাবে সেখানে সুনাম অর্জন করেছিলেন। ক্রমে সেখানে হাসপাতাল, লাইব্রেরি, স্কুল-কলেজ, অনাথ আশ্রম প্রভৃতি হতে লাগল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার ঐ ডাক্তার দাসকে 'রায়বাহাদুর' খেতাব দেন। বাঙালীর ভাগ্য আবার ফিরতে লাগলো। ১৯০১-এর সেন্সাস হিসাবে দেখা যায় ১৪৪১ জন বাঙালী উপস্থিত হন সেখানে। সার্জন ডাঃ বি. চক্রবর্তী, ডাঃ কে. জি. মুখার্জী, ডাঃ বি. মন্ডল এঁরা সকলেই ছিলেন বাঙালী।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের লেখা থেকে অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া হোল। কেন তাঁর লেখা বইয়ের উপর গুরুত্ব দিলাম এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। ১৯১৫-তে বইটি প্রকাশিত। ঐ সময়কার ছোট বড় বিখ্যাত বিশেষ পত্রিকাগুলো বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তারমধ্যে কয়েকটি পত্রিকার নাম উল্লেখ করছি। আনন্দবাজার প্রশংসা করেন ২.৩.১৩২২-এ, 'প্রবাসী' ১৩২২-এর আষাঢ়ে। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১১.৩.১৩২২ তারিখে। 'সঞ্জীবনী'-তে ৯ই আষাঢ় প্রশংসা করা হয়। 'বসুমতী' ঐ বছরের আশ্বিনে এবং 'হিতবাদী' ৩১শে ভাদ্র প্রশংসা প্রকাশ করে। 'দর্শক'-এ বের হয় ১০ই ভাদ্র, ১৩২২। 'ভারতবর্ষ', 'উদ্বোধন' এবং 'তত্ত্বমঞ্জুরী'-তেও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। ইংরেজী পত্রিকার মধ্যে 'দি বিহার হেরাল্ডে' ৩১শে জুলাই ১৯১৫, 'দি পাইওনীয়র'

এ ২১শে নভেম্বর ১৯১৫, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫, 'দি বেঙ্গলী'-তে ৫ই জুন ১৯১৫, 'দি স্টার অব উৎকলে' ঐ বছরের ৫ই জুলাই প্রশংসা প্রকাশিত হয়। এছাড়া আরও অনেক পত্রপত্রিকা তাঁর পুস্তকের সমালোচনায় প্রশংসা ব্যক্ত করে। তাছাড়া কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ই আগস্ট ১৯২৫-এ যে প্রশংসাপত্রটি দিয়েছিলেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর একটি বাক্য তুলে ধরছি—"ইহা বঙ্গ ভাষায় একখানি অপূর্ব গ্রন্থ, ভারতের ইতিহাসের একটি অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়, বাঙ্গালা সাহিত্য ভান্ডারের একটি অমূল্য রত্ন এবং বাঙালী মাত্রেরই একখানি অবশ্য পাঠ্যপুস্তক।"

আর একটি শুভেচ্ছা পত্রে স্বামী শ্রী ব্রহ্মানন্দ ভারতী ঢাকা থেকে লিখেছিলেন, "এই পুস্তকখানা এমন মনোমুগ্ধকর ভাষায় ও ভঙ্গীতে লিখিত হইয়াছে যে আমি ইহা পড়িতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িতে পারি নাই।"

১৯১৫ তে দেশ স্বাধীন হবার পূর্বেই, এই সব মন্তব্যগুলো গভীর দৃষ্টি দিয়ে ভাবলে দেখা যাচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা কি পরিমাণে তার শিকড় চালিয়েছিল সর্পিল গতিতে।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস বলে যেটি সৃষ্টি হয়েছে সেটি সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের সৃষ্টি করা বেলুন মাত্র। সরকার তার নিজের স্বার্থেই বাংলার মানুষকেই কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছিল একটা মনগড়া ইতিহাস। 'বাঙালী' পত্রিকার দু-একটি বাক্য তুলে ধরছি—"বাঙালী এখন বাধ্য হইয়া— ভক্তিতে, প্রয়োজনে, কালধর্মে, প্রতিবেশ প্রভাবে, আত্মরক্ষার সহজাত সংস্কারের প্রেরণায় মাতৃপূজা সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করিবার জন্য দেশে বিদেশে উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। যে যাহা পাইতেছে মা'র মন্দিরে কুড়াইয়া আনিতেছে। ইঁটের টুকরা, পাথরের মূর্তি, সোনা, রূপা, তামার টাকা পয়সা, শিলালিপি, তাম্রশাসন, পুরাতন দলিল, প্রাচীন পুঁথি, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি, উপকথা, গল্প— যে যাহা পাইতেছে তাহাই দেশ মাতৃকার প্রাঙ্গণে পুঞ্জীভূত করিতেছে।"

একটু পূর্বে 'দর্শক' পত্রিকার উল্লেখ করা হয়েছে। তার কয়েকটি বাক্য তুলে ধরা হচ্ছে। যা একটি সাঙ্ঘাতিক, মারাত্মক, দুষ্প্রাপ্য দলিল। আধুনিক ইতিহাস গবেষকদের অনেকের মতে তথাকথিত 'সিপাহী বিদ্রোহে' সারা ভারতবর্ষে প্রচন্ড শক্তিসম্পন্ন মুসলমান জাতি সেই সঙ্গে দলিত নিপীড়িত হরিজন আদিবাসী সাঁওতাল প্রভৃতি ভারতবাসীর সৃষ্টি করা ঐ বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। ঐ ১৮৫৭-তেই তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে নিয়ে চলে যেতে হোত। কিন্তু সরকারের তৈরি করা ঐ বাবুশ্রেণী, ভদ্রলোক রাজা মহারাজা, বিদ্যাবিনোদ, প্রিন্স, রায়বাহাদুর, স্যার ও নাইট প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত বহু বিশ্বাসঘাতক ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে ঐ বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল; নেতাদের

ধরিয়ে দিয়েছিল এবং তাঁদের গোপন পরিকল্পনা জানবার জন্য হিতাকাঙ্খী হয়ে ভিতরে ঢুকে সমস্ত সংবাদ ও তথ্য সরকারকে জানিয়ে তারা নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছিল, বৃটিশকে টিকিয়েও রেখেছিল। যদি ওটুকু না হোত তাহলে ১৯০ বছর পূর্বেই ভারত স্বাধীন হয়ে যেত— কোটি কোটি টাকা, সোনা রুপো, মণি মানিক্য, হীরে জহরত ভারতেই থেকে যেত, লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণে বাঁচত, আর সবচেয়ে বড় কথা হোল, ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো না হয়ে অবিভক্ত হয়ে বিরাজ করত পৃথিবীতে।

'দর্শক' পত্রিকার মন্তব্য—"প্রত্যেক বাঙালীরই এই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিৎ। যখন সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া দেশে মহামারী ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, যখন অল্প সংখ্যক ইংরাজ কর্মচারীগণ বিদ্রোহীগণের ক্রোধাগ্নিতে পতিত হইয়াছিল সেই সময়ে নিরস্ত্র মসিজীবী বাঙালী কিরূপে আত্মরক্ষা করিয়া সেই বিপদ সময়ে মনিবের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, কিরূপে আপনার জীবনকে বিপন্ন করিয়া বিদ্রোহীগণের মধ্যে গুপ্তভাবে থাকিয়া তাহাদের ষড়যন্ত্রের কথা রাজকর্মচারীগণের গোচর করিয়াছিলেন, কিরূপে সরকারী কর্মচারীগণকে সাহায্য করিবার জন্য বিদ্রোহীগণের বিষনজরে পতিত হইয়াছিলেন, বাঙালী হিন্দু যাহার নিমক খায় প্রাণ দিয়াও কিরূপে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে হয় তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। সামান্য কেরানী সরকারী কার্য করিবার জন্য বিদ্রোহীগণ কর্তৃক নগর অবরুদ্ধ ও লুণ্ঠিত হইলেও কিরূপে দুর্জয় সাহসে সেই আক্রান্ত স্থানে থাকিয়া তথাকার সকল সংবাদ বিশ্বস্ত কর্মচারী দ্বারা দূরদেশে প্রেরণ করিতেন, কিরূপে বিদ্রোহীগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া তাহাদের নেতার সমক্ষে বিচারার্থ প্রেরিত হইয়া বুদ্ধিবলে তথা হইতে দূরদেশে পলায়ন করিয়া পুনরায় দৌত্য কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এই সকলের ঐতিহাসিক সত্য তথ্যগুলিও এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কিরূপে স্বীয় ধৈর্য, শৌর্য, বীর্যবলে আবশ্যকমত বিদ্রোহীগণের উদ্দেশ্য বিফল করিয়া বহু শ্বেতাঙ্গ রাজ কর্মচারী নরনারীর ও শিশুগণের জীবন রক্ষা করিয়াছিল এবং এই সকল সম্বন্ধে উচ্চ রাজপুরুষগণ লিখিত ইতিবৃত্তও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।" [দ্রষ্টব্য : 'দর্শক', ১০ই ভাদ্র, ১৩৩২ সাল]

সিপাহী বিদ্রোহের বিপ্লবীদের সঙ্গে বৃটিশের লড়াইকেই আমরা 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলি। কিন্তু অপ্রকাশিত সত্য তথ্য হোল, বাবু শ্রেণী, রাজা মহারাজা, স্যার, নাইটের দলও প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করেছেন বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে, বিপ্লবীদের গ্রাম ও বস্তিতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং যতটা সম্ভব তাদের ধনসম্পত্তি লুঠ করে বৃটিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। যেমন লর্ড ক্যানিং-এর সময় পিয়ারী মোহন ব্যানার্জী নিবিড় পরিকল্পনা তৈরি করেছেন বৃটিশের স্বপক্ষে, বিপ্লবীদেরকে আক্রমণ করে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন তাদের গ্রামের পর গ্রাম, লুঠ করেছেন এবং বৃটিশের দেওয়া ধন্যবাদ ও উৎসাহব্যঞ্জক বাণীগুলো তাদেরকে

শুনিয়েছেন নিয়মিত। 'দি পাইওনিয়র' পত্রিকায় বইটির প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে লেখা হয়েছিলো— "... Peary Mohun Banerjee and numerous others. The last named gentle man was described by Lord Canning in his despatch as a ' fighting munsiff ' and rendered conspicuous services to the Government during the Sepoy Mutiny. He not only held his own defiantly, but he planned attacks, burnt villages, wrote English despatches thanking his subordinates and displayed a capacity for rule and a fertility of resource."

১৯১৫-তে ছাপা একটা পুরনো বস্তাপচা সংবাদ চালাবার এটা একটা ব্যর্থ প্রয়াস বলে হয়তো মনে করবেন কিছু পাঠক। কিন্তু সব পুরনো বস্তুই মূল্যহীন নয় বরং অনেক সময় তা খুবই দুর্লভ ও মহামূল্যবান হয়ে ওঠে। আমাদের দেশের কচি কাঁচারা এ সব চাপা পড়া কথা না জানলেও এখনো কিছু বৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ রয়েছেন যাঁরা জানেন সম্পূর্ণ ব্যাপারটি। ১৯১৫-র কথা ছেড়ে দিয়ে ১৯৯৯-এর ১৩ই আগস্ট-এর 'ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি লেখাকে কেন্দ্র করে শ্রী প্রদীপ কুমার দাসের যে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে তার কিছু অংশ তুলে ধরছি এখানে। এতেও প্রমাণ হবে বাঙালীর ইংরেজপ্রীতি, আর সন্ধান পাওয়া যাবে সেই সময়কার সত্য এবং তথ্যপূর্ণ ইতিহাসের :

'ইংরেজ এদেশে না এলে কলকাতা শহরটাকে কি আমরা পেতাম? ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতাই বোধহয় একমাত্র শহর যেটা একান্তভাবে ইংরেজের সৃষ্টি। আজকের ভারতবর্ষ বা ইণ্ডিয়ার জন্মই হোতনা ইংরেজ না এলে, যদিও আমরা বলি ইংরেজ ভারত ভাগ করেছে। ভারত বলে যে ভূখণ্ড ছিল সেটা ইংরেজ আসার আগেই খণ্ড খণ্ড সার্বভৌম দেশে বিভক্ত ছিল। ইংরেজ না এলে বর্তমান কালে বঙ্গদেশ, কলিঙ্গ দেশ, মারাঠা দেশ, রাজপুতানা— কত কী দেশ পাওয়া যেত! ... বাঙালীদের সার্বিক উন্নতি ইংরেজ আমলেই। যার শুরু ইংরেজের কলকাতা শহর শুরুর সঙ্গে সঙ্গে, অবনতি শুরু ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে যাবার পর থেকেই। সেই আমলেই বাঙালী লাহোর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত রাজত্ব করেছে। মাষ্টারি, ডাক্তারি, ওকালতিতে আমাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। ওড়িশা এবং বিহারের বহু স্থানে বাংলা ছিল শিক্ষার মাধ্যম। ইংরেজ আমলেই ভারতবর্ষে তিনটি নোবেল প্রাইজ এসেছিল। আর সবকটাই কলকাতাতে বসে কাজ করার সুবাদে।"

বাঙালী দর্পণ

বঙ্গের কদর্য চরিত্রের ব্রাহ্মণদের কথা স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে বলে গেছেন তা তদানীন্তন দলিল হিসেবে যথেষ্ট। ব্রাহ্মণদের পর কায়স্থ সম্প্রদায়ের জন্য নীরদ সি. চৌধুরী একটি সংস্কৃত শ্লোক তুলে দিয়ে তার অর্থ করেছেন : "যে কায়স্থ কানে কলম গুঁজিয়া বসিয়া আছে তাহাকে বিশ্বাস করিবে না, বরঞ্চ গোক্ষুর সাপকে বিশ্বাস করিবে, বনের ব্যাঘ্রকে বিশ্বাস করিবে।" তারপর লিখেছেন, "আমাকে যাহারা ঘাঁটাইতে আসেন তাঁহারা যেন এই সংস্কৃত শ্লোকটি ভুলিয়া না যান।"

আমার মনে হয় 'কৃষ্ণ সর্পেষু'র অর্থ গোক্ষুর না হয়ে কেউটে হলে ভাল হোত। লেখক এত বড় মাপের বুদ্ধিজীবী যে তাঁর বিপক্ষে বলতে সংকোচ আসে স্বাভাবিক ভাবেই। তাঁর সম্পর্কে সামান্য পরিচয় দিলে তাঁর লেখার গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজ হবে।

তিনি আন্তর্জাতিক স্তরের বুদ্ধিজীবী লেখক। ১৯৭০ থেকে লন্ডনেই ছিলেন সেখানকার নাগরিক হয়ে। অক্সফোর্ড থেকে পেয়েছেন ডি. লিট.। ডাফ্ কুপার স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৬৬-তে। ১৯৯৩-এ ইংলন্ডের রাণীর কাছ থেকে পেয়েছেন C.B.E. উপাধি। ১৯৮৯-এ পেয়েছেন ভারতের আনন্দ পুরস্কার। ১৯৯৭-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার। তিনি চারটি ভাষায় দক্ষতা রাখতেন বিশেষভাবে— বাংলা, ইংরেজি, জার্মান ও ফ্রেঞ্চ। ইংরেজ লেখকদের বক্তব্য, তাঁর মতো ইংরেজি লেখা সে দেশের অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। যেহেতু তিনি ইংলন্ডের প্রবাসী তাই সত্য তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ করতে ভারত সরকার ও ভারতের কোন সংস্থা, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিকে ভয় করেন নি মোটেই। তাঁর লেখায় তা প্রমাণিত।

নীরদ চৌধুরী নিজে বাঙালী হয়েও বাঙালী চরিত্রের মূল্যায়ন করতে যে সাহসিকতা দেখিয়েছেন সে সাহস সাহসই, তা সৎসাহস হোক বা দুঃসাহস।

সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর ব্রিটিশ মীরজাফরের কাছে নবাবীর বিনিময়ে এবং যুদ্ধ বাবদ ক্ষতিপূরণের জন্য এককোটি টাকা দাবী করে। কায়স্থ দেওয়ান রায়দুর্লভ হিসাব করে দেখে নিলেন, মোট আছে দেড় কোটি টাকা। তা তিনি সরিয়ে ফেলে শতকরা ৫ টাকা কমিশনের পরিবর্তে প্রয়োজনীয় টাকা যোগাড় করতে পারবেন বলে জানান মীরজাফরকে। ক্লাইভকে বাধ্য হয়ে ঐ কমিশন মেনেই টাকা নিতে হয়। অথচ ঐ রায়দুর্লভ ছিলেন সিরাজুদ্দৌলার অত্যন্ত বিশ্বস্ত (?) এবং ক্লাইভের ভাষায়

'Principal Minister'।

ইংরেজদের ঔরসজাত একটি সম্প্রদায় সৃষ্টির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। নীরদবাবু বাঙালীদের জন্য লিখেছেন, "শুনিয়াছি খচ্চর পিতার নাম শুনিতে চাহে না; উহার কারণ তাহার অশ্বীমাতা গর্দভের ঔরসে তাহার জন্ম দান করে। বর্তমান যুগের শিক্ষিত বাঙালীর পিতা হিসাবে ইংরেজ যে গর্দভ জাতীয় ছিল তাহা বলা চলে না, তবুও এই অনিচ্ছা কেন? ইহার প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করিতে হইবে।" [আমার দেবোত্তর সম্পত্তি, পৃ. ৪১]

নীরদবাবু লিখেছেন নিজের জীবনের একটি ঘটনা। একটি ট্রেনের কামরায় পাজামা শেরওয়ানি পরা দুজন মুসলমান ভদ্রলোক উঠলেন। লেখক তখন বঙ্গের 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পিপাসা পাওয়ায় নীরদবাবু ট্রেনে কমলালেবু কিনলেন এবং খেলেনও। তখন পাশে বসা বাঙালী ভদ্রলোকেরা তাঁর পরিচয় নিয়ে জানলেন যে, তিনি বনগ্রামের চৌধুরী বংশের সম্ভ্রান্ত বাঙালী হিন্দু। তখন তাঁরা জানালেন যে, মুসলমানদের সামনে জলপান করলে ধর্মে ক্ষতি হয়। কামরায় মুসলমান ছিল। কমলালেবুতে জল থাকে। তাহলে কি করে তা খাওয়া সম্ভব? শেষে একজন বাঙালী ক্ষুব্ধ স্বরে বলেন, "বনগ্রামের চৌধুরী হয়েই আপনি যদি এরকম দৃষ্টান্ত দেখান, তাহলে সাধারণ লোকে কি না করবে? ১৯২৭ সন, তখন মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন।" [পৃ. ১৩৬]

বাঙালীদের রুচির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, পাঁচ-ছ বছরের মেয়েরা সকলের সামনে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াত। কোমরে একটি ঘুনসী থাকতো মাত্র।

যে ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনা করা হোল তাতে জানা গেল যে, ইতিহাসের আধুনিক বিরাট বেলুনটি প্রকাশিত হয়েছে বাবু সমাজ সৃষ্টির সাথে সাথে। নীরদবাবুও লিখেছেন, "যাহা হউক, রামায়ণ-মহাভারত পড়া কথাতে ফিরিয়া আসি। তখন আমাদের কাছে রামায়ণ মহাভারত প্রাচীন ভারতের একমাত্র ইতিহাস ছিল।"

তিনি আরও লিখেছেন, "আমি যে যুগে জন্মিয়াছিলাম তখন বাঙালীর জীবনে অতি উগ্র একটা আর্যামি ছিল, উহার প্রকাশ দেখা যাইত নব হিন্দুত্বে।... ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য যখন এইরূপ প্রচেষ্টা চলিতেছিল, ঠিক তখনই মনে মনে ইংরেজ হইবার চেষ্টা ও উদ্যম কি দেশদ্রোহিতা নয়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে, এবং এই অধ্যায়ের শেষে নিশ্চয় দিব। আপাততঃ শুধু ইহাই বলিয়া রাখি যে, এই প্রচেষ্টা যদি দেশদ্রোহিতা হয় তবে একা আমিই দেশদ্রোহী নই, প্রতিটি শিক্ষিত বাঙালীই দেশদ্রোহী হইয়াছিলেন।" তিনি আরও বলেছেন, "তখন বাঙালীর মধ্যে সেকসপীয়ার পূজা দুর্গাপূজার চেয়ে কম প্রচলিত ছিল না।" [পৃ. ১৪৬, ১৪৯]

বাঙালীদের স্বামী স্ত্রীর প্রেম এমন পর্যায়ে ছিল যা এখনকার সঙ্গে মিলবেনা। মৌলিক ভালবাসা বলতে যা বোঝায় সেটি তখন ছিল প্রায় অনুপস্থিত। জীবনসাথী, সহযোগিনী স্ত্রী যখন গুরুতর অসুস্থ হোত তখন তাকে রেখে আসা হোত তার বাপের বাড়িতে। স্বামী তার স্ত্রীর জন্য খরচ করতে ছিল অত্যন্ত কুণ্ঠিত। [তথ্য : ঐ, পৃ. ২৫৩-৫৪]

নিজের স্বার্থের জন্য হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্ম হওয়া আবার স্বার্থের জন্যই হিন্দু ধর্মে ফিরে আসা তখন একটা নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। লেখকের বংশও ঐ অভিযোগে অভিযুক্ত।

অধিকাংশ বাঙালী প্রাচীন আর্য সভ্যতা, প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা প্রচার করলেও লেখক লিখেছেন, "এই সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয় ১৮১৭ সনে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে।... অবশেষে ১৮৫৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বাঙালী মনের নতুনরূপ সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। ইহাকে বাঙালী জীবনের রিনেসেন্স বলা যাইতে পারে। আসলে এই পরিবর্তনকে একটা মানসিক রিভল্যুশানই বলা যেতে পারে।" [নীরদ চৌধুরী : আত্মঘাতী বাঙালী, পৃ. ১৫]

ইংরেজ পরিচালিত ইতিহাস যজ্ঞ বা সাহিত্য যজ্ঞ যা চালানো হয়েছিল তখনকার কলেজগুলোতে, সেখানে বিলেতি দেশী দুরকম অধ্যাপক একসঙ্গে কাজ করতেন। কিন্তু কোন দলই কোন দলের কথা ঠিকমত বুঝতে পারতেন না।

চৈতন্যপ্রভুর প্রশংসা বিশেষভাবে প্রচারিত। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি ছিলেন অহিংসবাদী। লেখক প্রমাণ করেছেন যে, তিনি ছিলেন হিংস্র বা জঙ্গী। কারণ "কাজীর বাড়ি আক্রমণ করেছিলেন ও উত্তেজনার বশে শান্তিপুরের ভাষা ভুলিয়া শ্রীহট্টের ভাষায় গর্জন করিলেন, 'তোরে মাইরা ফেলাইমু'।" [ঐ, পৃ. ১৭]

নীরদবাবু লিখেছেন, "পক্ষান্তরে ইতিহাসের দিক হইতে অসত্য ও ভিত্তিহীন একটা ধারণাই উদ্ভূত ও প্রচলিত হইয়াছিল। সেটা এই— বাঙালী প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার উত্তরাধিকারী, সেই সভ্যতা বাঙালী জীবনে অটুট ছিল।"

তিনি লিখেছেন, "প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার এই রূপান্তর কবে আরম্ভ হয় তাহার কাল নিরূপণ আমি এখনও করিতে পারি নাই। কিন্তু এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই ইহার প্রধান কারণ।... অন্ততঃ একথাটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মুসলমান যুগই হিন্দু জনসমষ্টির মধ্যে অগণিত লৌকিক ধর্ম, লৌকিক আচার, লৌকিক সাহিত্য ও লৌকিক সঙ্গীত ইত্যাদির সৃষ্টিকাল। ইহার ফলে আমরা যে গ্রাম্য সংস্কৃতির সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তাহাই বৃটিশ যুগের প্রাক্কালে আমাদের একমাত্র সম্বল ছিল।"

"এমনকি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও, অর্থাৎ ১৮১৭ সন হইতেও সেক্স্‌পীয়ার পড়াকে যেমন, তেমনি মদ গোমাংস খাওয়াকেও পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হওয়ার অঙ্গ বলিয়া অনেকেই মনে করিত।" [পৃ. ৪৪]

এইরকম ভন্ড সমাজ সংস্কারকদের কথা রবীন্দ্রনাথও জানতেন। তাই তিনি তাঁর বইতে লিখেছেন, "তখনকার দিনে কলেজে আমরা দুজনেই এক জুড়ি ছিলুম— দুজনেই মস্ত কালাপাহাড়— কিছুই মানতুম না— হোটেলে খাওয়াটাই একমাত্র কর্তব্য কর্ম বলে মনে করতুম। দু'জনে কতদিন গোলদিঘিতে বসে মুসলমান দোকানের কাবাব খেয়ে তারপর কী রকম করে আমরা হিন্দু সমাজের সংস্কার করব রাত দুপুর পর্যন্ত তারই আলোচনা করতুম।" [দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃ. ৪৪]

লেখক বঙ্কিমের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, বঙ্কিম লিখে গেছেন—"কোন কোন তাম্রশ্মশ্রু ঋষির মত্ এই যে, যেমন বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তিল করিয়া সংগ্রহপূর্বক এই অপূর্ব নব্য বাঙালী চরিত্র সৃজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণ পটুতা ও গর্দভ হইতে গর্জন— এই সকল একত্র করিয়া দিঙমন্ডল উজ্জ্বলকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত এবং ভট্ট মোক্ষমূলরের আদরের স্থল নব্য বাঙ্গালীকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন।" [দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃ. ৪৫]

বিশ্বখ্যাত বিবেকানন্দের উক্তি দিয়ে লেখক তুলে ধরেছেন আমাদের দেশের তখনকার পোষাক পরিচ্ছদ এবং চালচলনের ছবি—"মেয়ে মদ্দে কৌপীন পরা। বুদ্ধদেবের বাপ কপনী পরে বসেছেন সিংহাসনে, তদ্বৎ মা-ও বসেছেন— বাড়ার ভাগ এক পা মল ও এক হাত বালা; কিন্তু পাগড়ি আছে। সম্রাট ধর্মাশোক ধুতী পরে চাদর গলায় ফেলে, আদুড় গায়ে একটা ডমরু আকার আসনে বসে নাচ দেখছেন। নর্তকীরা দিব্য উলঙ্গ; কোমর থেকে কতকগুলো ন্যাকড়ার ফালি ঝুলছে। মোদ্দা পাগড়ি আছে— নেবুটেবু সব ঐ পাগড়িতে।" [লেখক উদ্ধৃত করেছেন স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে, দ্রঃ ঐ, পৃ. ৪৯]

লেখক লিখেছেন, "১৯২০ পর্যন্ত হিন্দু পরিবার আধুনিক হইলেও উহার বিবাহিতা মেয়েরা কখনোই জুতা পরিত না।" লেখক তাঁর মায়ের জন্য লিখেছেন, গাড়িতে তাঁর মায়ের পায়ের জুতোর দিকে তাকিয়ে লোকে জিজ্ঞাসা করতো—'আপনারা?' তাঁর "মাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইত 'আমরা ব্রাহ্ম'। নহিলে বেশ্যা বলিয়া মনে করিবার সম্ভাবনা ছিল"।

"বাঙালী পুরুষ ইংরেজ রাজত্বের আগে একমাত্র মুসলমান নবাবের কর্মচারী হইলে মুসলমানী পোষাক পরিত, উহা অন্দরে লইয়া যাওয়া হইত না। বাহিরে বৈঠকখানার পাশে একটা ঘরে থাকিত। সেখানে চোগা চাপকান ইজার ছাড়িয়া পুরুষেরা ধুতি পরিয়া ভিতরের বাড়িতে প্রবেশ করিত। তাহার প্রবেশদ্বারে গঙ্গাজল ও তুলসীপাতা থাকিত। ম্লেচ্ছ পোষাক পরিবার অশুচিতা হইতে শুদ্ধ হইবার জন্য পুরুষেরা গায়ে গঙ্গাজল ছিটাইয়া মাথায় একটা দুইটা তুলসীপাতা দিত।" [ঐ পৃ. ৫০]

বাঙালী চরিত্র চিত্রিত করতে শ্রী চৌধুরী লিখেছেন, গৃহিণীর দু তিনটি ছেলেপুলে হওয়ার পরেও স্ত্রীকে চিনতে পারতো না তার স্বামী—"তিন ছেলের মা হইবার জন্য যতটুকু প্রেমের প্রয়োজন হয় তাহা অবশ্য পাইয়াছিলেন। ... প্রথমতঃ তখনও গোঁড়া পরিবারে স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাত দিনের বেলায় হইত না। স্ত্রী ঘরের কাজ শেষ করিয়া রাত্রি নয়টা দশটা নাগাদ গিয়া শুইয়া থাকিতেন। মশার জন্য মশারি থাকিত, তাহা ভারী হইত— 'নেটে 'র হইত না। বাহিরে পিলসুজের উপর প্রদীপ টিমটিম করিয়া জ্বলিত। কাছে একটা লম্বা কঞ্চে থাকিত। স্বামী দশটার পর বাহির বাটী হইতে আসিতেন ও শয়নঘরে ঢুকিয়া বিছানার কাছে গিয়া সেই কঞ্চে দিয়া দীপ নিবাইয়া স্বস্থান অধিকার করিতেন। সুতরাং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধান যেটি, অর্থাৎ চক্ষু, সেটা দিয়া স্ত্রীকে উপলব্ধি করার সুযোগ হইত না, অন্য চারটি অর্থাৎ কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক মাত্র দিয়া হইত। স্ত্রীরও তদ্রুপ। ... এই অসুবিধা ছাড়া একটা বিশেষ ধরণের স্ত্রী আচারের জন্যও আমাদের অঞ্চলে ঘরে আলো রাখা হইত না। তখন সেখানে সম্পন্ন গৃহস্থেরও পাকা বাড়ী ছিলনা। আটচালাগুলির বেড়া হইত দরমার, তাহাতে ফাঁক বা ছিদ্র থাকিত। রাত্রিতে কৌতুহলী জায়েরা ও ননদেরা ঐসব জায়গায় চক্ষু রাখিয়া দাম্পত্য প্রেম কিরূপ তাহা দেখিতে চাহিত। সুতরাং বুদ্ধিমান স্বামীরা শয্যায় প্রবেশ করিবার আগেই প্রদীপ নিবাইত, পত্নীকে লজ্জা নিবারণের জন্য মুষ্টিচূর্ন ছুড়িয়া নিবাইতে হইত না।" [পৃ. ৭২-৭৩]

"বাঙালীর মধ্যে মাতৃভক্তি লইয়া শুধু বাড়াবাড়ি নয়, ভন্ডামি আছে। উহার সবচেয়ে ঘৃণ্যরূপ দেখা যাইত একটি প্রচলিত উক্তিতে— সেটি বিবাহ করিতে যাইবার আগে মাকে বলা—'মা তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি'। বিবাহের ও নরনারীর প্রেমের ইহার অপেক্ষা গুরুতর অবমাননা কল্পনা করা যায় না। ইহার মধ্যে ভন্ডামি কোথায় ছিল বলিতেছি। পুত্র রাত্রির জন্য বেশ্যা চান, তাই মাকে দাসী আনিয়া দিবার ভান করেন; মাতা চান দাসী। তাই পুত্রকে বেশ্যা যোগাড় করিয়া দেন।" [ঐ, পৃ. ৮০]

"আমাদের সমাজে তখনকার দিনে সম্বন্ধের বিবাহে অসুখ প্রধানতঃ হইত বধূর রূপ না থাকিলে। পুত্র রূপসী বধূ চায়, পিতা বংশ বা টাকার খাতিরে রূপহীনার সহিত তাহার

বিবাহ দিতেন। রূপ সম্বন্ধে আপত্তি সে যুগের পিতাদের বোধগম্যই হইত না। তাঁহারা মনে মনে বলিতেন, 'তোকে কে রূপের পেছনে যেতে মানা করেছে। তা চাস্ তো বেশ্যাবাড়ি আছে, পরস্ত্রী আছে এমনকি ঘরেও বৌদিদিরা আছে। তাদের নিয়ে যা কিছু কর না, আমি কি তা দেখতে যাচ্ছি ?" [ঐ, পৃ. ১০৪-১০৫]

তখন ছোট ছোট কচি মেয়েদের বিয়ে হোত, আর জামাইটি হোত অনেকক্ষেত্রেই যুবক। সুতরাং জামাতার যৌনক্ষুধা ঐ ছোট মেয়ে মেটাতে সক্ষম নয় বলে শাশুড়িরাই অনেকক্ষেত্রে সে দায়িত্ব পালন করতেন। সেজন্য শাশুড়িরা জামাতার সামনেও ঘোমটা দিতেন, সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলতেন এবং 'তুমি' না বলে 'আপনি' বলতেন। নীরদ চৌধুরী তাই লিখেছেনও—"তবে সেকালে অনেক সময়েই শাশুড়ি ও জামাতার বয়স প্রায় সমান সমান হইত, বধূ হয়ত হইত এগারো বারো বছরের। তাই যেসব শাশুড়িরা আচরণ সম্বন্ধে অবহিত হইতেন তাঁহারা জামাতার সম্মুখেও ঘোমটা দিয়া থাকিতেন, এবং কথা কহিলেও অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত বলিতেন। আমার দিদিমাকে এইরূপ দেখিতাম। কিন্তু সকল শাশুড়ি এক চরিত্রের হইতেন না, তখন আগুনের খাপরার যত প্রগলভা নায়িকাতুল্যা শাশুড়ির কাছে কচি স্ত্রী মুগ্ধা নায়িকার মতও হইত না, নিতান্ত কাঁচা পেয়ারার মত হইত।" [পৃ. ১২১-১২২]

তারপর লেখক বিভূতিবাবুর সমপাঠীর উল্লেখ করে একাধিক ঘটনা লিখে প্রমাণ করেছেন যে, তখন শাশুড়ি জামাইয়ের যৌন সম্পর্কের একটা নিয়ম বা রেওয়াজ ছিল।

লেখক নিজের জন্য প্রচন্ড সাহসিকতার সঙ্গে লিখেছেন—"আমার নিজের বিবাহের সময় আমার বয়স ও আমার স্ত্রীর বয়সের মধ্যে বারো বৎসরের পার্থক্য ছিল, এবং আমার আর আমার শাশুড়ির মধ্যে পার্থক্য ছিল তেরো বছরের। সুতরাং বিভূতিবাবুর সমপাঠীর মত চরিত্র আমার হইলে সহজেই উভচর হইতে পারিতাম। বিভূতিবাবু যে ইতিহাস দিলেন তাহা আমাদের কালেও ঘটিতে পারিত।" [ঐ,পৃ. ১২২]

বাঙালী জমিদার বাবুদের বার্ধক্যের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে লিখেছেন, "রাজা বাহাদুর তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। তাহা ছাড়া বাতে পঙ্গু। সুতরাং তিনি তাঁহার যুবা বয়সের রক্ষিতার বাড়িতে যাইতে পারেন না। তাই প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বৃদ্ধা রক্ষিতা তাঁহার বাড়িতে আসিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পদসেবা করিয়া নিজের বাড়িতে ফিরিয়া যাইতেন। মনে রাখিতে হইবে সম্ভ্রান্ত বাঙালী গৃহস্থ তখনকার দিনে প্রৌঢ় হইবার পর আর অন্তঃপুরে ঘুমাইতেন না। ব্যাপারটা শুনিয়া বুঝিলাম, ইংরেজি শিক্ষার গুণে রক্ষিতার বেলাতেও সতীত্বের আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে। প্রৌঢ় স্বামী পত্নীকে অবহেলা করিলেও উপপত্নীকে ভোলেন নাই। কারণ পত্নী তাঁহার পিতার দান, উপপত্নী স্বেচ্ছাবৃত প্রণয়িনী।" [ঐ,পৃ. ১২৬]

লেখকনিজের জন্য লিখেছেন, "সেজন্য আমি সারা জীবনেও দেশে কোন থিয়েটার দেখি নাই। আমার বাল্যকালে অভিনেত্রীরা বেশ্যা বলিয়া থিয়েটারের প্রতি ব্রাহ্মপন্থীদের ঘোর আপত্তি ছিল।"

ব্রাহ্ম ও রক্ষণশীল হিন্দুরা অনেকক্ষেত্রে ভিন্নমুখী হলেও নারীর প্রতি ব্যবহার প্রায় একই রকম করতেন। লেখক লিখেছেন, "কিন্তু তিনটি ব্যাপারে না ব্রাহ্ম, না নব্য রক্ষণশীল বাঙালী কেহই ঢিলা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই তিনটি এই— স্ত্রীলোক ঘটিত অনাচার, অর্থঘটিত অসততা ও মদ্যপান।" [ঐ,পৃ. ১৬৪]

ধর্মে দ্বিচারিতার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্ম লেখক নীরদবাবু নিজের জন্য লিখেছেন, "গ্রামের পৈতৃক বাড়িতে ধূমধাম করিয়া দুর্গাপূজা হইত। তাহাতে যোগ দিবার জন্য প্রতি বৎসর কিশোরগঞ্জ শহর হইতে পৈতৃক নিবাস বনগ্রামে যাইতাম— বলির পাঁঠার তত্ত্বাবধান করিতাম, পাঁঠা এবং মহিষ বলি দেখিতাম।" [ঐ, পৃ. ১৬৫-৬৬]

ব্রাহ্ম পুরোহিতরা এই দ্বিচারিতা পছন্দ করতেন না। তাই এক ব্রাহ্ম পুরোহিতের প্রার্থনার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, "তিনি অন্যান্য প্রার্থনার মধ্যে ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাও করিলেন,— হে ভগবান, যাহারা দুর্গাপূজার ছুটির সময় গ্রামে গিয়া দুর্গার প্রতিমাকে প্রণাম করে আর শিলং-এ আসিয়া তোমার উপাসনা করিতে চায় তাহাদের মাথায় কুঠার মারো, কুঠার মারো, কুঠার মারো। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও শিক্ষিত হিন্দুরা দুই কুলই রাখিয়া দুর্গাপূজা ও ঈশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিল।" [ঐ,পৃ. ১৬৭]

বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর চরিত্র জেনে শুনেই লিখেছেন, "আমরা একটি জমিদার দেখিয়াছি। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত হিন্দু। তিনি অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া কি শীত কি বর্ষা প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করেন এবং তখনই পূজাহ্নিকে বসিয়া বেলা আড়াই প্রহর পর্যন্ত অনন্যমনে নিযুক্ত থাকেন। পূজাহ্নিকের কিছুমাত্র বিঘ্ন হইলে, মাথায় বজ্রাঘাত হইল, মনে করেন। তারপর অপরাহ্নে নিরামিষ শাকান্ন ভোজন করিয়া একাহারে থাকেন— ভোজনান্তে জমিদারি কার্যে বসেন। তখন কোন্ প্রজার সর্বনাশ করিবেন, কোন্ অনাথা বিধবার সর্বস্ব কাড়িয়া লইবেন, কাহার ঋণ ফাঁকি দিবেন, মিথ্যা জাল করিয়া কাহাকে বিনাপরাধে জেলে দিতে হইবে, কোন্ মোকদ্দমার কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাতেই তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, এবং যত্ন পর্যাপ্ত হয়। আমরা জানি যে, এ ব্যক্তির পূজায়, আহ্নিকে, ক্রিয়াকর্মে, দেবতা ব্রাহ্মণে আন্তরিক ভক্তি, সেখানে কপটতা কিছু নাই। জাল করিতেও হরিনাম করিয়া থাকেন। মনে করেন এসময় হরি স্মরণ করিলে এ জাল করা অবশ্য সার্থক হইবে।" এরপর শ্রীনীরদচন্দ্র লিখেছেন— "এরপর

বঙ্কিম এইসব বলিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'এ ব্যক্তি কি হিন্দু ?' এ যে হিন্দু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ সে সময়ে হিন্দুত্বে ঐহিক ও পারত্রিক ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছিল। ... বঙ্কিমের এই রচনার তারিখ ১৮৮৪।" [ঐ,পৃ. ১৭৪-৭৫]

বাঙালীদের মধ্যে দুরকমের মানুষ ছিলেন। একতরফে অনুন্নত অশিক্ষিত মূর্খ জনগণ, আর অন্য দিকে কাজ চলা গোছের আধাশিক্ষিত, ইংরেজ শাসকের কর্মচারি বা সাহায্যকারী সম্প্রদায়। প্রথমদিকে ইংরেজরা যাঁদেরকে ফোর্ট উইলিয়ম প্রভৃতি কলেজের প্রফেসর বলে চালিয়েছে তাঁরা অনেকে ছিলেন নামমাত্র পন্ডিত। তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয় জানতেন না। ছাত্রদের সামনে নিজেদের মধ্যে যা আলোচনা করতেন তা মোটেই শিক্ষকসুলভ ছিল না। কোন ক্ষেত্রে ছাত্রদের তিরস্কার করার প্রয়োজনে এমন সব কথা বলতেন তা আজকের সভ্য সমাজে অকল্পনীয়। যেমন : "পন্ডিতদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্রদের সঙ্গে বদ রসিকতা করা— কোনও সময় প্রচ্ছন্নভাবে, কোনও সময় খোলাখুলি। ছাত্রেরা অধ্যাপকের উক্তি মাথা নিচু করে শ্রদ্ধা সহকারে শুনিত। ... আশ্চর্যের কথা এই, রাগিলেও পন্ডিত মহাশয়েরা এই অধঃপতিত কাম হইতেই ভর্ৎসনার পারিপাট্য সাধন করিতেন। কলিকাতায় এক পন্ডিত মহাশয় রাগিলেই বলিতেন, 'তো ছোঁড়াদের যা অবস্থা তাতে তো বিছানার চাদর কেচে জল খাইয়ে দিলে ছুঁড়িদের পেট হয়ে যাবে'।" [দ্রষ্টব্য শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী : বাঙালী জীবনে রমণী, পৃ. ৪৭]

১৮৩১-এর ৫ই নভেম্বর সম্বাদ সুধাকর পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল তাতে স্বচ্ছল পরিবারের ছবি আঁকতে সক্ষম হয়েছিলেন সম্পাদক—

"ইঙ্গরেজি বিদ্যা শিক্ষা করণাশয়ে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক কলিকাতায় উপনীত হইয়া সুযোগক্রমে এতন্নগরস্থ কোন প্রধান ব্যক্তির ভবনে বাসা করিলেন। দিবা অবসানে যখন ঐ বিপ্রসন্তান সায়ংসন্ধ্যা করিয়া বসিয়াছিলেন তখন প্রথমতঃ বাটীর বৃদ্ধ কর্তা, তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র ও পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রও, ইহারা একে একে তাবৎই বাটী হইতে বহির্গমন করিলেন, তৎপরে দুইজন দৌবারিক ও অন্য কোন কোন চাকর অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া নিশাবসান করিল, যাবৎ কর্তা ও তাঁহার পুত্রেরা বাহিরে যামিনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ... যদিও উপরিউক্ত বৃত্তান্ত পাঠ করণান্তর অস্মদাদির ইঙ্গরেজ পাঠকেরা মনে মনে হাস্য করিয়া হিন্দু দিগের প্রতি ঘৃণা জন্মিলেও অসঙ্গত হয়না, তথাচ ঐ রূপ রীতি চরিত্র এই রাজধানীর মধ্যে এতাদৃক চলিত হইয়াছে যে এক্ষণে প্রায় অনেক বিশিষ্ট লোকেরা ইহাতে আশ্চর্যজ্ঞান করিবেন না।" [ঐ, পৃ. ৫২]

"বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'স্ত্রীলোকদিগের উপর যেরূপ কঠিন শাসন, পুরুষদিগের উপর সেরূপ কিছুই নাই। কথায় কিছু হয় না; ভ্রষ্ট পুরুষের কোন সামাজিক দন্ড নাই।

একজন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে না; হয়ত আত্মীয়স্বজন তাহাকে বিষ প্রদান করেন; আর একজন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্য্য করিয়া, রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাঁকাইয়া রাত্রি শেষে পত্নীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইয়া আসেন; পত্নী পুলকিত হয়েন; লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অসাধুবাদ করে না; লোক সমাজে তিনি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কেহ তাঁহার সহিত কোন প্রকার ব্যবহারে সঙ্কুচিত হয় না; এবং তাঁহার কোন প্রকার দাবিদাওয়া থাকিলে স্বাচ্ছন্দ্যে তিনি দেশের চূড়া বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারেন।'— অবশ্য এই বৈষম্য কমবেশী পৃথিবীর সর্বত্রই ছিল এবং আছে তবে পুরাতন বাঙালী সমাজে খুবই বেশী ছিল। সুতরাং কুলনারী-কুমারী, সধবা ও বিধবা যাহাই হউক না— প্রবৃত্তির বশে বা অনেক সময় অর্থের প্রলোভনে কিংবা পারিবারিক অত্যাচারে পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হইলে তাহাকে কুলত্যাগ করিয়া যাইতে হইত। চলিত ভাষায় ইহাকে বলা হইত 'বাহির হইয়া যাওয়া'। ইহাদের শেষ গতি প্রায় সব ক্ষেত্রেই হইত বেশ্যালয়ে।" [ঐ, পৃ. ৬৭]

তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়ের দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন,তাতেও প্রমাণ হয় বাঙালী চরিত্রের নগ্নরূপ। শ্বশুরেরা পুত্রবধূরদের সঙ্গে যৌনপাপে লিপ্ত ছিলেন। আর জামাতাদের শাশুড়ির সঙ্গে অপকর্মে লিপ্ত হবার ইঙ্গিত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। নীরদবাবু লিখেছেন, "সেকালে বাঙালীদের মধ্যে 'শাশুড়েএবং বৌও' বলিয়া দুটি গালি শোনা যাইত, উহার প্রথমটির অর্থ শাশুড়িরত ও দ্বিতীয়টির অর্থ পুত্রবধূরত। ... এই অনাচার ছাড়া দেবর-ভাতৃবধূ এমনকি ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের মধ্যেও অনাচার দেখা যাইত। দেবর-ভাতৃবধূর ফ্লার্টেশ্যন সামাজিক আচার ব্যবহারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। উহা কোনও কোনও সময়ে দৃষ্টিকটু বা শ্রুতিকটু হইলেও কেহ দোষ ধরিত না। ... কিন্তু সমাজের মধ্যে এই ধরণের অনাচার বেশি হইত অল্প বয়স্কা বিধবার সম্পর্কে। তাহাদের পদস্খলন যখন হইত, তাহা যে নিকট-আত্মীয়ের দ্বারা হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে সমস্ত বাঙালী সমাজ জুড়িয়া একটা বিরাট ভন্ডামি ছিল। ব্যাপক ভাবে ভ্রূণ হত্যা চলিলেও এই সামাজিক পাপ সম্বন্ধে সম্ভব হইলে সকলেই চুপ করিয়া থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদের দুঃখ এবং এই অনাচার, দুই দেখিয়াই বিধবা বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ... বাঙালী সমাজে বেশ্যাসক্তির পরিব্যাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। ব্রাহ্ম ধর্মের নৈতিক শিক্ষা প্রচার হইবার আগে বেশ্যালয়ে যাওয়া পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া ধরা হইত। অবশ্য সেখানে গেলে ধার্মিক বলিয়া খ্যাত হওয়া যাইত না কিন্তু নিন্দার বিষয়ও ছিল না। বরঞ্চ সাধারণ লোকে বিষয়ী সচ্চরিত্র ব্যক্তির অপেক্ষা দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকেই বেশি ভালবাসিত কারণ একদিকে

তাহাদের কুটিলতা, অর্থগৃধ্নুতা, ষড়যন্ত্র পরায়ণতা ইত্যাদি দোষ কম হইত অন্যদিকে তাহারা উদার প্রকৃতির ক্ষমাশীল মানুষ হইত। তাই একটি পুরাতন পুস্তকে এইভাবে দুশ্চরিত্র ব্যক্তির প্রশস্তি গাওয়া হইয়াছিল— 'লোকে যারে বলে লুচ্চ, সে কেবল জানিবা কুচ্ছ, লুচ্চ বিনা মজা জানে নাই / মারে মন্ডা আদা ছেনা, সাদা থাকে বাবুয়ানা, সোনাদানা তুচ্ছ তার ঠাঁই। / মাতাপিতা দাদাভাই, কাহার তোয়াক্কা নাই, দুঃখী নাহি হয় কার দুখে / কেহ যদি কটু বলে, সে কথা গায়ে না তোলে, সর্বদা সরল কথা মুখে। / বুদ্ধির নাহিক ওর, নরমেতে করে জোর, গরম নরম তার কাছে / যার সঙ্গে কোন ঠাঁই, কোনকালে দেখা নাই, যেন কত আলাপন আছে / লুচ্চ হলে দাতা হয়, কাহারও না করে ভয়, কেবল প্রেমের বশ রয়, / যে জন পিরিতে রাখে, তার প্রেমে বন্দী যাকে, তার জন্য বহু দুঃখ পায়।'

ইহাতে অবশ্য খানিকটা শ্লেষ আছে। তবুও ইহাকে সাধারণভাবে বেশ্যাসক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে জনমতের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অপর পক্ষে শহরে বেশ্যাদের খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, প্রসার-প্রতিপত্তি ও অর্থসম্পদ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করা চলেনা। নাম করিতে হইলে স্ত্রীলোককে হয় জমিদারের স্ত্রী অথবা বারাঙ্গনা হইতে হইত। রাণী ভবানী হইতে আরম্ভ করিয়া রাণী রাসমণি, মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী জাহ্নবী চৌধুরাণী পর্যন্ত রাণীরা যতই নামজাদা হোন না কেন, অন্যদিক হইতে আর এক রকমের নামের জোরও কম ছিলনা।... ইহার তৎকালীন ব্যাখ্যা দিতেছি, 'সেই স্ত্রীলোক স্বনামা যাহারদিগের নাম করিলে অনায়াসে বাবুগণ জানিতে পারেন; মধ্যমা-মাতৃ নামে যাহারা খ্যাত, তাহাদিগেরও বাবুরা জানেন। অধমা তাহারা, ছুকরীদের নামে যাহাদের পরিচয়; কিন্তু কুলবধূ সকলকে কোন বাবু জানেন না, এ কারণ তাহারা অধমের অধম'।" [দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃ. ৬৯-৭১]

সত্যি কথা বলতে কি, তখনকার দিনে সাধারণ কুলবধূদের অপেক্ষা পতিতা বা বারাঙ্গনাদের যে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হোত তার অনেকাংশ বিজ্ঞানসম্মত—"প্রত্যেক বেশ্যামাতাই জন্ম হইতে কন্যাকে শিক্ষা দিয়া থাকে। প্রথমে মিতাহার ইত্যাদির দ্বারা শরীরের তেজবল বাড়ায়। পাঁচ বৎসর বয়সের পর পিতার সহিতও বেশি মিশিতে না দিয়া বড় করে। জন্মদিনে পুণ্যদিনে উৎসব ও মঙ্গলবিধি করিয়া থাকে। পুরাপুরি কামশাস্ত্র পড়ায়; নৃত্যগীত, বাদ্য, চিত্রাঙ্কণ ইত্যাদি সকল কলা শেখায়; লিপিজ্ঞান ও বচন কৌশল আয়ত্ত করায়; ব্যাকরণ তর্কশাস্ত্র জ্যোতিষও কিছু কিছু শেখায়; নানা রকম ক্রীড়া কৌশল, দূতক্রীড়া ইত্যাদিতে দক্ষ করে— ইত্যাদি। এইরূপ আরও বহু জিনিস শিক্ষা দেওয়া হইত। পরে পর্বদিনে সাজাইয়া গুজাইয়া মেলা ও লোক সমাগমের স্থানে পাঠানো হইত, যাহাতে ধনী প্রণয়ী আনিতে পারে।" [দ্র. ঐ, পৃ. ৭২]

বারাঙ্গনারাও বুঝতো যে তাদের যৌনাচার প্রেম নয়, রোজগারের ধান্ধা মাত্র। তাদের মনস্তত্ত্বে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে তারা এত সামাজিক হতে পারতো না মোটেই। একজন শিক্ষয়িত্রী-বারাঙ্গনার কথা—"অতএব বাছা, আমারদিগের প্রেম যাহা হইতে অধিক টাকা পাওয়া যায়, তাহাদিগেরই সহিত প্রেম হয়, কিন্তু তাহাও নিপট প্রেম নয়, সেই কপট প্রেম জানিবা। বেশ্যা সত্যকার প্রেমে পড়িলে কলিকাতার খানদানি সমাজে প্রেমপত্রকে ইংরেজি অক্ষরে সংক্ষিপ্তভাবে পি-এন্ বলা হইত। এই দুর্বলতার কথা ধরিবার নয়। আসল বেশ্যার প্রেম সম্বন্ধে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত— 'তুমি এই প্রকার প্রেম করিবা, কাহারও দমে ভুলিবা না। বাবুকে আপনার কাবুতে আনিবা। ইহার পন্থা এই ছয় 'ছ'। (পঞ্চ 'ম' কারের মত) শিখিলে হয়, যথা— ছলনা, ছেনালি, ছেলেমি, ছাপান, ছেমো, ছেঁচড়ামি। অন্যগুলির অর্থ পাঠক অল্প স্বল্প অনুমান করিতে পারিবেন, তাই শুধু 'ছেমো' সম্বন্ধীয় শিক্ষা উদ্ধৃত করিতেছি। রক্ষিতা অবস্থায় থাকার সময়ে বাবু সন্দেহ করিয়া রাগ করিলে তাহাকে জব্দ করিবার উপায়কে 'ছেমো' বলে। বাবু সন্দেহ করিলেই ক্রোধ করিয়া মৌনা হইয়া থাকিতে হইবে। অনেক সাধ্য সাধনার পরও এক আধটা কথা কহিয়া নীরব থাকিতে হইবে। এইরূপ হক্-নাহক্ ক্রোধ করিয়া মৌনা হইয়া থাকিলে তাহাকেই ছেমো বলে। যদ্দপি প্রবঞ্চনা করিয়া কিঞ্চিৎ কপট রোদন করিতে পার তবে বড়ই ভাল এবং তোমার মাথা খাই এই একটি মাত্র কথা মুখ হইতে অর্ধেক নির্গত করিয়া দুই চক্ষে এক এক ফোঁটা জল বাহির করিয়া নীরব থাকিলেই বাবুর ক্রোধ মার্গে ঢুকিবেক, উল্টিয়া তোমাকে সাধ্য সাধনা করিবেন, এবং তোমাকে যত সাধিবেন তুমি ততই আপনার ছেমো প্রকাশ করিবা।... ধনী বা সচ্ছল লোকের বাড়িতে বেশ্যাসক্তি এতই স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লওয়া হইত যে খাজাঞ্চিখানাতে এই বাবদ খরচপত্রের জন্য 'স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার' কর্তার কাছ হইতে থাকিত, অবশ্য অনুচ্চারিত ভাবে। সুতরাং খাজাঞ্চি খতিয়ানে লিখিতে পারিত, 'ছোটবাবুর হিসাবে লালপেড়ে শান্তিপুরে শাড়ীর বাবদে দশ বা পনের টাকা'।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ৭২-৭৩]

নীরদবাবু শুধু কবির মত কল্পনা করে লিখে যান নি। তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক এবং সুভাষচন্দ্র বসুর সহোদর শরৎ বসু, যিনি বাংলা তথা ভারতের কংগ্রেসের নেতা এবং যাঁর বাড়িতে গান্ধীজী, জহরলাল, মোরারজি, কিরণশঙ্কর এক কথায় বড় বড় নেতাদের আসতে হোত, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারিও ছিলেন কিছুদিন।

তখনকার সমাজের ছবি আঁকতে গিয়ে লিখেছেন—"তবে ভদ্র যুবকেরা ইয়ারমহলে নিজের পত্নীকে লইয়াও যেভাবে আলাপ করিত, তাহাতে শালীনতার কোন গন্ধই থাকিত না। শুধু স্ত্রীর স্তন-নিতম্বের বর্ণনাতেই আলাপ আবদ্ধ থাকিত না, আরও অনেক গোপনীয়

স্থান পর্যন্ত যাইত।"

হামেশা যে সব ঘটনা ঘটতো তার কিছু উদাহরণ সত্য ঘটনা হিসাবে তিনি দিয়েছেন অকপটে। যেম ন নিকটাত্মীয়া বোনের গর্ভসঞ্চার, কাকা-ভাইঝির অবৈধ প্রণয় ইত্যাদি। শেষে এ কথাও লিখেছেন—" ... ইহাদের পরস্পরের কথামত কলিকাতার প্রত্যেকটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই হয় জারজ, নয় পরস্ত্রীরত, নয় অন্যরকম অপরাধে অপরাধী। যে সমস্ত আলাপের পিছনে ছিল স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে একটা অবিচ্ছিন্ন কামজ উত্তেজনা ও কলুষিত চিন্তা ও কল্পনা।" [পৃ. ৭৬ দ্রষ্টব্য]

বিশাল ভারতবর্ষের রাজধানী তখন কলকাতা। চলছিল ইংরেজ সরকারের শাসন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার রুচি সৃষ্টি হয়ে যাঁরা সব হোস্টেলে বা মেসে থাকতেন তাঁদের প্রত্যক্ষদর্শীর মত মিঃ চৌধুরী লিখেছেন, "উহা বেশ্যালয়ের শেষরাত্রি— যখন অপরিমিত মদ্যপানের আবেশে ও অবিরত সম্ভোগের অবসাদে বিস্রস্তবসন যুবক যুবতী বমির উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিত, আর বন্ধুদের পরদিন সকালে মেস হইতে আসিয়া বন্ধুকে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইত।"

চরিত্রের অবনতি এতদূর হয়েছিল যে, ভয়াবহ বন্যার পর বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবকেরা সাহায্য ভিক্ষা করলে আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া যেত না। তাই প্রকাশ্যে বেশ্যাদের নিয়ে তাদের রূপ ও গানের বিনিময়ে চাঁদা তোলার ব্যবস্থা হোত।

লেখক দেশি বিলেতি উভয় সভ্যতার সঙ্গেই পরিচিত। প্রায় সব দেশেই নারীর স্তন আচ্ছাদিত রাখা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে যুবতীদের স্তন আচ্ছাদিত রাখার চেতনার অভাব ছিল যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের লেখা দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন নীরদবাবু। তিনিও লিখেছেন, "নারীর দেহ সম্বন্ধে পুরাতন কদর্যতা কোথায় গেল? আমিও কিশোরী মাতাকে বিনা সঙ্কোচে আমার সম্মুখে স্তন্যপান করাইতে দেখিয়াছি।" [পৃ. ১২৮]

প্রত্যেকটা বিষয়ে বাঙালীর বাড়াবাড়ির নমুনা দিতে গিয়ে পন্ডিত শশধর চূড়ামণির ধর্মপ্রচারের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তিনি। খৃষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এবং হিন্দু ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি যে কৌশল নিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলনা, তা ছিল ভন্ডামি ও শঠতা। হিন্দু শ্রোতাদের বক্তা জিজ্ঞাসা করছেন, "খৃষ্টানের ভগবানের কি নাম আপনারা বলুন। শ্রোতারা চিৎকার করিত, GOD। তর্ক চূড়ামণি বলিতেন, 'উহা উল্টান'। শ্রোতারা বলিত DOG। শশধর বলিতেন, তবে! এইবার আমাদের ভগবানের নাম বলুন। পূর্বে শিক্ষাপ্রাপ্ত দু চারজন শ্রোতা বলিতেন,— 'নন্দনন্দন'। শশধর বলিতেন, আবার উল্টান্। কি হইল? চতুর্দিক কাঁপাইয়া ধ্বনি

উঠিত, 'নন্দনন্দন'। শশধর আবার বলিতেন, তবে! হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইয়া যাইত!" [পৃ. ১৫৮ দ্রষ্টব্য]

লেখক নিজে বাঙালী হয়েও বাঙালী জাতির উল্লেখযোগ্য নেতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিষয়েও লিখতে কুন্ঠিত হন নি, অথচ তিনি বঙ্কিমের একজন ভক্তও। বঙ্কিমের পাঁচ বছরের মেয়েকে বিয়ে করার তিনি একেবারেই বিপক্ষে—"তিনি এগার বৎসর বয়সে পাঁচ বৎসরের যে বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন সে যখন মারা যায় তখন তাহার বয়স পনের, বঙ্কিমের একুশ। এই বয়সে দাম্পত্য-জীবনে সহবাস না হইবার কথা নয়। বাঙালী জীবনের যে ধারা ছিল তাহাতে উহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইত। আঠারো বৎসরের স্বামী ও তেরো বৎসরের স্ত্রীর সন্তান হওয়ার সংবাদ আমিও জানি। কিন্তু বঙ্কিমের প্রথম বিবাহিত জীবনে কি প্রেমের অনুভূতিও ছিল? আমি এই কথা বলিব, প্রথম পত্নীর প্রতি তীব্র ভালবাসা জন্মিয়া থাকিলে বঙ্কিমচন্দ্র ছয় মাসের মধ্যেই আর একবার বিবাহ করিতে পারিতেন না।"

হয়ত লেখক সূক্ষ্মভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বিয়েও হোত বাচ্ছাও হোত সবই ঠিক, কিন্তু তখন দাম্পত্য জীবনে প্রেম ছিল না; ছিল শুধুই কাম।

বাঙালীদের অনেক সনাতন বা পুরাতন আলেখ্য অঙ্কনের পর তিনি বাঙালীর একাধিক গুণও লক্ষ্য করেছেন। হিন্দু বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির উৎস বিবর্তন, পার্থিব উন্নতি, চরিত্রহীনতা, অনাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার অনেক কথা আলোচনা করা হোল, প্রথম খন্ডেও আলোচনা করা হয়েছে। আমার লেখা 'চেপে রাখা ইতিহাসে' আরও নিবিড় তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

একটা প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে আনা যায়, সেকালে বঙ্গদেশে মুসলমান জ্ঞানী, গুণী, ধনী, বুদ্ধিজীবীরা কি মুহূর্তেই উবে গেলেন? উত্তরে বলা যায় যে, নতুন বুদ্ধিজীবীরা সেই সব সম্মানীয় মুসলমানদের নাম ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছেন বা চাপা দিয়েছেন সাম্প্রদায়িকতার কারণেই হোক বা ইংরেজের ইঙ্গিতে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা বই পত্রে কিছু খ্যাতনামা লেখক কিছু কিছু নাম যেগুলো কালির আঁচড়ে লিখে গেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, আগা কারবালাই মুহাম্মদ। যাঁকে ব্যবসাদারদের রাজকুমার বলা হোত। আর ছিলেন "নবাব হোসেন জঙ্গ বাহাদুর, নবাব জাফর জঙ্গ বাহাদুর, নবাব তলোয়ার জঙ্গ বাহাদুর, কাজী গুল মহম্মদ, মহবুব খান, মহম্মদ হোসেন, মহম্মদ আসকরী প্রভৃতি কলকাতার সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত খানদানী মুসলমান নাগরিকদের নামও পাওয়া যায়।" তাছাড়া ১৮২২ খৃষ্টাব্দে রাজা উপাধি পাওয়া রাধাকান্তদেবের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। তাতে প্রথম শ্রেণীতে

কলকাতার কোন মুসলমানের নাম রাখেননি তিনি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে মুন্সী সদরুদ্দিনের মত দু-একজনের নাম রেখেছিলেন মাত্র। [তথ্য ও উদ্ধৃতি : কলকাতার জ্ঞানচর্চা— ইতিহাস (প্রবন্ধ) নিশীথরঞ্জন রায়, পৃ. ১১-১২]

ইংরেজ সরকার কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে ইসলামী সংস্কৃতি ধ্বংসের যে চক্রান্ত করেছিল তাতে আরবী ফারসী উর্দু ভাষার কিছু পন্ডিতের প্রয়োজন হয়েছিল তাদের। "এদেশীয় জ্ঞানীগুণীদের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকরূপে এই কলেজকে গৌরবান্বিত করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে নাম করা যায় মৌলবী ইলাহদাদ, মৌঃ লুতফর রহমান বর্ধমানী, আব্দুল রহিম সফীপুরী, মৌলানা বিলায়ত হোসেন প্রমুখদের।"

কলকাতার উর্দু গদ্যের জনক হিসেবে মীর আম্মান এবং উর্দু কবিতার জনক হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন 'আব্দুল গফুর নাস্‌সাখ। এঁরা ফারসী রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন।' এছাড়া আরও উল্লেখযোগ্য মুসলিম পন্ডিতদের মধ্যে এ'তেশামউদ্দিন মির্জা, ফার্সি পুঁথি লেখক আব্দুর রহীম, জনাব বশিরুদ্দিন এবং আজিমুদ্দিন ছিলেন বিখ্যাত ফার্সি কবি। উবায়দী সোহরাবর্দীও ছিলেন বিখ্যাত লেখক। তাঁর ফার্সিতে লেখা 'তারিখ-ই-কলকাত্তা' একটি বিখ্যাত সংকলন। আব্দুর রহমান সঈদও ছিলেন উল্লেখযোগ্য। ফার্সি চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতার ইরান সোসাইটি। তাছাড়া আব্দুল লতিফ, মোজাম্মেল হক, ওহাবুদ্দিন ও সৈয়দ জালালুদ্দিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আরও যাঁরা স্মরণীয় থাকার উপযুক্ত তাঁরা হচ্ছেন রওশন আলি, শেইখ আহমাদ, মীর আলি আফসোস, মির্জা লুত্‌ফ আলি, ইকরাম আলি প্রমুখ।

[তথ্য ও উদ্ধৃতি : শহর কলকাতায় আরবী-ফার্সী-উর্দু-সংস্কৃত (প্রবন্ধ) : অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, দ্রষ্টব্য : শনিবারের চিঠি— প্রবন্ধ সংকলন, মাঘ ১৪০৩, পৃ. ২৩৩-৪২]

আর এক বেদ আয়ুর্বেদ

একথাও বলা হয়েছে যে, চলমান সংস্কৃতির ইতিহাস ঢেকে দিয়ে এটাই ইংরেজ সরকার প্রচার করেছে বা করিয়েছে যে সনাতন হিন্দুদের সব ছিল। আজ তার কিছুই নেই। সব নষ্ট করেছে ঐ মুসলমান জাতি। আর ইংরেজ সরকার দয়া করে তা উদ্ধার করে তুলে দিয়েছে তাদের হাতে।

এইরকম একটি বস্তু হোল আয়ুর্বেদ। তবে বেদই যদি না থাকে তাহলে আয়ুর্বেদ থাকে কি করে? এরও জন্ম উনবিংশ শতাব্দীতে।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্ বুকনান নামে একজন সাহেব মুসলমানদের চিকিৎসা বিজ্ঞান ঐতিহ্য চাপা দেবার জন্য বিলেতের হেড অফিসের আদেশে একটি বই লিখে ফেললেন The History , Antiquities, Topography and Statistics of Esatern India। ওতেই তিনি ভারতীয়দের জানিয়ে দিলেন যে, বহু প্রাচীন কাল থেকেই আয়ুর্বেদ চলে আসছে। অতএব তার দিকে আবার যেন ফিরে তাকায় ভারতীয় হিন্দুরা।

প্রচারিত হয়ে গেল উদ্ভট সব তথ্য। এসব মেডিকেল সায়েন্স নাকি পাওয়া গেছে চরক ও সুশ্রুত সংহিতা, বাগভট্ট সংহিতা ও অষ্টাঙ্গ হৃদয় প্রভৃতি গ্রন্থে।

প্লিনি সাহেব জানিয়ে দিলেন যে, ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে ভেষজ বিদেশে রপ্তানি হোত। তিনি আরও লিখে ফেললেন যে, রোমের বহু সোনা ভারতে চলে যাচ্ছে। কারণ তখন সোনার বিনিময়ে ভেষজ কিনতে হোত।

সরকারের ইঙ্গিতে ভারতের বাঙালী লেখকদের উদ্বুদ্ধ করা হোল যে, দেশীয় গাছপালা নিয়ে যে কবিরাজি চিকিৎসা ছিল তারই একটা লিষ্ট তৈরি করে সেটাকেই 'আয়ুর্বেদ' বলে চালাতে হবে। কালীপদ বিশ্বাস লিখে ফেললেন একটি গ্রন্থ, তিন খন্ডে। নাম দিলেন ভারতীয় বনৌষধি। আরও এগিয়ে এলেন বিজয়কালী ভট্টাচার্য, জীতেন্দ্র কুমার সরকার, শিবকালী ভট্টাচার্য ও তেজেন্দ্রকুমার সরকার। তাঁদের উপাধিই দেওয়া হয়েছিল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী। চন্দ্র দত্ত রচিত 'দ্রব্যগুণ' নামক একটি বইয়ে সংযোজিত হোল আরও গাছ গাছড়ার তথ্য। কিন্তু পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছিলেন ঐ সাহেবরাই। যেমন মিঃ ওয়াট্ বই লিখে ফেললেন, যেটা এনসাইক্লোপেডিয়ার মত। অথচ ওগুলো সব মুসলিম পন্ডিতদের আবিষ্কৃত, যেটা আমার লেখা 'পুস্তক সম্রাটে' আলোচনা করেছি।

কালীপদ বিশ্বাস বিজ্ঞান পড়তে গেলেন বিলেতের এডিনবরায়, পান্ডিত্য অর্জন করলেন এবং ডিগ্রিও পেলেন বেশ লম্বা চওড়া— এম. এ., ডি. এস-সি., এফ. এল. এ., এফ.

আর. এস. ই.। সেখান থেকে ঘুরিয়ে এনে তাঁকে করে দেওয়া হোল বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিনটেনডেন্ট। আরও উপরে তুলতে এবং এই যজ্ঞটি পূর্ণ করতে তাঁকে করে দেওয়া হোল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অনারারী অধ্যাপক। এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ছেপে 'ভারতীয় বনৌষধি' ১৯৩৬-এ প্রকাশ করা হোল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হোল বৃটিশ ভারতের শ্রেষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয়। তাতে যেসব বিখ্যাত বাঙালী জড়িয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জি এবং তাঁর পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। প্রচারের ঠেলায় মানুষ জেনে গেল .. দও ছিল, আয়ুর্বেদও ছিল। ১৯৪৫-এর ১০ই জুলাই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ভূমিকা সম্বলিত দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হোল। বই শুরু হওয়ার আগে পূর্বভাষে যা জানানো হয়েছে তার সারমর্ম হচ্ছে : অথর্ব বেদ থেকে এই আয়ুর্বেদের জন্ম আর তার স্রষ্টা ধন্বন্তরি। তারপর মহর্ষি বিশ্বামিত্র, মহর্ষি সুশ্রুত, চরক প্রভৃতি কাল্পনিক পন্ডিতদের কথা লিখলেও লেখা শুরু হয়েছে 'কথিত আছে' বলে। আরও আছে অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা, চক্রদত্ত সংগ্রহ, শার্ঙ্গধর সংগ্রহ, ভাবমিশ্রের ভাব প্রকাশ, মদন পালের রাজ নিঘন্টু, মাধব করের নিদান ইত্যাদি পুস্তক ও লেখকের নাম। কিন্তু যে ইতিহাস চাপা দেওয়া হয়েছে সেই মুসলমানদের ইতিহাস একেবারে হজম করতে না পেরে সামান্য মাত্র উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছেন যে, "মুসলমান রাজত্বকালেও রাজকীয় সাহায্যে মুসলমান হাকিমগণ, আরবী, পারসী ও উর্দ্দু ভাষায় এদেশীয় ভেষজ সম্বন্ধে কয়েকখানি অমূল্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তালিপ শেরিফ (Taleep Sheriff) এবং মখেজন-উল-আদিয়া (Makhazan-ul-Adwiya) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।" [দ্রষ্টব্য : ঐ পূর্বভাষ, প্রথম পৃষ্ঠা]

১৮১০ খৃষ্টাব্দে ডাঃ জন ফ্লেমিং ভারতীয় গাছ গাছড়ার নামগুলোর সংস্কৃত নাম সৃষ্টি করে বা করিয়ে এশিয়াটিক রিসার্চ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত একটি বই লিখে ফেললেন তার নাম দিলেন 'হিন্দু মেটিরিয়া মেডিকা'। ঠাকুরবাড়ির আত্মীয় মেজর বি. ডি. বসু লিখে ফেললেন 'ইন্ডিয়ান মেডিসিনাল প্লান্টস'।

হাওড়ার বোটানিকাল গার্ডেনের সুপার হলেন সাহেব ডাঃ ডেভিড্ প্রেইন। তাঁর ডিগ্রি বিরাট লম্বা M.G.C.I.E., M.A., I. M. S., D. Sc., LL. D., F.R.S., F.R.S.E., F.L.S.। ইনি ডাঃ কালীপদ বিশ্বাসকে দিয়ে এই 'ভারতীয় বনৌষধি' লেখাতে সমস্ত দিগদর্শন করে দিলেন। আস্তে আস্তে সারা ভারতে প্রচারিত হয়ে গেল আয়ুর্বেদের বিরাট বেলুন। অবশ্য ডেভিড প্রেইন সরকারের কাছ থেকে যা পাবার তো পেয়েই ছিলেন, সেই সঙ্গে পেয়েছিলেন 'স্যার' উপাধি। এ ছ'খন্ডের বিরাট গ্রন্থটিতে ভারতীয় বৃক্ষ, লতাপাতার ছবিসহ গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

যেমন বাবলা। প্রথমে ইংরেজী নাম দেওয়া আছে। তারপরেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে সংস্কৃত নামের। তারপর বাংলা, হিন্দি, আরবী, ফার্সি, সাঁওতালি প্রভৃতি মোট ২০ টি ভাষায় তার নাম দেওয়া আছে। তারপর দেওয়া আছে সংস্কৃত একটি শ্লোক। যেমন সংস্কৃততে বাবলাকে বর্বুর বলা হয়েছে। তাই পাঁচ লাইনের সংস্কৃত এক শ্লোক তৈরি করে ভুতুড়ে কান্ড ঘটানো হয়েছে। যেমন : 'বর্বুরো যুগলাক্ষশ্চ কণ্ঠালুস্তীক্ষ্ণকন্টক: ... কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে তাও উল্লেখ করা হয়েছে : 'রাজনিঘন্টু : শাল্মল্যাদিবর্গ:' [দ্রঃ ঐ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩০২] এবার যেকোন পাঠক যখন বইটি দেখবেন বা পড়বেন এবং স্বদেশী বিদেশী আধ হাত এক হাতবড় বড় ডিগ্রিধারী পন্ডিতদের নামাঙ্কিত কীর্তিতে অন্ততঃ এটা বুঝতে অসুবিধা হবেনা যে আর্য, বেদ, আয়ুর্বেদ সংস্কৃত সে সব বিরাট জিনিস! সে সব ভাঙিয়ে ইংরেজরা দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরও পরিবেশন করেছেন ঐ অমৃতভান্ড।

গীতবাদ্য ঘরানা

গান বাজনার বিষয়ে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বলে নিতে হয় যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই বিষয়ে দুটি অংশ দেখা যায়। যাঁরা কোরআন হাদীস শরীয়তের বেশি অনুসারী তাঁদের মতে গান বাদ্য আদৌ শুভকর্ম নয়। অবশিষ্ট সাধারণ মুসলিমরা অনেকে এটাকে বর্জন করতে পারেন নি।

তানসেন

অবিভক্ত ভারতবর্ষে আধুনিক গীতবাদ্যের যে রমরমা বাজার ছিল তার জন্ম হয়েছে মুসলমানদের হাতে। অর্থাৎ প্রাচীন যুগ থেকেই প্রত্যেক দেশেই চিত্তবিনোদনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গান, বাজনা, নাচ, নেশার বস্তু খাওয়া বা পান করার প্রচলন ছিল। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে গান, বাজনা, সুরা, নারী, বিলাসিতা অপব্যয় এবং অমিতব্যয়িতা সবগুলোই যেন একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ব্যতিক্রম সব ক্ষেত্রেই স্বীকার্য। আমি নিজে এসব বিষয়ে আদার ব্যাপারী। তবু স্মরণ রাখতে হচ্ছে যে, এটা ইতিহাস; শরীয়তের আদেশ নিষেধ প্রতিষ্ঠা করার স্থান এটা নয়।

হাফিজ আলি খাঁ

এই নতুন শতাব্দীর সঙ্গীত জগতের দিকে দৃষ্টি দিলে এটাই মনে হবে যে সারা ভারত জুড়ে সঙ্গীত বিশেষজ্ঞমণ্ডলী সবাই যেন হিন্দু; তাতে আঙুলে গোণা কতিপয় মুসলমানও স্থান করে নিয়েছেন। ঐতিহাসিক সত্য কিন্তু এটা নয়। সত্য তথ্য হোল এই, এই বিভাগটি প্রায় পুরোপুরি মুসলমান খাঁন বা খাঁ-গোষ্ঠীর দ্বারাতেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছিল। সরকারি

বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক ক্রুর ষড়যন্ত্রে তাঁদের কাছ থেকেই এই বিদ্যা হাসিল বা রপ্ত করে তাঁরা হয়ে পড়লেন 'হিরো'। ষড়যন্ত্রের তাপে ক্ষয়িষ্ণু বরফ খণ্ডের মতো মুসলমানেরা হয়ে গেছেন প্রায় জিরো।

এনায়েত খাঁ

ভারতীয় সঙ্গীতের চারটি বিভাগ আছে। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরি। ষড়যন্ত্রকারীরা আন্তর্জাতিক ইঙ্গিতের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন কথা আমদানি করলেন যে, ধ্রুপদ বিভাগটি নাকি আর্য ঋষিদের সৃষ্টি। বাকী তিনটি অবশ্য মুসলমানদের সৃষ্টি, তবে ধ্রুপদকে ভিত্তি করে খাঁ সাহেবরা তাকে আরও পূর্ণতা দিয়েছেন।

গায়কদের ইতিহাস খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, প্রাচীন গায়কেরা প্রায় সকলেই ছিলেন মুসলমান। যেমন মহম্মদ গওস, তানসেন খাঁ, বোঁধি খাঁ, সুরজ খাঁ, চাঁদ খাঁ, শোভন খাঁ, খুশাল খাঁ, আমীর খুসরু, গোলাম নবী, মাওলা দাদ, শোরী ইলিয়াস সাহেব প্রভৃতি। এঁদের কথা ছেড়ে দিয়ে এরপরের প্রজন্মে যাঁরা সঙ্গীত জগতে সুনাম ও গৌরব রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা হলেন : আলা বন্দে খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, হাফিজ আলি খাঁ, আব্দুল করিম খাঁ, নাসিরুদ্দিন খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ প্রভৃতি।

বিলায়েত খাঁ

সঙ্গীতে রাগ-রাগিনীর মূল্য অসীম। সেগুলো নানা নামে পরিচিত। যেমন বাহার, দরবারী, তোড়ী, দরবারী কানাড়া, হোসেনী কানাড়া, মিঞা সারঙ্গ, মিঞা মল্লার, জয়জয়ন্তী, আড়ানা প্রভৃতি। এগুলো সব মুসলমান শিল্পীদের সৃষ্টি।

ভারতের প্রখ্যাত পণ্ডিত, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'ভাষাচার্য' উপাধিপ্রাপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "সঙ্গীতকার তানসেনের নাম ভারতবর্ষে সকলেই জানে। কিন্তু তানসেন কেবল যে একজন যুগাবতার, সঙ্গীত রচয়িতা ও গায়ক ছিলেন

বড়ে গোলাম আলি খাঁ

উস্তাদ আবদুল করিম খাঁ

ফৈয়াজ খাঁ

বেগম আখতার

তাহা নহে তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর কবিও ছিলেন, ইহা তাঁহার রচিত ধ্রুপদ গানের 'বাণী' বা কথা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বোধহয় তানসেন ১৫২০ খৃষ্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আকবরের দরবারে লিখিত ফার্সী ইতিহাস অনুসারে তাঁহার মৃত্যুকাল ৯৯৭ হিজরী অর্থাৎ ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ। আকবরের দরবারে ঐতিহাসিক আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে আকবরের বেতনভোগী ছত্রিশ জন দরবারী গায়ক ও বাদকদের নাম দিয়াছেন— তন্মধ্যে তানসেনের নাম সর্বপ্রথমে আছে, এবং তানসেন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আবুল ফজল মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহার ন্যায় গায়ক বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে হয় নাই।"

রবিশঙ্কর, আলাউদ্দীন ও আলি আকবর

"পরে তিনি গোয়ালিয়রের সুফী সাধক মহম্মদ ঘৌসের শিষ্য হন। এই সুফী সাধক একজন খুব বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। তিনি বাবর হুমায়ুন ও আকবরের সমকালীন ছিলেন এবং লোকে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত।"

"কথিত আছে যে মহম্মদ ঘৌস নিজের জিভ তানসেনের জিভে ঠেকান। তাহাতেই তানসেনের অসাধারণ সঙ্গীত শক্তির উন্মেষ হয়।"

'তানসেনের গোষ্ঠীর— তাঁহার ভাই সুব্হান খাঁ এবং বীরমণ্ডল খাঁ, প্রবীণ খাঁ,

কাজী নজরুল ইসলাম

সুর সম্রাট আব্বাসউদ্দিন

কবি গোলাম মুস্তাফা

পদ্মভূষণ উস্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁ

চাঁদ খাঁ প্রভৃতির নাম'-এর উল্লেখ সুনীতিবাবু তাঁর বই এর মধ্যে করেছেন। তাছাড়া আরও তিনি উল্লেখ করেছেন, "এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালা অক্ষরে 'ধ্রুপদ ভজনাবলী' নামে কলিকাতা হইতে কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত, অধুনা দুষ্প্রাপ্য ক্ষুদ্র একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিতে হয়। রঙ্গপুরের উকিল রামলাল মৈত্র মহাশয় নিজ সঙ্গীত শিক্ষক শিবনারায়ণ মিশ্রের নিকট বহু ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেন। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের উৎসাহে এইরূপ ৩৭১ খানি ধ্রুপদ গানের বাণী তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে ১৮০ টির অধিক গান তানসেনের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে।"

রবিশঙ্কর ও আলি আকবর

রবিশঙ্কর, কমলা দেবী এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব

"খ্রীষ্টীয় ১৮৪৩ সালে কলিকাতায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত (দ্বিতীয় সংস্করণ, লালগোলার রাজা বাহাদুরের ব্যয়ে ১৯১৪-১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত) কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেবের বিরাট সঙ্গীত সংগ্রহ 'সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম' গ্রন্থে তানসেনের ভণিতা দেওয়া বহু বহু পদ আছে। খ্রীষ্টীয় ১৮৫৫ সালে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'গীতসূত্রসার' পুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালায় হিন্দিতে মারাঠীতে ও অন্য ভাষায় ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে যত পুস্তক বাহির হইয়াছে সেগুলিতেও তানসেনের পদ আছে। ... উত্তর ভারতের কলাবন্ত সঙ্গীতের যে কোনও বইয়ে তানসেনের গান দুই-দশটি থাকিবেই।"

রবিশঙ্করের শাশুড়ি মদিনা বেগম

"স্যর জ্যরজ্ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন ১৮৮৯ সালে Modern Vernecular Literature of Hindustan নামে যে অতি উপযোগী পুস্তক প্রকাশ করেন তাহাতেও তিনি 'শিবসিংহসরোজ' হইতে তানসেনের জীবনীকথা উদ্ধার করিয়াছেন।".

[দ্রষ্টব্য : ভারত সংস্কৃতি : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় , ১৯৬৪, পৃ. ১৪৩-১৫২]

বহু বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীর মধ্যে যাঁরা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কালু খাঁ, কালে খাঁ, মহম্মদ আলি খাঁ, উজির খাঁ, জাফরুদ্দিন, বন্দে আলী খাঁ, উমরাও খাঁ, রজর আলী, মুরার আলী, আলাউদ্দিন খাঁ, ফিদা হুসেন খাঁ, বাহাদুর খাঁ, আফতাবুদ্দিন খাঁ, মইজুদ্দিন খাঁ, আল্লাদিয়া খাঁ, আহমাদ জান, হাফিজ আলি খাঁ, কেরামতুল্লাহ খাঁ, আব্দুল হালিম, জাফর খাঁ, বড়ে গুলাম আলি খাঁ, বেগম

রবিশঙ্কর ও আলাউদ্দিন কন্যা অন্নপূর্ণা (রওশন আরা)

আখতার, মুনাওয়ার আলি খাঁ, নিসার হুসেন খাঁ, মসীদ খাঁ, উস্তাদ ওয়াজীর খাঁ, উস্তাদ রজব আলি খাঁ, পদ্মভূষণ উস্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁ, এনায়েত খাঁ, বেলায়েত খাঁ, রশীদ খাঁ, মহম্মদ রফি খাঁ, কবি নজরুল ইসলাম, কবি গোলাম মোস্তাফা, আব্বাসউদ্দিন প্রভৃতি আরো অনেকে উল্লেখযোগ্য। [তথ্য : দেশ পত্রিকা, ৯ই আগস্ট, ১৯৯৭]

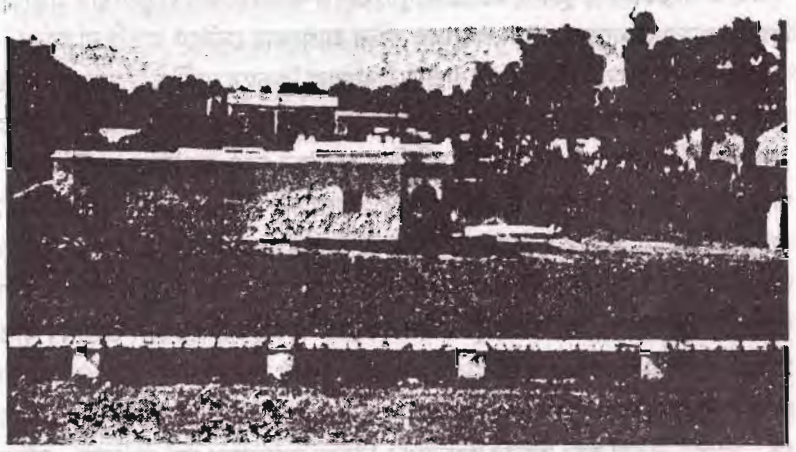

রবিশঙ্করের শ্বশুরবাড়ি

এখন বর্তমান শিল্পী যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে মুসলমান এক শতাংশও হবে না হয়তো। ইংরেজের ইঙ্গিতে জমিদার অর্থাৎ যাঁদের 'রাজা' 'মহারাজা' বলা হোত তাঁদের মাধ্যমে অভাবগ্রস্ত অর্থাৎ অর্থনৈতিক পঙ্গু মুসলিম শিল্পীদের নিকট থেকে পুরোপুরি সংগীত বা বাদ্যশিল্প শিখে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বেশিরভাগ নতুন শিল্পীরা। আর আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন পুরনো সব শিল্পী ও তাঁদের অবদান। এই সব নতুন শিল্পীদের সম্বন্ধে সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন , "শিল্পীদের আকাশছোঁয়া দক্ষিণা, বিলাসবহুল ফ্লাট, গাড়ী আর জাঁকালো পোষাকের আড়ম্বর, তাঁদের নারী বিলাস ও যাপনের মিথ, তাঁদের আন্তর্জাতিক কনসার্ট ও অবিশ্বাস্য সংখ্যক ক্যাসেট বিক্রির রেকর্ড এখন বিনোদন পত্রিকার রোচক প্রসঙ্গ। সুরকার ও গীতকারদের অর্থকৌলিন্যও উল্লেখ্য।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ১০৬]

যাঁরা এই যুগে বাজার মাতিয়েছেন তাঁদের মধ্যে একনম্বরে আছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিপ্রাপ্ত রবিশঙ্কর। সুধীরবাবু যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেন হেমন্ত, মান্না দে, শ্যামল, ভূপেন হাজারিকা, সন্ধ্যা, গীতা দত্ত, আরতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। তাছাড়া অনুপম ঘটক, রবীন চট্টোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, সুধীন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ঘোষ, গৌরীপ্রসন্ন, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া আরো যাঁরা প্রতিষ্ঠিত তাঁরা হলেন ধনঞ্জয়, মানবেন্দ্র, কিশোর কুমার, আলপনা, প্রতিমা, সুপ্রভা, উৎপলা সেন, সবিতা, শচীন দেববর্মন, অনিল বিশ্বাস, কুমার শানু, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মুকেশ, মহেন্দ্র কাপুর, উদিত নারায়ণ, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি প্রভৃতি। এছাড়া আরো অনেকে রয়েছেন, কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সেদিকে বাড়ছি না আর।

জমিদারবাবুরা বা তথাপ্রচারিত রাজা মহারাজারা কিভাবে মুসলিম উস্তাদদের কাছে সঙ্গীত বিদ্যা রপ্ত করেছেন, ইতিহাস দেখলে তা অনুভব করা যাবে। এই শতাব্দীর প্রখ্যাত শিল্পী রবিশংকর কেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সেও এক বিস্ময়কর ইতিহাস। তাঁর অধ্যাবসায়, প্রখর অনুসন্ধিৎসা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু বিখ্যাত শিল্পী আলাউদ্দিন খাঁর কাছ হতে তাঁদের বংশগত অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানকে আহরণ করার জন্য সেবা করেছেন তাঁর। এটাও ছাত্র হিসাবে তিনি প্রশংসার পাওনাদার। তারপর যেটা করেছেন সেটা হোল, তিনি তাঁর মুসলমান হওয়ার সংকল্প জানিয়ে দেন তাঁদের। ধুতি সরিয়ে পরে নেন পাজামা। শুধু কি তাই? আরও একাত্ম হওয়ার জন্য রেখে ফেলেছেন দাড়ি। শিখদের মতো সুন্দর চাপদাড়ি হলে বোঝা যেত ওটা স্টাইল, কিন্তু তা মনে হয় না। খাওয়া দাওয়া আর আচার আচরণের বিষয়ে আলোচনা বাদ রাখলাম। দরিদ্র আলাউদ্দিনের কৃশদেহী কিশোরী কন্যার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করলেন তিনি। তারপর দিলেন শুভ (?) বিবাহের প্রস্তাব। উস্তাদ আলাউদ্দিন ভেবে দেখলেন, হলেই বা তাঁরা খানদানী মুসলিম, রবিশংকরের আর মুসলমান হতে বাকীই বা কি আছে? তিনি রাজী হবেন কি না এই ভেবে তাঁর পুত্র আলি আকবরের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব করে ফেললেন রবিশংকর। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তাঁর নানা অঙ্গে চুম্বন করতেন তিনি। রবিশংকর তাঁদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে তাঁর কন্যার রওশনারা নামটি পরিবর্তন করে শুধু যদি অন্নপূর্ণা রাখা হয় তাহলে তাঁর হিন্দু আত্মীয় আত্মীয়ারা সকলেই তাঁকে বরণ করে নেবেন। উস্তাদ আলাউদ্দিন, তাঁর স্ত্রী মদিনা বেগম ও তাঁদের পুত্র আলি আকবর অনেক টানাপোড়েনের মধ্যে তাও মেনে নিলেন। বিয়ে হয়ে গেল। অন্নপূর্ণার সন্তানও ভূমিষ্ঠ হোল। কিন্তু অন্নপূর্ণা জানতে পারলেন তাঁর বাবা মা ও ভাইয়ের অঙ্কে ভুল হয়ে গেছে।

উচ্ছ্বাসপ্রবণ রবিশংকর তখন বিখ্যাত শিল্পী। কমলার সঙ্গেও তাঁর প্রেম চলতে লাগলো। কমলারও বিয়ে হোল। তিনিও সন্তানের মা হলেন। এদিকে অন্নপূর্ণা শুধু

কাঁদতেই লাগলেন। তিনিও ছিলেন বাদ্যশিল্পী। বাদ্যযন্ত্র নিয়ে শুধু কান্নার সুর তুলতেন। তাঁর ঐ সুরের ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হতেন তাঁর মা-বাবা দুজনেই। আর প্রায়শ্চিত্ত করতেন অশ্রুভরা চোখ নিয়ে।

অন্নপূর্ণা গম্ভীর ও পাথর হয়ে গেলেন যেন। কমলা এবার যখন বিধবা হলেন তখন রবিশংকর স্পষ্ট করে তাঁকে স্ত্রী বানিয়ে নিলেন। অন্নপূর্ণার গর্ভজাত সন্তান শুভেন্দুও হয়েছিলেন বিখ্যাত শিল্পী, সমাদৃত হয়েছিলেন আমেরিকায়। যে কোন কারণেই হোক, ক্ষোভে দুঃখে বেদনায় আর ফিরে আসেন নি তিনি— মারাও গেলেন সেখানে।

এখন বিশ্বজুড়ে সুনামপ্রাপ্ত রবিশংকরকে দেখলে মানুষ চিন্তা করতে বাধ্য হবে, কোথায় গেল তাঁর দাড়ি, কোথায় গেলেন তাঁর মুসলমান শ্বশুর, শাশুড়ি ও শ্যালক, কেমনভাবে তিনি নতুন জীবনে সাঁতার কাটছেন আনন্দ ফূর্তি আর স্বাচ্ছন্দ্যের সাগরে।

ছবি ঃ রবীন্দ্র-নজরুল চরিত এবং 'দেশ' -এর সৌজন্যে

হরপ্রসাদের কর্মকান্ড

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এমন এক বিশাল ব্যক্তিত্ব যে, শুধু তাঁকে নিয়েই লেখা যায় একটি সুবিশাল গ্রন্থ। আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু জীবনী লেখা নয়। আমাদের দেশে যাঁকে বড় চোখে দেখা হয় বা দেখানো হয়, তাঁর শুধু আলোদিক বা ভালোদিকটাই সাধারণতঃ তুলে ধরা হয় মানুষের সামনে; আর তাঁর জীবনের কালো দিকটা বেমালুম চেপে যাওয়া হয়।

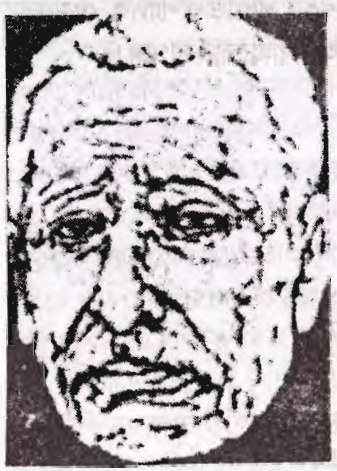

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আমরা মনে করি দেশবরেণ্য কোন সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক বা রাজনীতিবিদের প্রশংসাপূর্ণ ইতিহাস লেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের অন্ধকার বা কালো দিকটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রশ্ন উঠতেই পারে— কী লাভ আছে তাতে ? এতে না আছে দেশের কল্যাণ, না আছে সেই ব্যক্তির কোন কল্যাণ! .

কিন্তু আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক মানুষের দোষ গুণ দুটোই থাকবে। আমরা সাধারণ মানুষ হয়তো বা কেউ মদ্যপান, ব্যভিচার, স্বেচ্ছাচারিতা, চৌর্যবৃত্তি, শঠতা প্রভৃতি কুকর্মে জড়িয়ে পড়ি কোন কারণে। সেইসময় বিবেকের তাড়নায় জর্জরিত হয়ে হতাশ হয়ে ভেঙে পড়তে হয় আমাদের। তখন যদি ইতিহাসের ঐসব কথা মনে পড়ে, যে অমুক বিখ্যাত ব্যক্তির তো এই এই দোষ ছিল, তবুও তো তিনি হতে পেরেছিলেন এতবড় খ্যাতিমান ব্যক্তি ! সুতরাং আমার ক্ষেত্রেও উপায় আছে। এই পাথেয় নিয়ে উন্নতির পথে চলা তখন আবার সম্ভব হয়ে ওঠে সহজে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে এক বিরাট পণ্ডিত, মৌলিক জ্ঞান, বিদ্যা, অভিজ্ঞতায় যে ছিলেন সমৃদ্ধ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই কারও। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "বাংলা সাহিত্যে এতদিন ধরিয়া আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা সমগ্রভাবে দেখিবার শক্তি আপনার মতো কয়জনের আছে? সেদিনকার সভায় উদার ভাষায় আমার সম্বন্ধে আপনি যে দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি ধন্য হইয়াছি।" [দ্রষ্টব্য : হরপ্রসাদ রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১১]

প্রদীপের নিচে অন্ধকারের অবস্থিতি যেমন নির্ঘাত সত্য, তেমনি হরপ্রসাদের বৃটিশের কাছ হতে পাওয়া উপাধি, প্রশংসাপত্র প্রভৃতি তাঁর ইতিহাসের কালোদিক প্রমাণ না করে পারে না। সুতরাং তিনি শুধু হরপ্রসাদ ছিলেন না, তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্যার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম. এ., সি. আই. ই., এফ. এ. এস. বি. মহাশয়।

বংশগতভাবে তিনি বা তাঁরা ছিলেন বৃটিশের অনুগত। শৈশবে তাঁর নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য। পরে তা পরিবর্তিত হয়ে তিনি হয়েছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁর পিতা রামকমল বা কমললোচনবাবুও ছিলেন 'ন্যায়রত্ন' উপাধিধারী। হরপ্রসাদের দাদা নন্দকুমার পেয়েছিলেন 'ন্যায়চুঞ্চু' উপাধি। তাঁর মাতামহ রামমাণিক্যও ছিলেন 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধিপ্রাপ্ত। তাঁর শ্বশুর ছিলেন কাটোয়ার দেয়াসিন গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; তিনিও পেয়েছিলেন বৃটিশের দেওয়া 'রায়বাহাদুর' উপাধি। ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ নেই আর।

ইংরেজ জাতি কাকে কী দিয়ে কেমনভাবে কাজে লাগানো যায়, তা আঁচ করতে পারতো। সেইভাবেই বাছাই করা হয়েছিল হরপ্রসাদকেও। প্রচণ্ড স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ হতেই সেই বাজারে আকর্ষণীয় অঙ্কের বৃত্তি পেতেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রাবস্থায় তাঁর আট টাকা বৃত্তিকে করে দেওয়া হয় পঞ্চাশ টাকা। বি. এ. পাস করার পর আরও পঁচিশ টাকা বৃদ্ধি করা হয় পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য। বৃটিশ সহযোগী স্যার রাজেন্দ্রলালের সুনজর পড়লো তাঁর উপর। ১৮৭৮-তে ট্রান্সলেশন মাস্টারের' পদ পান তিনি। ১৮৮০-তে হন পৌরসভার কমিশনার। পরে উন্নীত হন ভাইস চেয়ারম্যান থেকে চেয়ারম্যান পদে। ১৮৮৪-তে হন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর পূর্ব আলোচিত এশিয়াটিক সোসাইটির বিরাট দায়িত্ব চেপে যায় তাঁর উপর। তিনি ছিলেন সোসাইটির আজীবন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং শেষে নির্বাচিত হয়েছিলেন সোসাইটির ফেলো।

১৮৮৮-তে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও ফেলো নির্বাচিত হন। ১৮৯২-এ এশিয়াটিক সোসাইটিতে জয়েন্ট ফিলোলজিক্যাল সেক্রেটারি নির্বাচিত হন এবং 'বিবলিওথেকা ইন্ডিকা' গ্রন্থমালার সংস্কৃত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক হন তিনি।

বৃটিশকে খুশি করতে পেরেছিলেন বলেই বিলেতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে ডাকা হয়েছিল। তাঁর যাবার ইচ্ছাও হয়েছিল খুব। কিন্তু ঐসময় হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা করা মহাপাপ বলে বিবেচিত হোত। তা সত্ত্বেও তিনি একটি লাইন বার করেছিলেন যে, সন্ন্যাসী হয়ে বিলেত গেলে সেটা দোষের নয়। সেজন্য তিনি বলেছিলেন, "সন্ন্যাসীর তো জাতের ভয় নাই। যাইলে সন্ন্যাস লইলেই হইল।" তবে তাঁর মরণের ভয়ও ছিল খুব। তাই বলেছিলেন যে, "রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি যাঁহারা অধিক বয়সে বিলাতে

গিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই আর দেশে ফিরিতে পারেন নাই, সেইখানেই দেহ রাখিয়াছিলেন। বৃদ্ধবয়সে এই বিপদ আছে।" শেষপর্যন্ত তাঁর আর বিলেত যাওয়া হয়নি।

ইংরেজ সরকারের 'কলকাতা-কর্মকাণ্ডে' যাঁরা যুক্ত ছিলেন, সেই সমস্ত মনীষীদের তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। যেমন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল, গঙ্গানাথ ঝা, গণপ্রসাদ শাস্ত্রী, বামাচরণ বিদ্যাবাগীশ, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শিবনাথ শাস্ত্রী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রমুখ। এঁদের মধ্যে পরস্পরে যোগাযোগ ছিল যথেষ্ট। হরপ্রসাদের সঙ্গে আরও যাঁদের কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক যোগাযোগ ছিল, তাঁরা হচ্ছেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, অধরলাল সেন, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, জগদীন্দ্রনাথ রায়, রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ।

বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ও করাতে হরপ্রসাদ যা লিখে গেছেন ও বলে গেছেন, তা নিরপেক্ষ ও বিপক্ষ দলের পাঠক সহজে ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায় না।

ইংরেজের রাজত্বের প্রশংসা করে বলেছেন, "যুদ্ধের লেশমাত্রও নাই, জমিদারের অত্যাচার নাই, কুসংস্কারাপন্ন গুরুপুরোহিতের প্রাধান্য নাই, স্বাধীন চিন্তায় ব্যাঘাত দেয় এমন কিছুই নাই। স্বাধীন দেশের দেশশাসন, শান্তিরক্ষা, বিচারকার্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকায় কত কত মহা প্রতিভাশালী লোকের প্রতিভা বিকাশ হইতে পারে না। বাঙালী অদৃষ্টে এ সকল কার্যের জন্য ইংরেজ আছেন। বাঙালী ইচ্ছা করিলে নির্বিবাদে, নিরাপদে দেশের সমাজের ও সাহিত্যের উন্নতিতে সমস্ত মানসিক শক্তি ব্যয় করিতে পারে।" [হরপ্রসাদ রচনাসংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১০]

"তাঁর (হরপ্রসাদের) অভিমত, ইংরেজের রাজত্বে বাঙালী নির্বিবাদে দেশ, সমাজ ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন করতে পারে। পরিবর্তন-সময় এবং রেনেসাঁসের বিষয়ে অবগত হয়েও পরাধীনতার মর্মবেদনা তাঁকে স্পর্শ করেনি।" [হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যকর্ম : অধ্যাপিকা শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার, ঢাকা, পৃ. ২৭৩, ছাপা ১৩৯৯]

ভারতের বিপ্লবীদের ইংরেজিতে বলা হোত মিউটিনিয়ার। আর ইংরেজিতে বিপ্লব বা বিদ্রোহ হোল mutiny। এই বিপ্লব বা বিদ্রোহ সম্পর্কে তিনি যা মন্তব্য করেছেন অনেকের মতে তা অনুচিত ও কুৎসিত : "হরপ্রসাদ 'মিউটিনি' ও 'মিউটিনীয়ার'— এই দুটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন; এবং এঁদের সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য জানা না গেলেও তিনি মিউটিনিকে 'উৎপাত' বলে বর্ণনা করেছেন।"

ইংরেজকে তুষ্ট করতে অর্থাৎ নিজের স্বার্থের পরিপুষ্টিতে অসত্য ও মিথ্যার আশ্রয় নিতে যেমন স্তাবকদের আটকায় না, হরপ্রসাদ যে সে দলের বাইরে তা প্রমাণ করা কঠিন। তাই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শ্রী রসিকলাল রায় মন্তব্য করেছেন— "শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, 'লর্ড ক্লাইবেও বাঙ্গালা জানিতেন, বাঙ্গালায় কথা কহিতেন'। এটি তাঁহার প্রত্নতত্ত্ব গবেষণার একটি নূতন আবিষ্কার। আমরা উত্তরবঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতদিগের হস্তে একথার বিচারভার সমর্পণ করিতেছি। তিনি আরও লিখিয়াছেন, 'আজিও আপনারা দেখিলেন তিনি (বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল) বাঙ্গালা ভাষাতেই সাহিত্য সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন।' আমাদের কর্ণে যাহা ইংরেজি বলিয়া বোধ হইল, বঙ্গভাষানুরাগী, সাহিত্যসেবী শাস্ত্রী মহাশয়ের কর্ণে তাহাই বাঙ্গালার আকার ধারণ করিল,— ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই।" [দ্রষ্টব্য : রসিকলাল রায় : 'সাহিত্য সম্মেলনে', ভারতবর্ষ পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৩২১, পৃ. ৯০১-২]

হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে প্রচারিত নেতার নাম ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। কিন্তু তারও পূর্বে মুসলিম বিরোধিতায় উৎকট সাম্প্রদায়িক একটি দল তৈরি হয়েছিল ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে, হরপ্রসাদের নেতৃত্বে। সেই দলটির নাম 'অখিল ভারত হিন্দুসভা'।

ঐ হিন্দুসভার সভাপতির ভাষণে তিনি ইংরেজ সরকারের পক্ষে যা বলেছিলেন, তা নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন কোন বিপ্লবীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। তিনি বলেছিলেন, "রাজা বিদেশী, তাঁহারা অনেক সময় না বুঝিয়া আমাদেরই হিত হইবে মনে করিয়া আমাদেরই ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা তো ভাল, প্রতিবাদ করিলে বিচার করেন। অন্ততঃ তাঁহাদের সাধু ইচ্ছার অভাব আছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণই নাই।" [দ্রষ্টব্য : ভারত হিন্দুসভায় প্রদত্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষণ, ১৯২৩]

ইংরেজ সরকারের তাবেদারি করতে যে পুঁথিযজ্ঞ শুরু হয়েছিল, তার প্রধান ভারতীয় নেতা ছিলেন হরপ্রসাদ স্বয়ং। বৃটিশ তাঁকে প্রাপ্য সম্মান দিতে চেষ্টা করতেন তাঁর এক বিশেষ গুণের জন্য। সেটা হোল, তিনি নানান উদ্ভট বিষয় কল্পনা করতেন, সেই কল্পনা থেকে গল্প তৈরি করে সেই গল্পকে চালাতে পারতেন ইতিহাস বলে।

"হরপ্রসাদ ইতিহাসকে গল্পের মত চিত্তাকর্ষক করিতে পারিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কল্পনা, গল্পকেও ইতিহাসে পরিণত করিতে কুণ্ঠিত হইত না।" [দ্রষ্টব্য : 'স্মৃতিচারণে সুশীলকুমার দে 'স্মারকগ্রন্থ', পৃ. ২২২]

ইংরেজরা যেটা চেয়েছিল সেটা হচ্ছে কাল্পনিক এক পরমতম হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি তৈরি করে তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া যে ইসলাম ধর্মের দিকে আকর্ষিতনা হয়ে তাঁরা যেন তাঁদের সনাতন ধর্মে আস্থা স্থাপন করেন। ঐ পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে হরপ্রসাদের

মতো এক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি জাতভেদের বিরুদ্ধে না বলে জাতিভেদের পক্ষে যে মন্তব্য করেছেন, তা অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক; এমনকি জীবাণুযুক্ত গরুর মলকে জীবাণুমুক্ত বলতেও আটকায়নি তাঁর— "সেইজন্য জাতিভেদকে গণতন্ত্রের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলতে তাঁর দ্বিধা হয়নি। আচারনিষ্ঠতার কারণে 'পটাশ পারম্যাঙ্গানেটে'র তুলনায় 'গোবর'কে ভাল জীবাণুনাশক বলেছেন।" [অধ্যাপিকা শিপ্রা র. দ. : হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যকর্ম, পৃ. ৭৮]

হিন্দু জাতি, হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে পূর্বেই একটা প্রশ্নবাচক আলোচনা রাখা হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। যে হিন্দু বা হিন্দুত্ব না বেদে আছে, না গীতায় আছে না রামায়ণ-মহাভারতে আছে, সেই 'হিন্দু' কার মাথা থেকে বার হোল, এ প্রশ্নের উত্তর বাকি ছিল। সেটা হচ্ছে এই : ইংরেজ জানতো ইসলামধর্ম বিশ্বজুড়ে বর্ধমান গতিতে চলমান। সেই গতিকে থামাতে প্রয়োজন ছিল মুসলমান বাদ দিয়ে সমস্ত 'নন্-মুসলমান'কে একত্রিত করে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের প্রাচীরটাকে মজবুত করা। এই বিশেষ কাজের বিশেষ দায়িত্ব নিয়েছিলেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ। তিনি বলেছেন : "আমরা তো নন্-মুসলমান। পার্সীরাও নন্-মুসলমান। পাহাড়তলির ভুটিয়া ও হুনীয়রাও নন্-মুসলমান। সাঁওতাল, ভীল, কুর্কী, গারো, খাসিয়া, কোল, ওঁরাও, মুণ্ডা, নাগা, আকা— ইহারাও নন্-মুসলমান। আমাদের মহাসভা এ সকল জাতির সহিত একমত হইতে পারেন না। কারণ ইহাদের আচার ব্যবহার আমাদের আচার ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।" তারপর শেষ ফিনিশিং দিতে, হিন্দুসভার সদস্য কে হতে পারবে আর কে পারবে না, সে সম্বন্ধে লিখলেন, "মুসলমান শাসনকর্তারা যাঁহাদিগকে হিন্দু বলিয়া জানিতেন, তাঁহাদের সকলকেই এ সভায় আসিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি। তাই ইহার নাম হিন্দুসভা'। [দ্রষ্টব্য ভারত হিন্দুসভায় প্রদত্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষণ, ১৯২৩]

হরপ্রসাদ ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ। বিধবাবিবাহের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তাঁর কথায় ও কর্মে গোঁড়ামির অনেক উদাহরণ মেলে। যেমন তিনি লিখেছেন, "যদি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ ধর্মশাস্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিল, এমনকি যাগযজ্ঞেরও বিধিবিধান দিতে আরম্ভ করিল, আর ব্রাহ্মণ নস্যাৎ হইয়া গেল, তাহলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম কোথায় রহিল?" [দ্রঃ পূর্বোক্ত]

আমরা একাধিকবার বলতে চেয়েছি যে, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মগুলোকে পৃথক ধর্ম বলা যায় না। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব সবই একাকার। যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন, একটা মিথ্যা বিষয় সৃষ্টি করতে গেলে তাতে ফাঁকফোকড় কিছু থেকেই যায়। হরপ্রসাদের

দল বৌদ্ধ ধর্মের কাল্পনিক ইতিহাস যেভাবেই প্রতিষ্ঠিত করুন না কেন, যে সত্যটিকে চাপা দেবার উপায় নেই, সেটা হচ্ছে এই :

"বুদ্ধদেব নিজে হিন্দু ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম স্বতন্ত্র ধর্ম হিসাবে মর্যাদা পেয়েছিল বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় চারশত বছর পরে।" [দ্রষ্টব্য : হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যকর্ম, পৃ. ২১০]

আবার স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম বলে কোন আলাদা ধর্ম, তার আলাদা ধরণের মন্দির, আলাদা ধরণের পুরোহিত ছিল এমন কথা তোমরা ভেবো না। বৌদ্ধ ধর্ম সব সময়ই হিন্দু ধর্মের ভিতরেই।" [দ্রষ্টব্য : বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, পৃ. ৮৪১, ১৯৮৮]

স্যার, মহামহোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর প্রভৃতি উপাধিগুলো কাদেরকেএবং কেন দেওয়া হোত, এ আলোচনা পূর্বে হলেও আরও বলা যায় যে, বৃটিশের অনুগ্রহপ্রার্থীদের চরম ও পরমভাবে তাদের অনুগত ও স্তাবক প্রমাণ করতে না পারলে পাওয়া যেত না ঐসব মূল্যবান (?) উপাধিগুলো। যেমন চারণকবি মুরারদানবাবু। মুসলমান বাদশাহদের এবং সিপাহী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন। ইংরেজ খুবই খুশি হয়ে কবিতাটি একলক্ষ কপি ছাপিয়ে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করেছিল। আর মুরারদানবাবুকে তার পরিবর্তে দেওয়া হয়েছিল 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি।

ইংরেজের সঙ্গে জার্মানদের যুদ্ধে বৃটিশের মঙ্গল কামনায় কলকাতার কালীঘাটে যজ্ঞের আয়োজন করে পূজো দিয়েছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরেজরা খুশি হয়ে তাঁকেও দান করেছিল 'স্যার' উপাধি। হরপ্রসাদও সম্ভাব্য সবরকম উপাধি নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে তাঁর উন্নতিসাধন ও উপাধি প্রাপ্তির পিছনে সত্য নেই, শুধু মিথ্যা দিয়েই তার গঠন। তিনি এটাও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সারা জীবনের বেশিরভাগ সময় শাসকদের পদসেবায় তৈলমর্দন করা হয় বটে, কিন্তু ঐ কর্মটি সুকর্ম নয়, কুকর্ম। এটাও বুঝেছিলেন যে, বৃটিশরা স্বার্থপর ও ধান্দাবাজ।

হরপ্রসাদের ভাষায়— "বাঙালীর বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙালীর একমাত্র ভরসা তৈল— বাংলায় যে কেহ কিছু করিয়াছেন সকলেই তৈলের জোরে। ... বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান, যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। ... কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক কেহই টের পায় না।" [দ্রষ্টব্য : হরপ্রসাদ রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯০-৯২]

ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছানোর যে ইতিহাস তা গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে কিছু সাধক, তাপস, সন্ত, ঋষিতুল্য মানুষ, বোজর্গ, পীর, ওলি, কুতুব, আবদাল, সুফি প্রভৃতি নামে একটি দল ভারতে প্রভাব ফেলতে পেরেছিলেন। যেমন হযরত খাজা মইনুদ্দিন, হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া, হযরত কুতুবুদ্দিন কাকী, হযরত হামিদ বাঙ্গালী প্রভৃতি অনেকে। এঁরা মোটেই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তাঁদের জীবিতকালে হিন্দু-মুসলমান সমানভাবে যে শ্রদ্ধা জানাতেন, তাঁদের পরলোকপ্রাপ্তির পরে আজও তাঁদের সমাধির পাশে হিন্দু-মুসলমান সর্বজাতির মানুষের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রথা চালু রয়েছে সমানভাবে।

মানুষ অনুকরণপ্রিয়। বৃটিশের আগমনের পর হিন্দুজাতির সৃষ্টি এবং তার ইতিহাস লিখতে গিয়ে মুসলমানদের মতো মুনি-ঋষি-সাধু-সন্ত যাঁদের ঠিক করেছেন, অনেকের মতে তাঁরা ছিলেন সাধারণ মানুষের মতোই স্বাভাবিক চরিত্রের মানুষ। লোভ, লালসা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, বিদ্বেষ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারেননি তাঁরা। ঋষি বঙ্কিম, ঋষি অরবিন্দ, মহাঋষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির আলোচনা চেপে রাখা ইতিহাস এবং এই পুস্তকে হয়েছে। বাকি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গান্ধীজী প্রভৃতি ব্যক্তিকে ঋষি বানাতে গিয়ে নিরাশ হতে হয় আমাদের।

হরপ্রসাদ খুবই বড় লেখক ছিলেন। অনেকের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে বেশি না হলেও সমকক্ষ তো ছিলেনই।

হরপ্রসাদের প্রথম মৌলিক রচনা 'বাল্মীকির জয়' বইটি যখন প্রকাশ পায়, সারা দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তাঁর লেখায় মুগ্ধ হয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। ঋষি বঙ্কিম ফেটে পড়লেন হিংসায়। তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় হরপ্রসাদকেএকেবারে হিরো থেকে জিরো বানাতে কলম ধরলেন তিনি। বঙ্কিম হরপ্রসাদের লেখার বিরুদ্ধে লিখলেন, "ইহা পদ্যে লিখিত নহে, সুতরাং সমালোচক সম্প্রদায় ইহাকে কাব্য বলিবেন না। ইহা নাটক নহে আমি নিশ্চিত জানি, কেননা ইহা কথোপকথনে বিন্যস্ত নহে। ইহাকে নবেলও বলিতে পারিলাম না, কেননা ইহাতে নায়ক নাই, নায়িকা নাই, ভালবাসা নাই, কোর্টশিপ নাই, বিবাহ নাই, লুকোচুরি-মারামারি-খুনোখুনি কিছুই নাই। ইহাতে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কথা আছে— কিন্তু পুরাণ নহে— দিগ্বিজয়ের কথা আছে, কিন্তু ইতিহাস নহে। একটা সৃষ্টির বিবরণ আছে কিন্তু বিজ্ঞান নহে, ... হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিশ্চিত একটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন।" [বঙ্গদর্শন, ১২৮৯, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫]

হরপ্রসাদের ভিতরে হিংসা থাকলেও এত উৎকটভাবে নোংরামি করতে পছন্দ করেন নি তিনি। তিনি তাঁর নিজের লেখার সঙ্গে তুলনা করে ঐ সময়কার চলতি উপন্যাসগুলোকে

গণিকাতন্ত্র বা বেশ্যাতন্ত্র বলতে দ্বিধা করেননি। 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসটি লেখার পর তাঁর ঐ বইয়ের স্বপক্ষে এবং অন্যান্য উপন্যাসের বিপক্ষে হরপ্রসাদ লিখলেন, "বাঙালী এখন কেবল একেলে 'গণিকাতন্ত্রে'র উপন্যাস পড়িতেছেন। একবার সেকেলে সহজিয়াতন্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখটা বদলাইয়া লউন না কেন?" [হরপ্রসাদ রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৮]

বঙ্কিমচন্দ্র যখন ভিতরে ভিতরে রেগে উঠলেন, তখন তাঁর এতটা ক্ষমতা প্রয়োগ করার অবকাশ ছিল যে তিনি ইচ্ছা করলে বৃটিশের দরবার থেকে হয়ত বিতাড়িত করতে পারতেন হরপ্রসাদকে। তবে যে কোন ভাবেই হোক, এমন একটা প্রচণ্ড চাপ হরপ্রসাদের উপর এলো যে, তাঁর উপন্যাস লেখা দীর্ঘদিনের জন্য বন্ধ রাখতে বাধ্য হলেন তিনি।

"১২৯০ (১২৮৯) সালে যখন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, তখন 'কাঞ্চনমালা' বঙ্গদর্শনে প্রকাশ হইয়াছিল। তাহার পর নানা কারণে আমি অনেকদিন ধরিয়া বাংলা লিখি নাই; সুতরাং 'কাঞ্চনমালা' প্রকাশের জন্য যত্ন করি নাই। কেন কি বৃত্তান্ত— সে অনেক কথা— বলিয়া কাজ নাই।" [ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০]

ডঃ সুকুমার সেন এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, "... বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশাসন মনে রেখেই বোধহয় হরপ্রসাদ আর কোন গল্প লেখেননি।" [ঐ, পৃ. ১৮]

১২৮৯ সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'কাঞ্চনমালা' যখন প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন, "ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বিচলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বীই বা হরপ্রসাদ হইয়া পড়েন, এই চিন্তা তাঁহার আসিয়াছিল। ... তাহা শুনিয়া রাজকুমারবাবু হরপ্রসাদকে উপন্যাস লিখিতে মানা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'তুমি এখন নাই লিখিলে you will survive him long, লেখার সময় তো ঢের পাবে, বন্ধুবিচ্ছেদ নাই বা করিলে'।" [দ্রঃ গণপতি সরকার : হরপ্রসাদ জীবনী, কলকাতা, ১৩৪৩, পৃ. ২৯]

এইসব রকমসকম দেখে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন হরপ্রসাদ। শেষে ক্ষমা যেভাবেই হোক চেয়ে, বঙ্কিমকে তুষ্ট করতে পেরেছিলেন তিনি।

বঙ্কিম চোখবুজে যে লেখার দুর্নাম করেছিলেন, আবার সেই লেখা এবং তার লেখকের জন্য অনায়াসে লিখে ফেলতে পারলেন, "চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন কিরণে ডুবিয়া যায়, এও তাই। ইহার গুণসকল বলিয়া উঠি এমন সময়ও নাই। কাব্যের প্রধান উৎকর্ষ— কল্পনায়। ইহার কল্পনা অতিশয় মহিমাময়ী।" [বঙ্গদর্শন, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩ দ্রষ্টব্য]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, যা অকাব্য ছিল, তা 'কাব্য' হয়ে গেল, হরপ্রসাদের লেখায় চাঁদের 'কিরণে'র ছড়াছড়িও দেখতে পেলেন, আর হরপ্রসাদের কল্পনাকে 'মহিমাময়ী' বলতেও আটকালো না তাঁর। আর লেখাটি এত প্রশংসার উপযুক্ত ছিল যে তা লিখতে

তাঁর 'সময়ও নাই'। যেটাকে তিনি বলেছিলেন 'কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ', সেটাকে আবার হজম করার পর্যাপ্ত ক্ষমতাও ঋষি বঙ্কিমের ছিল। এসব ঋষিদেরই মহিমা।

হরপ্রসাদ বারে বারে বুঝতে পারছিলেন তাঁকে বা তাঁদেরকে বৃটিশ প্রভুরা যে আঁতাতে নিযুক্ত করেছিল, তা যেন অসহ্য। তাই লিখে ফেললেন নিজের ভাষায়— "কিসে লোকের কাছে অধিক পরিমাণে বাহবা লওয়া যায় (লোকের কাছে বলিতে কালা বাঙালীর কাছে নয়, শুদ্ধ লালমুখের কাছে বুঝায়), কিসে সাহেবদিগের কাছে সম্মান বাড়ে, কিসে নামের পাশে ৭/৮টা ইংরাজী অক্ষর জুড়িতে পারা যায়, আমাদের জীবনে শুধু একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" [হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, কলকাতা, পৃ. ৩১৮]

মনের দুঃখে সত্য কথা মাঝে মাঝে বলে ফেলতে লাগলেন হরপ্রসাদ। 'ইংরেজি আমাদের রাজভাষা'— এটা স্বীকার করেও বলে ফেললেন, "তাই বলিয়া ছয় কোটি ছষট্টি লক্ষ লোক ইংরাজি পড়িয়া মরিবে কেন? ... ইংরাজীতে অঙ্ক কষিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালা দিয়া ইংরাজি শিখ না কেন?"

সংস্কৃত ভাষায় ইংরাজ জাতির প্রভাবের কথা স্বীকার করে বলেই ফেললেন, "আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরাজি দিয়া শিখিতে হয়।" [ঐ, পৃ. ৩২১ দ্রষ্টব্য] মিথ্যা ইতিহাস সৃষ্টি করার ইংরেজ-চক্রান্তে তিনি সংযুক্ত হলেও মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রকাশ করে ফেলতেন অনেক সত্য কথা— "শুধু ইংরেজি পড়িয়া আর সাহেবদের বই পড়িয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস জমিবে না, জমাইতে পারিবে না।" [দ্রঃ হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৬৪]

হরপ্রসাদের মতে "সাহেবদের রচিত ইতিহাস প্রকৃত ইতিহাস নয় ; সাহেবরা এদেশীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিষয়ে যে চূড়ান্ত কথা বলতে চেয়েছেন, তা ভ্রান্ত ও একদেশদর্শী। তাঁদের মতে মুসলমান অধিকারের পূর্বে ভারতবর্ষের কোন ইতিহাস ছিল না। একমাত্র বেদেই ভারতের গৌরব। ... ইয়োরোপীয়দের হাতে ভারতের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হয়েছে— এ কথা স্বীকার করে এবং ম্যাক্সমুলার, পারজিটার, ম্যাকডোনেল ও কীথের জ্ঞানগর্ভ রচনার ঋণ শিরোধার্য করে নিয়েও হরপ্রসাদ ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুন করে সাজানো আবশ্যক মনে করেছেন।" [দস্তিদার, ঐ, পৃ. ২১৭] হরপ্রসাদ নিজের ভাষায় লিখেছেন, "আমাদের ইতিহাস ছিল না, ইয়োরোপীয়ানরা আমাদের ইতিহাস শিখাইয়াছেন সে কথা সত্য। তাঁহারা আমাদিগকে যে পথে চালাইতেছেন আমরা এখনো সেই পথে চলিতেছি; কিন্তু তাঁহাদের কথা শুনিলে আর চলিবে না। তাঁহারা আমাদের দেশের সব খবর রাখেন না, সব বই পড়েন না,

সকলের সঙ্গে মিশেন না; দুই দশখানি বই পড়িয়াছেন, তাহা হইতেই একটা ইতিহাস খাড়া করিয়া দেন।" [দ্রষ্টব্য : হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম, পৃ. ৪৫৭]

হরপ্রসাদ বাবুদের গ্রুপে উড়িষ্যার পণ্ডিতও ছিলেন। ঐ পণ্ডিতদের তিনি ভাল চোখে দেখতেন না। মনে মনে হয়তো একটা হিংসা বাসা বেধে ছিল তাঁর ভিতরে। তাই তিনি মন্তব্য করলেন, "বঙ্গবাসী এইবার তোমার বড়ই লজ্জার কথা। বিদেশীয়দিগের উৎসাহে, বিদেশীয়দিগের উপকারার্থে, বিদেশীয়দিগের যত্নে বিদেশীয় পণ্ডিত কর্তৃক তোমাদের সাহিত্য আরম্ভ হইল। ... উড়ে ও সাহেবে বাংলায় সাহিত্য আরম্ভ করিল। আরও লজ্জায় কথা এই যে, দুই একজন বাঙালি এইসময় পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহাদের পুস্তক কদর্য ও জঘন্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র রায় চরিত্র ও প্রতাপাদিত্য চরিত্র বাঙালীর লেখা। দুইখানিই অপাঠ্য।" [ঐ রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০২]

ইংরেজের কর্মকাণ্ডে যাঁরা জড়িয়ে পড়েছিলেন, ইংরেজের ইঙ্গিতের বাইরে তাঁদের এক পা-ও চলবার ক্ষমতা ছিল ন। যখনই চলতে গেছেন, তখনই ধাক্কা খেয়েছেন তাঁরা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও মনে মনে জানতেন যে, বৃটিশের তৈরি করা কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিগুলোতে মৌলিক শিক্ষা ছিল না। সেগুলো ছিল মূর্খদের আধাশিক্ষিত করে কাজে লাগানোর উপযুক্ত করার কারখানা মাত্র।

বাবু, রাজা, মহারাজা, রায়বাহাদুরদের বিদ্যের বহরের কথা কিছু আলোচনা হয়েছে। হরপ্রসাদের গ্রুপের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পূর্ণচন্দ্রকে বললেন, "তাই বলি পূর্ণচন্দ্র, আমাদের যেসব ছেলে আছে, তাহাদের কাছ থেকে আমরা মাহিনা নিই, পাঙ্খা ফি নিই, একজামিনেশন ফি নিই, নিয়া কলের দোর খুলি— দেখাইয়া দিই, এইখানে মাস্টার আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, এইখানে চেয়ার আছে, এইখানে কাগজ-কলম-দোয়াত-পেনসিল-সিলেট-বই আছে। বলিয়া তাহাদের কলের ভিতর ফেলিয়া দিয়া চাবি ঘুরাইয়া দিই। কিছুকাল পরে কলে তৈয়ারী হইয়া তাহারা কেহ সেকেন্ড ক্লাস দিয়া, কেহ এনট্রেন্স হইয়া, কেহ এল. এ. হইয়া, কেহ বি. এ. হইয়া, কেহ এম. এ. হইয়া বেরোয়। কিন্তু সবাই লেখে। has ; একপাকের তৈরি কিনা।" [ঐ রচনাবলী, দ্বিতীয়, বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, পৃ. ১৪]

রাজনারায়ণ বসুও লিখেছেন, "এম. এ. উপাধিপ্রাপ্তি অর্থাৎ স্বর্গারোহন অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। এক হিসাবে বর্তমান ইংরেজি শিক্ষার প্রণালী মানুষ মারিবার কল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" [রাজনারায়ণ বসু : সেকাল আর একাল, পৃ. ৪১-৪২]

বেদের পক্ষে হরপ্রসাদের যতো অবদানই থাকুক, তিনি কিন্তু নিজে জানতেন বেদের অন্তর্নিহিত রহস্য। তাই বিবেকানন্দের মতো বেদের বিরুদ্ধেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

বেদের জন্য তিনি লিখেছেন, ওগুলো কবিদের কবিতা বা গান। আর সেই কবিগুলোকে ক্রমে ক্রমে দেবতায় পরিণত করা হয়েছে। বেদ সম্পর্কে যে শব্দগুলো বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন, তা মারাত্মক বলা যায়। তিনি লিখেছেন, "কিন্তু উহা (বেদ) দুর্বোধ্য, দুষ্পাঠ্য, দুষ্প্রবেশ্য, দুরধিগম্য। ... ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে, ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি-প্রণীত কতকগুলি কবিতা গান আদি সংগ্রহমাত্র।" [দ্রঃ ঐ গ্রন্থাবলী, পৃ. ২৮৬]

মুসলমান আমলে সারা দেশের লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতো, তাতে স্বাভাবিকভাবেই আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দ যুক্ত হয়েছিল। ঐ সহজ কথোপকথনের ভাষাকে মুসলমানি ভাষা মনে করে আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দগুলোকে সরিয়ে দিয়ে সেই জায়গায় মনগড়া বৃটিশ কল্পনাপ্রসূত যেসব সংস্কৃত শব্দ আমদানি করা হয়েছিল, তার শ্রেষ্ঠতম নায়ক ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

তবুও সত্য স্বীকার করে মুসলমানদের সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন— "চলতি মুসলমানি শব্দ তোমরা তাড়াইবে কেন? তাড়াইবার তোমাদের কী অধিকার আছে? যে সকল শব্দ তিন, চার, পাঁচ শত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের তো ভাষায় থাকিবার কায়েমী স্বত্ত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। ... বাংলায় যখন অর্ধেক মুসলমান, তখন তাহারা যে হিন্দুরা যাহা বলিবে, তাহাই করিবে— এরূপ আশা করা যায় না।" [ঐ রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭০]

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে হরপ্রসাদ অধ্যাপনা করতেন। সেখানে তখন মুসলমান ছাত্রই ছিল বেশি। ছাত্ররা তাঁর বাসায় যাতায়াত করতো। মুসলমান ছাত্রদেরও তিনি খাওয়াতেন এবং পড়াশোনার আলোচনা করতেন। কিন্তু তাদের ছোঁয়া খাবার তিনি খেতেন না কখনও। শ্রী কালীপদ দাস তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, "তিনি ইউনিভার্সিটিতে কখনো জল খেতেন না। পিপাসা পেলে আমাদের দিয়ে ডাব কিনিয়ে এনে গ্লাস ছাড়া ঐ ডাব থেকেই জল খেতেন।" [দ্রষ্টব্য : স্মারক গ্রন্থ, পৃ. ১৪৪]

বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা হয়েছে পূর্বেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ সাজানো গোছানো বৌদ্ধ কেচ্ছাটিকে যদি মেনেই নেওয়া হয়, তাহলে অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে রাজশক্তি যোগ হয়ে ভারতবর্ষের বেশিরভাগ লোকই যে বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সেই বিশাল সংখ্যার বৌদ্ধরা তাহলে গেলেন কোথায়? আজ কেন তাঁরা আঙুলে গোনা মুষ্টিমেয় দলে পরিণত? এই প্রশ্ন বা সমস্যা বিরাট হলেও মহাপণ্ডিত হরপ্রসাদ এর সমাধান করে দিয়েছিলেন নিমেষেই। তিনি লিখলেন, "মুসলমান অধিকাররূপ শিশিতে বা বোতলে হিন্দু বা বৌদ্ধ দুই জাতিকে বন্ধ রাখিয়া এই সাতশত

বছরের পর দেখা যাইতেছে, দুই-ই এক হইয়া গিয়াছে, ইতর-বিশেষ করা যায় না।" [রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৭৭]

বারবার আমরা উল্লেখ করেছি বা করছি যে, মৌলিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী হরপ্রসাদ বৃটিশ চক্রান্তের সহযোগী হলেও তাঁর বিবেক জাগ্রত ছিল। সত্য উপলব্ধি করতে অনধ হয়ে যান নি তিনি।

মুসলমানেরা যে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশকে ভালবাসতেন, সে উপলব্ধি তাঁর ছিল। তাই লিখতে পারলেন, "বাংলা হিন্দু-মুসলমানের দেশ। মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় অর্ধেক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দুরা মুসলমানদিগের বড় একটা খবর রাখেন না। এই সকল মুসলমানেরা কিন্তু বাঙালী, বাংলার উপর হিন্দুদের যত টান, মুসলমানদিগের তদপেক্ষা কোনমতেই কম নহে।" [রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয়, পৃ. ৫৬৭]

হরপ্রসাদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সভাপতির দীর্ঘ অভিভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "..... যাহারা আসিয়াছে, তাহারা অধিকাংশ— এমনকি শতকরা ৯৯ জন হিন্দু, একজন মুসলমান। মুসলমানেরা যাহাতে সাহিত্য পরিষদের মেম্বর হন, সেটি বড়ই বাঞ্ছনীয়। কারণ, গত ৭০০ (সাতশত) বৎসর ধরিয়া মুসলমান ছাড়িয়া বাংলার কোন কাজই হইতেছে না।" [দ্রঃ রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয়, পৃ. ৩০৯]

হিন্দুজাতির মধ্যে একদলের চরিত্র খুবই নিচে নেমে গিয়েছিল, আর একদল স্বাভাবিকভাবেই উন্নত চরিত্রের ছিলেন— এই দুটিকে বিভাজন করে হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুটি ধর্মকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে অনেক আধুনিক গবেষকের মত।

মুসলমান শাসকদের আগমনে এবং তাঁদের সঙ্গে ভারতবাসীর মেলামেশার কারণে তাঁদের চরিত্রের অপেক্ষাকৃত উন্নতি হয়েছিল, একথা স্মরণ রেখেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, "তিন-চারিশত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়া যে নিজেও অধঃপাতে গিয়াছিল এবং দেশটাকে শুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল। মুসলমান আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মুসলমানদের এ দেশে পাঠাইয়াছিলেন।" [রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৮১-৮২]

বৃটিশের প্ররোচনায় গোটা ভারতবর্ষের অমুসলমানদের শেখানো হয়েছে যে, ভারতের নাকি সবই ছিল। এখন সে সব ধ্বংস হয়ে গেছে মুসলমানদের কারণে। হরপ্রসাদ তাতে জড়িয়ে থাকলেও তিনি নিজে তা বিশ্বাস করতেন না বলেই লিখতে পেরেছেন— "মুসলমানেরা যে ভারতবর্ষের কখনো কোন উপকার করিয়াছে অথবা উহাদের দ্বারা ভারতবর্ষের কোন উপকার সাধিত হইয়াছে ইহা কেহই স্বীকার করিতে সম্মত নহেন।

সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় যে, মুসলমানেরা আমাদের সমস্ত পুস্তকাদি ধ্বংস করিয়া গিয়াছেন। অনেক শিক্ষিত লোক তথাপি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ছিল। মুসলমানেরা উহা দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। একথা বাস্তবিক সত্য নহে।" [দ্রষ্টব্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : মুসলমানগণের সংস্কৃত চর্চ্চা, 'বিভা', মাঘ ও ফাল্গুন, ১২৯৫]

ইংরেজ সরকার টের পেতে লাগলো যে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য সামান্য বিরোধী বক্তব্য রাখতে শুরু করেছেন। সুতরাং সিদ্ধান্তও নেওয়া হোল তাঁর উন্নতির মই কেড়ে নেওয়ার। ঢাকা ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষের কাছে অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের বেতনের সঙ্গে তুলনা করে জানিয়েছিলেন তাঁর ছোট্ট দাবি। কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নানা আইনের প্যাঁচ দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেই প্রস্তাব। তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন এইজন্য যে, সারাজীবন বৃটিশের গোলামি এবং তাদের সেবায় নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েও শেষ পর্যন্ত তাদের মন জয় করা সম্ভব হোল না। দুঃখে, ক্ষোভে ও লজ্জায় অধ্যাপনার চাকরিতে পদত্যাগ করে চলে এলেন শিশুর মত হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে। [তথ্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত নথি ; স্মারকগ্রন্থে শ্রী কালীপদ দাসের স্মৃতিচারণ, পৃ. ১৪৪]

হরপ্রসাদ কিন্তু সেই সস্তার বাজারে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নিয়েছিলেন। এটা অবশ্য ইংরেজ সরকারের তাবেদারি করার সুফল। ইংরেজ সরকারের উপরে যখন তাঁর সুধারণা শেষ হয়ে গেল, তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে ঘোরপ্যাঁচ বাদ দিয়ে সোজাসুজিভাবে বলেছেন অনেক ক্ষেত্রেই। ইংরেজের স্তাবকতা আর মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অনেকের মতো হরপ্রসাদ নিজে এবং একটি বিশেষ গোষ্ঠী উপকৃত হয়েছেন বটে কিন্তু মুসলমান জাতি এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষেরা হয়েছেন রিক্ত, বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত।

কালীপদ সেন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি উক্তি তুলে ধরেছেন : "'ভারতবর্ষের ইতিহাস' বইটির শেষদিকে একটি পরিচ্ছেদ ছিল 'ভারতে ইংরেজ শাসনের সুফল'। হরপ্রসাদ বলেন, 'ইংরেজের স্তাবকতা অনেক করা গেছে এবং প্রসাদও কিছু মিলেছে। কিন্তু এই ৭৬ বৎসর বয়সে মিথ্যা কথা আর লিখতে পারব না। পারলে সুফল কেটে কুফল বসাতাম। কিন্তু তাহলে আমার বইখানি আর চলবে না। জানো, এই বইখানি এ পর্যন্ত আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এনে দিয়েছে।" [দ্রঃ স্মারক গ্রন্থ, ঐ, পৃ. ১৫৯]

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতার রাস্তায় পড়ে গিয়ে আহত হন গুরুতরভাবে। ফলে বগলে ক্রাচ এবং চাকা লাগানো চেয়ার ছাড়া স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারতেন না তিনি। বৃদ্ধ হরপ্রসাদকে বাদ দিয়ে অনেক নবীন যুবককে সহযোগী হিসাবে বেছে

নিচ্ছিল বৃটিশ। তাতে তিনি খুব হীনম্মন্যতায় ভুগতেন, নিজেকে মনে করতেন একটা বৃদ্ধ কাকের মতো। তাই একটি ভাষণে অনেক নবীন বৃটিশ-সহযোগীদের সামনে ক'রে তিনি বলেন— "You have heard the songs of many young cuckoos ; this time perhaps you will have to hear the shivering cowing of an old crow, from the effects of storm and rain."

সাধারণতঃ যাঁরা ঈশ্বর, আল্লাহ্ বা গড্-এর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁরা পরকালকেও বিশ্বাস করেন। আরও বিশ্বাস করেন যে, ইহকাল সীমিত খানিকটা সময় মাত্র। কিন্তু পরকাল বিরাট, বিশাল এবং চিরস্থায়ী। যাঁরা শুধু ইহকালের উন্নতিকে কেন্দ্র করেই ধর্ম পালন করেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক নন আদৌ। পার্থিব ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিও মৃত্যুর পূর্বে শেষ সান্ত্বনা গ্রহণ করেন এই ভেবে যে, ইহকালে লাভবান না হলেও পরকালে চিরস্থায়ী সুখশান্তি পাবেন। সেই আশায় তিনি করতে থাকেন একটি ধর্মীয় প্রতীক্ষা।

আমরা হরপ্রসাদের ইতিহাস আলোচনায় দেখলাম তিনি ছিলেন একেবারে গোঁড়া হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্রাহ্মণ। কিন্তু শেষ বয়সে যখন তিনি হিসেব কষে দেখলেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বৃটিশের পক্ষ থেকে পেলেন অসম্মান ও বঞ্চনা, তারপর পেলেন স্ত্রী বিয়োগের আত্মিক যন্ত্রণা, আশুতোষ মুখার্জির সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় পুত্র বিনয়তোষকে কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে একটা কাজে ঢুকিয়ে দিতে না পারার ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণে তিনি যেন ধরেই নিলেন ধর্মটর্ম ওসব কিছুই নয়। একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করতে চাইছি প্রসঙ্গটি : "অথচ শেষ বয়সে তিনি প্রায় সবই (ধর্মকর্ম) ছেড়ে দিয়েছিলেন।" [অধ্যাপিকা দস্তিদার : ঐ, পৃ. ৭৮]

"শেষ বয়সে একান্তে নিত্যপূজা, জপতপ, এমনকি সন্ধ্যা আহ্নিকও তিনি করতেন না। তীর্থভ্রমণ, সাধুসঙ্গ, দেবস্থানে মানত, মাদুলি ধারণ— এসব কিছুই তিনি করতেন না। তাঁর প্রিয় ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক নীলমণি চক্রবর্তী মহাশয় সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন, 'ওর কিছু হবে না। ও চার ঘণ্টা পুজোয় নষ্ট করে'। [দ্রঃ পূর্বোক্ত স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ১৩২]

রামমোহনের জটিল ইতিকথা

রাজা রামমোহন রায়ের আলোচনা প্রথম খন্ডে শুরু করা হলেও সম্পূর্ণ করা যায়নি সেটা। 'রাজা' 'মহারাজা' প্রভৃতি বলে কোটি কোটি মানুষের কাছে যা প্রচার করা হয়েছে তা ভাঁওতা মাত্র। রাজা বলতে King বা Emperor নন এঁরা হচ্ছেন বেশির ভাগই খাজনা আদায়কারী। সরকারের কৌশলে চাষীদের হাত থেকে কায়দা করে জমিজমা কেড়ে নিয়ে করা হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত— সেটা ছিল কর্নওয়ালিসের সময়। ঐ সব জমির কর আদায়ের দায়িত্ব যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরাই হয়ে গেলেন জমিদার বা জমির আসল মালিক। এঁদের বেশির ভাগেরই চরিত্র ছিল নোংরা। Fifth Report-এ যে সমস্ত বিশেষণে এই জমিদারদের ভূষিত করা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি হোল এই ঃ জমিদাররা হলেন নির্বোধ কিংবা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, অলস, লম্পট, অমিতব্যয়ী, অভাবী, অত্যাচারী, অজ্ঞ, লোভাতুর, ডাকাত-পেষক, প্রতিবন্ধক ও ব্যধিগ্রস্ত। [দ্র ঃ Land Problem of India : R. K. Mukherjee, p. 16]

রামমোহন রায় ছবি: 'পশ্চিমবঙ্গ

হেস্টিংসের আমলে অর্থাৎ ১৭৭২তেও জমিদারির সংখ্যা ছিল দুশোরও কম। ১৮৭২ সালে জমিদারির সংখ্যা বাড়িয়ে করা হোল দেড় লক্ষেরও বেশি। এই দেড়লক্ষ জমিদারির জমিদাররাই যদি শুধু গরীব চাষীদের সরাসরি শোষণ করত তাহলেও খানিকটা বাঁচার রাস্তা ছিল। জমিদার ছাড়া শোষণ করার জন্য আরও যে সমস্ত রক্তশোষকদের নিয়োগ করা হয়েছিল তারা হোল ইহ্‌তিমামদার, ঠিকাদার, ইজারাদার, লাখেরাজদার, জায়গীরদার, ঘাটোয়াল আয়মাদার, মকরারীদার, তালুকদার, পত্তনিদার, মহলদার, জোতদার, গাঁতিদার, হাওলাদার প্রভৃতি। এই 'দার'-এর দলই ছিল ধ্বংসের 'দ্বার'। এরা ছাড়াও যাদের ঘুষ বা ভেট দিয়ে খুশি রাখতে হোত তারা হোল ''জমিদারের দেওয়ান, নায়েব, এস্টেট ম্যানেজার, গোমস্তা, পাইক, তহশীলদার, দফাদার, পাটোয়ারি, মন্ডল, জমিদারের

ভৃত্য প্রভৃতিদের সংখ্যা ছিল ৫৮,৭৪৯। এরা কৃষক শোষণের অংশীদার।'' [বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা : ডঃ বিনয় ঘোষ, পৃ. ১৮]

এইসব জমিদার গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন রামমোহন রায়। আর তাঁর সহকারী ছিলেন রাজপুত্র না হয়েও 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুর। রামমোহন কিন্তু ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত এবং নানা ভাষাজান্তা সুচতুর জমিদার নেতা। এক কথায় তিনিই ছিলেন অধিকাংশ জমিদারদের পরামর্শদাতা, পথপ্রদর্শক ও রক্ষাকর্তা।

ইংরেজ সরকারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েছিলেন প্রধানত তাঁরাই যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে নিপীড়িত হচ্ছিলেন অর্থাৎ সেই কৃষক সমাজ ও অনুন্নত গরীবেরা। উল্লেখ্য যে, মুসলমান সমাজ পরিণত হয়েছিল কৃষক সমাজে। আর অত্যাচারিত নিপীড়িতের দল বিপ্লবী হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সেগুলোর মধ্যে মুসলমানদের ওহাবী, ফারাজী, নীল ও সিপাহী বিপ্লব, সাঁওতাল বিপ্লব, রেশম শিল্পী বিপ্লব, তাঁত শিল্পী বিপ্লব, লবণ শিল্পী বিপ্লব ইত্যাদি উল্লেখ্য।

এই সময় রামমোহন রায় ছিলেন তরুণ। তিনি একটির পর একটি ভূ-সম্পত্তি কিনে চলেছেন, ইংরেজ সিভিলিয়ানদের সঙ্গে সুদের কারবার করছেন আর কেনাবেচা করছেন কোম্পানির কাগজ। তিনি বড় বড় তালুক কিনেছেন চন্দ্রকোণার রামেশ্বরপুরে, জাহানাবাদ পরগনার গোবিন্দপুর ও বিরলুকে, লাঙ্গুলপাড়ায় নতুন তালুক, ভুরসুট পরগণার কৃষ্ণনগর ও শ্রীরামপুর, কলকাতার চৌরঙ্গীতে কিনলেন দোতলা বিরাট বাড়ি, মাণিকতলায় বাগানসহ বিরাট বাড়ি, তাছাড়া চারিদিকে জমিজায়গা কিনতে লাগলেন। যেখানে যেখানে ভূ-সম্পত্তি কিনেছেন সেগুলোর নাম কাবিলপুর, কেদারপুর, ধাওলা, দীঘচক, চকজয়রাম, গৌরাঙ্গপুর, চিঙ্গড়াদীং, লাউসর, খড়িগেরা,জুগীকুন্ড, শোলা, রঞ্জিতবাটী, আস্তাবাসুচক, মড়াখালি, রায়বার, আটঘরা, সুদামচক, অযোধ্যা, কলাহার প্রভৃতি বহু স্থানে ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। [তথ্য : The Permanent Settlement in Bengal (1740-1819) : Sirajul Islam]

আগেই বলা হোল, তিনি ছিলেন শিক্ষিত। সুতরাং তাঁর চরিত্র ভাল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ''অথচ রামমোহনের বড় ভাই জগমোহন সরকারী খাজনা বাকী রাখার অপরাধে ১৮০১ খৃষ্টাব্দ থেকে জেলে দীর্ঘকাল আটক হয়ে আছেন; ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন যখন মুর্শিদাবাদে তখন সরকারকে কিছু টাকা দিয়ে জেল থেকে মুক্তিলাভের জন্য জগমোহন ছোটভাই রামমোহনের কাছে চিঠি লেখেন। অনেক চিঠিপত্র লেখালেখির পরে সুদসমেত দেনা শোধ করবেন এই মর্মে ১৮০৫ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জগমোহন তমসুক লিখে দেবার পরে রামমোহন বড়ভাইকে একহাজার টাকা ঋণ দেন সুদে। সেই টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে জগমোহন ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ জেল থেকে মুক্তি

লাভ করেন। বাকী খাজনার দায়ে রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ও কারারুদ্ধ হয়েছিলেন (১৮০০ খৃ:)। 'বাবাকে ঋণমুক্ত করে কারামুক্ত করবার মত সঙ্গতি রামমোহনের নিশ্চয় তখন ছিল। কিন্তু রামমোহন এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় ছিলেন।" [রাজা রামমোহন : শ্রী ঋষি দাস, পৃ. ৩৬]

রামমোহনের চরিত্রের মূল্যায়নে ডঃ কুমুদ ভট্টাচার্য লিখেছেন : "অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থে রাজা রামমোহন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে মৈত্রী ভাবাপন্ন মনোভাব পোষণ করতেন।"

'রাজা' 'মহারাজা' 'বাবু' অর্থাৎ বৃটিশের স্তাবক ও দালালদের বাড়িতে ইংরেজদের নিমন্ত্রণ করে এনে মদ মাংস ও বেশ্যা বাঈজীদের আনিয়ে যে কীর্তি করা হোত, ঢাকা পড়ে গেলেও ইতিহাসের রক্ষাগারে মজুত রয়েছে তা। 'রাজা রামমোহনের বাড়ীতে, প্রিন্স দ্বারকানাথের বাগানবাড়ীতে, রাজা রাধাকান্ত দেবের গৃহে, মহারাজা সুখময় রায়ের বাড়ীতে, রাজা গোপীমোহন দেবের বাড়ীতে, বেনিয়ান বারানসী ঘোষের বাড়ীতে নাচ গান বাঈজী ও আতসবাজী পোড়ানোর বন্যাহীন, কুৎসিত আমোদ প্রমোদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা চলতো।' [বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা : ডঃ বিনয় ঘোষ, পৃ. ২৮]

"নর্তকীদের আনার জন্য পাল্কি পাঠিয়ে দেওয়া হোত। সঙ্গে যেত পাইক ও বরকন্দাজ। ... রাজাসাহেব এগিয়ে আসতেন খুশি উজ্জ্বল দুটো কামাতুর চোখ নিয়ে। মোসাহেবের দল অপরিসীম কৌতুহল নিয়ে পাল্কির রুদ্ধ দুয়ারের দিকে তাকাতেন। তারপর দরজা দুটো খুলে যেত। নর্তকী নামত, পরনে মসলিনের পেটিকোট ও ওড়না ও সমস্ত দেহ অলঙ্কারে মোড়া, ঠোঁটে উজ্জ্বল হাসি ঠিকরে পড়ত। রাজাসাহেব এগিয়ে আসতেন, বলতেন, 'এস বিবিজান'।" [ঐ, পৃ. ৯৩]

আমরা যাঁরা রামমোহনের প্রতি ভক্তি রাখি, মনে প্রশ্ন আসবে, তাহলে কি অন্য রাজা মহারাজাদের মত তাঁর যৌনদোষও ছিল? ইতিহাস কিন্তু পরিবেশন করে সে তথ্য— "বহুমূল্য ইওরোপীয় আসবাবপত্রে মানিকতলার বাড়িটি সুসজ্জিত করে রাজা রামমোহন কলকাতার জীবনযাত্রা শুরু করেছেন। কিন্তু হঠাৎ রাজাদের মত তাঁর বিলাস বৈভব পূর্ণ রাজসিক জীবনযাত্রা, উৎসব-ভোজে, বাঈজী-নাচে ও রক্ষিতা-পোষণে অজস্র অর্থ ব্যয় করার তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য তিনিও বহন করে চলেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সমসাময়িককালে রাজা রামমোহন রায়ের এক যবনী রক্ষিতা ছিল। উমানন্দন ঠাকুরের এক প্রশ্নের উত্তরে রাজা রামমোহন রায় বলেছিলেন যে, ওরূপ যবনী রক্ষিতা শৈবমতে বিবাহিতা স্ত্রীর সামিল।" [দ্রষ্টব্য 'কলকাতার চালচিত্র : ডঃ অতুল সুর, পৃষ্ঠা ৪৪]

শ্রীমতী ফানি পার্কাস রামমোহনের বাড়িতে আয়োজিত ভোজসভায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যে বর্ননা দিয়েছেন তাতে প্রমাণ হয় যে, সারা ভারতবর্ষে তখন সবচেয়ে বড় বাঈজীর নাম ছিল নিকি। তাকেও বহু টাকা দিয়ে ভাড়া করে রামমোহন নিয়ে আসতেন নিজের, নিজেদের ও সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্য। [ডঃ কুমুদ ভট্টাচার্য : রাজা রামমোহন : বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃ. ৬৩]

রামমোহন রায় উৎকোচ বা ঘুষ খাওয়ার অভিযোগেও অভিযুক্ত। "কিশোরীচাঁদ মিত্রের মত সেকালের বিশ্বাসযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রচলিত জনরবের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেতে বলেছেন যে, সেকালে অন্যান্য বাঙালি দেওয়ানের মত রাজা রামমোহনও সরকারি কর্মে লিপ্ত থাকাকালীন উৎকোচ গ্রহণ করে আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন।" [ডঃ কুমুদ ভট্টাচার্য, পৃ. ৬৬]

ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার বলেন, "এসব পদে অধিষ্ঠিত থাকার কালে সে সময়কার বল্গাহীন স্বর্ণমৃগয়ার দিনে বেশ কিছু উপরি পাওনার ব্যবস্থাও সমগ্র আর্থনীতিক কাঠামোতে জড়িয়ে ছিল। অনান্যদের মত তিনিও (রামমোহন) যদি এর সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন তো বিস্ময়ের কারণ নেই।" [দ্রঃ রামমোহন উত্তর পক্ষ, পৃ. ১৩]

"তিনিই প্রথম দুই জীবন দুই কথার প্রবর্তক বাঙালী বুদ্ধিজীবী।" উদাহরণে বলা যায়, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন রামমোহন। আবার তিনিই বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ বলে মনে করতেন না। [তথ্য : নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত, পৃ. ৩৮৪]

সতীদাহ প্রথার জন্য তিনি বলেছেন, "এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের পূর্ব থেকেই এদেশে যে আন্দোলন চলছিল তাতে অংশ গ্রহণ করে এবং প্রধান ভূমিকা নিয়ে রামমোহন অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সতীদাহ অবসানের জন্য তিনি সংবাদপত্রে লিখেছেন, দুই খন্ডে 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তির দাবী জানিয়ে গণ দরখাস্ত পেশ করেছেন। কিন্তু আইনের দ্বারা সতীদাহ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে লর্ড বেন্টিঙ্ক যখন রামমোহনের অভিমত জানতে চেয়েছেন, তখন রামমোহন আইনের দ্বারা এই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন।" [দ্রঃ On Rammohan Roy: R.C.Majumder, p. 43]

বেদ বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতা এসব নিয়ে তিনি অনেক ভেবেছেন এবং লিখেছেনও অনেক কিছু। আবার তিনিই বলেছেন আধ্যাত্মিক জ্ঞান শিক্ষাকারী বা সমাজ কারও কোন ব্যবহারিক কাজে আসবে না। বৈদান্তিক তত্ত্ব তাদেরকে সমাজের উপযুক্ত সদস্য করে গড়ে তুলতেও সাহায্য করবে না। [তথ্য : ডঃ ভট্টাচার্য, পৃ. ৭৯]

রামমোহন ফরাসী বিপ্লবকে অভ্যর্থনা জানিয়ে গণতান্ত্রিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। স্পেনে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের জয়ের সংবাদে উল্লসিত হয়ে ভোজসভা দিয়েছেন। ইতালির গণ-বিপ্লবের পরাজয়ে হতাশায় ভেঙে পড়ে শয্যাগ্রহণ করেছেন, "কিন্তু রাজা কখনও ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরোধিতা করেন নি; কিংবা ভারতের জাতীয় স্বাধীনতাব দাবী উত্থাপন করেন নি। বাস্তবিক পক্ষে দেশের স্বাধীনতার প্রতি রামমোহনের অনুরাগ ভারতস্থিত বৃটিশ শাসনের কাছে আত্মসমর্পণের নামান্তর মাত্র। ... রামমোহন মনে করতেন ভারতবর্ষের আরও কিছুকাল ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকা দরকার যাতে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে আরও কিছু লাভ করতে পারে। ইংরেজ সরকারের প্রতি অবিচল আনুগত্য ও অসীম আস্থা প্রকাশ করে রাজা ও তার অনুরাগীরা মনে করেছেন যে, তাঁদের স্বার্থ এদেশে বৃটিশ শাসনের ন্যায় চিরস্থায়ী হবে।" [Arabinda Podder : Renaissance in Bengal, 1800-1860, p. 61-62]

যে সব তথ্য জানলে মানুষ শিউরে উঠবে সেরকম অনেক তত্ত্ব ও তথ্য লুকিয়ে রাখা হয় কিসের স্বার্থে তা অনুমান ও হিসেবের বিষয়। যেমন হয়ত রামমোহন বৃটিশ প্রভুদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সমস্ত ভারতবাসী বিশেষতঃ হিন্দু ভারতবাসীকে খৃষ্টান করে দেবার ব্যবস্থা করবেন তিনি, অদূর ভবিষ্যতে না হলেও সুদূর ভবিষ্যতে তো বটেই। এর প্রমাণে বলা যায়, যখন তাঁর সামনে এ প্রশ্ন আসে : "এদেশে যদি বৃটিশ শাসন চিরস্থায়ী না হয়, যদি ভারতের জনসাধারণ দাসত্ব শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে তাহলে ইংরেজ প্রভুদের স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষিত হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা বলেছেন, ঘটনাক্রমে ভারতবর্ষ বৃটিশ অধীনতা থেকে মুক্ত হলেও তা হবে দুটি খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী দেশের (অর্থাৎ বৃটেন ও ভারত) মধ্যে এবং তাতে বিশেষ সুবিধাজনক বাণিজ্যিক লেনদেনের সম্পর্ক অক্ষুন্ন থাকবে।" [ডঃ ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৮১]

লবণ বা নুন এমন একটি বস্তু যা ধনী গরীব সকলেরই প্রয়োজন। ভারতীয়রা চাহিদার সবটুকু লবণ নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারতেন। বৃটিশ দরদী রামমোহন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ইংলন্ড থেকে লবণ আমদানি করার পরামর্শ দেন। আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার বুদ্ধিটুকুও ইংরেজ সরকারের মাথায় তিনিই ঢুকিয়েছিলেন।

নবাব আলিবর্দী খাঁর আমলে একশো মণ লবণের মূল্য ছিল চল্লিশ থেকে ষাট টাকা। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস লবণের ব্যবসা নিজেদের হাতে নিয়ে আসেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে একশো মণ লবণের দাম হয় একশো সত্তর টাকা। ১৭৭৮-তে হল একশো মণে ৩১২টাকা, ১৮০৩-এ সেটা দাঁড়ালো ৩৪২ টাকায়। বঙ্গদেশে লবণ তৈরির বৃহত্তর কেন্দ্র ছিল মেদিনীপুরের তমলুক ও হিজলী অঞ্চল। সরকারি আইনের পাকে পড়ে ৬০

হাজার গরীব লবণ শ্রমিক বেকার হয়ে গেলেন। তাঁরা প্রত্যেক বছর ২৮ লক্ষ মণ লবণ উৎপাদন করতেন। বহু বেকার লবণ শিল্পী অনাহারে পরিবার পরিজনসহ তিলে তিলে মারা গেছেন। সাহেবদের কমন্স কমিটি রামমোহনকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, বিলেতি লবণ সস্তা দরে বাংলাদেশে আমদানি করা হলে লবণ শিল্পী মালঙ্গীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কিনা। উত্তরে রাজা যা বলেছিলেন তা বড়ই মারাত্মক— "মালঙ্গীদের এখনও অধিক সংখ্যায় সরকার কর্তৃক (যদি সরকারকে ভবিষ্যতে একচেটিয়া লবণ ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হয়) লবণের কারখানায় অথবা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কিছু ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত লবণ শিল্পে নিযুক্ত করা যেতে পারে এবং অবশিষ্টদের কৃষি এবং বাগানের মালি, গৃহভৃত্য ও দিনমজুরের কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে।" স্বাধীন ব্যবসার লবণ শিল্পীরা কিভাবে মালি হয়ে গৃহভৃত্য হয়ে সাহেব ও সাহেবদের দালালদের গোলাম ও শ্রমিকে পরিণত হবে তারজন্য কি চমৎকার পরামর্শ! তখন শ্রমিকদের কিভাবে মজুরী দেওয়া হোত তা রামমোহনের লেখা থেকেও পাওয়া যায়। সেটা এইরকম : শহরের দক্ষ কামার ও ছুতোরদের মাসিক বেতন ১২ টাকা, আর সাধাবণ কাজের লোক মাসিক ৬ টাকা, ভাল রাজমিস্ত্রী ৫ টাকা থেকে ৭ টাকা আর সাধারণ শ্রমিক সাড়ে তিন টাকা থেকে ৪ টাকা, মালি ও কৃষকেরা মাসে ৪ টাকা, পাল্কি বেহারারাও মাসে ৪টাকা। কিন্তু পাড়াগ্রামে মজুরী ছিল আরও কম। [দ্রঃ ঐ, পৃ. ১৬৯]

লবণ আমদানি করার পূর্বেও রামমোহনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বিলেতি লবণ হিন্দুরা তাদের খাবারে ব্যবহার করবে কি না, কারণ খাদ্যের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক আছে। রামমোহন উত্তরে যা বলেছিলেন তা সংক্ষেপে এই : "অল্পসংখ্যক পেশাদার ব্রাহ্মণ ছাড়া ভারতীয়রা তা খুব আনন্দের সঙ্গেই কিনবেন।" এবং যুক্তি দিয়ে সরকারকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইউরোপের তৈরি করা সোডা ওয়াটার ভারতীয়রা ব্যবহার করছে। ইওরোপীয়দের তৈরি করা মদেরও "একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁরা ব্যবহার করে থাকেন।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ১৬৭]

রামমোহন যে শিক্ষিত বৃটিশ সহযোগী দলটি তৈরি করেছিলেন তার মধ্যে প্রথম সারির প্রথম নম্বর ব্যক্তি হচ্ছেন ঠাকুরবাড়ির প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। এঁরা ইংরেজদের এত অন্ধ অনুগত ভক্ত যে, রামমোহনের অন্যতম অনুরাগী প্রসন্নকুমার ঠাকুর বলেছেন, "ভগবান যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি স্বাধীনতা চাও,না ইংরেজের অধীন হয়ে থাকতে চাও, আমি মুক্ত কণ্ঠে ইংরেজের অধীনতাই বর বলে গ্রহণ করবো। [বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড : রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ৪৯৯]

স্বদেশ প্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন বলে তখনকার নেতাদের নামে জয়ঢাক বাজানো হয়, আর আমরা সাধারণ মানুষ তা তৃপ্তির সঙ্গে শুনি ও তা বিশ্বাস করি। কিন্তু "এটা

দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এবং আমরা লজ্জা ও দুঃখের সঙ্গে লিখছি যে, শিক্ষিত দেশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা দেশের কল্যাণ জমিদারদের স্বার্থের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। ভুস্বামী শ্রেণীর অধিকার ও স্বার্থরক্ষার পক্ষে ওকালতি করার অপর নাম হল স্বদেশ প্রেম।" [দ্রঃ The Pesantry of Bengal, R.C.Dutt, p. 2]

মুসলমান রাজা বাদশাহ ও নবাব আমলে লেখাপড়া শেখার যে সব মক্তব মাদ্রাসা বা পাঠাগার ছিল তাতে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ফার্সী, ধর্মভাষা হিসাবে কোরআন শেখার উপযোগী আরবী, মাতৃভাষা, অঙ্ক প্রভৃতি শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। সেগুলো কিন্তু মুসলমান, হরিজন সকলের জন্যই ছিল অবারিত। "গ্রাম্য পাঠশালায় বা মক্তবে যেসব ছাত্র লেখাপড়া শিখতে আসতো তারা সাধারণতঃ স্বল্পবিত্ত জমিদার ব্যবসায়ী এবং অবস্থাপন্ন চাষী ঘরের ছেলে ছিল। অবশ্য নিম্ন স্তরের নমঃশূদ্র ধোপা বাগদী ইত্যাদি শ্রেণীর ছেলেদেরও এসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখার সুযোগ ছিল এবং সেজন্য বিশেষ কোন বাধা ছিল না।"

"টোলে এবং মাদ্রাসায় ঐসব ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন, স্মৃতি, মীমাংসা, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ ইত্যাদি শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা দান করা হোত। তবে টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষা গ্রহণের অধিকারী ছিল একমাত্র ব্রাহ্মণ সন্তানেরা। সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চা একান্তভাবেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখানে অব্রাহ্মণদের কোন প্রবেশাধিকার ছিল না।" [দ্রঃ ঐ, ডঃ ভট্টাচার্য, পৃ. ৯১]

অপ্রকাশিত সত্য এটাই, বৃটিশ আসার পর আর্যতত্ত্ব, বেদতত্ত্ব, প্রাচীনতত্ত্ব, পুঁথি দোঁহা প্রভৃতির বেশির ভাগই সংস্থাপিত হয়েছে ইংরেজের অঙ্গুলিহেলনে। টোল চতুষ্পাঠী প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে বরাবর ছিল এ তথ্য অসত্য। কারণ মুসলিম যুগে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রবেশ যখন অবারিত ছিল তখন নিশ্চয় ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া এখনকার মত তখন মানুষ লেখাপড়ার এত গুরুত্ব জানতেন না বা বুঝতেন না। কিন্তু ইংরেজ আমলে শুধু নদীয়াতেই টোলের সংখ্যা ছিল পঁচিশ। তাছাড়া মিথিলা, বিক্রমপুর, বারানসী প্রভৃতিতেও তা সৃষ্টি হয়েছিল। বিদেশীরা টোলগুলোকে হিন্দুদের অক্সফোর্ডরূপে অভিহিত করেছেন।

রামমোহন ও তার সৃষ্ট ইংরেজ-অনুগত ও অনুসারীরা ইংরাজি ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাছাড়া গোটা দেশকে খৃষ্টান দেশ করতে হলে ইংরাজি ভাষার তো সত্যিই দরকার ছিল! [ক] "রাজা রামমোহন ছিলেন ভারতের বৃটিশ শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থক।" [খ] "ইংরেজ সরকারের প্রতি তিনি অবিচলিত আনুগত্য ও অসীম আস্থা প্রকাশ করে বলেছেন, এদেশে বৃটিশ শাসনের ন্যায় তাঁদের আনুগত্যও চিরস্থায়ী হবে।" [গ] তিনি আরও বলেছেন, "তাঁদের পরম সৌভাগ্য

যে, তাঁরা পরমেশ্বরের করুণায় সমগ্র ইংরেজ জাতির রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছেন এবং ইংলন্ডের রাজা, তাঁর লর্ডগণ ও কমন্স-সভা তাঁদের জন্য আইন প্রণয়নের কর্তা।" [B.B.Majumder, K.D.Nag এবং D.Burman-এর লেখা থেকে উদ্ধৃত]

রামমোহন দেশের তখনকার শিক্ষিত মানুষদেরকে ইংরেজ সরকারের অনুগত করতে সরকারের সহায়ক হয়ে তিনটি পত্রিকা পরিচালনা করতেন। একটি 'ব্রাহ্মনিকাল ম্যাগাজিন' দ্বিতীয়টি 'ব্রাহ্মণ সেবধি' আর একটি 'সম্বাদ কৌমুদী'। ফার্সী জানা পাঠকদের জন্য ফার্সী ভাষার কাগজটি ছিল 'মিরআতুল আখবার' যার অর্থ সম্বাদ দর্পণ।

১৮২২-এ রামমোহন নিজে একটি ইংরেজি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলের 'এ্যাংলো হিন্দুস্কুল' নামেই তাঁর মানসিকতার ইঙ্গিত মেলে। তাছাড়া রামমোহন রেভাঃ আলেকজান্ডার ডাফ্‌কে দিয়ে জেনারেল এসেম্বলী ইনস্টিটিউশন নামে স্কুল তৈরি করিয়েছেন। ঐসব স্কুলে বিত্তবান জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও উচ্চহিন্দু ছাড়া অনুন্নত হরিজনদের শিক্ষালাভের কোন অবকাশই ছিলনা; আর মুসলমান তো সেখানে কল্পনার বাইরে। "ফলে রায়ত কৃষকের সন্তানেরা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হলেন, তাঁরা রয়ে গেলেন চির অন্ধকারে।" পরে তিনটি দল তৈরি হয়। সাহেবদের একদল চান মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, আর একটি দল চান ধর্মীয় ভাষায় শিক্ষা, অপর দলের ইচ্ছা সব ভাষার মাথা খেয়ে শুধু ইংরাজিতেই শিক্ষাদান। ইংরাজি ভাষার দলে ছিলেন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক, মিঃ মেকলে প্রভৃতি খৃষ্টান মিশনারীদের একটি অংশ আর ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন রাজা রামমোহন, প্রিন্স দ্বারকানাথ, রাজা রাধাকান্তদেব, ভবানীচরণ প্রমুখ।

ভারতের মানুষকে সত্যের আলো দেখানো, অনুন্নতকে উন্নত করা, অপাংক্তেয়কে বুকে টেনে নেবার আন্তরিকতার অভাব রামমোহনদের ছিল মনে করে ডঃ বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "কিন্তু সর্বসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার কথা কেউ ভাবতে পারেন নি। ধর্ম প্রচারই বা কত দূর দূরান্তগামী ছিল? রামমোহন এমনকি মহর্ষিও তাঁদের পাল্কিবেহারাকে 'ব্রাহ্ম সমাজে' নেবার বা ব্রাহ্ম করার কথা ভাবতেন কি? তাদের ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর কথা ভাববার প্রশ্নই ওঠেনা।" [দ্রঃ বাংলার নবজাগৃতি : ডঃ বিনয় ঘোষ, পৃ. ৫৬৪]

রামমোহনের বৃটিশ আনুগত্য সীমা পার হয়ে উপছে গিয়েছিল। বৃটিশের অত্যাচারে ১৮০০ থেকে ১৮৫০-এর মধ্যে পরপর সাতটি দুর্ভিক্ষ হয়। আর তাতে ভারতীয় মারা গিয়েছিল ১৫ লাখ। ১৮৫০ থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয় মোট ২৪ টি। তাতে মানুষ মারা গিয়েছিল ২ কোটি। এইসব কথা জেনে নিষ্ঠুর মানুষের মনও নমনীয় হয়ে ওঠে। এমনকি রামমোহনের সাহেব বন্ধু ডঃ মন্টোগোমেরি মনে করতেন যে,

বৃটিশ শাসনের চেয়ে মুসলমান শাসন অনেক ভাল ছিল। তিনি হাত হিসাব করেছিলেন যে, মুসলমান শাসকেরা তাঁদের মত ভারত থেকে কিছু নিয়ে চলে যাননি, সব রেখে গেছেন ভারতে, সেইসঙ্গে তাঁদের দেহও মিশিয়ে দিয়েছিলেন এ দেশের মাটিতেই। তাই তিনি বলেছিলেন,"আমাদের সরকার তো নামেমাত্র খৃষ্টান, কার্যত এ সরকার মুসলমান সরকারের চেয়ে নিকৃষ্ট, ...আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা ভারত থেকে শোষণ করি, বিনিময়ে আমরা কী দিই তাদের? দুর্ভিক্ষ আর মহামারী, মহামারী আর দুর্ভিক্ষ। হাজার হাজার গলিত পচিত শব ভেসে যায় নদীতে, দূষিত বাষ্পে বাতাস বিষাক্ত, জলপান করলে বমি পায়, ৪০ হাজার বর্গমাইল অঞ্চলের লোকজন উজাড়।" [কৃষ্ণ কৃপালিনীঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর; বিস্মৃত পথিকৃৎ, পৃ. ৫০]

শোষকদের নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার স্বার্থে বৃটিশের এত অন্ধভক্তের পরিচয় দিয়েছেন রামমোহন ও তার অনুসারীরা যা জানলে চমকে উঠতে হবে সব চরিত্রবান মানুষকে। মোগল সম্রাটের আমলে ১৭৬৪-'৬৫ সালে অবিভক্ত বঙ্গদেশে ট্যাক্স বা করের পরিমাণ ছিল ১কোটি ২৩ লাখ টাকা। কিন্তু ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার কর আদায় করে ২কোটি ২০ লাখ টাকা। আর ১৭৯৩-এ রামমোহনদের পরামর্শে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন হোল তখন কর আদায়ের পরিমাণ দাড়ালো ৪কোটি ২ লাখ টাকা। [দ্রঃ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (প্রথম খন্ড) পৃ. ১২ এবং ১৬]

রামমোহন ও প্রিন্স প্রমুখের পরামর্শ ছাড়া বৃটিশের কোন নতুন পদক্ষেপ নেওয়া ঐ সময় সহজে সম্ভব ছিলনা। চাষ করা চাষী, যাঁরা ছিলেন জমির মালিক তাঁরাই সরকারের আইনে হয়ে গেলেন ভূমিহীন এবং নতুন জমিদারদের ভৃত্যপ্রায়।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে যে আইন তৈরি করে প্রয়োগ করা হোল তার নমুনা : [ক] জমিদার সরকারি অনুমতি ছাড়াই প্রজাকে বন্দি করতে পারবে। [খ] জমিদার খাজনা আদায় করতে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে কিন্তু প্রজা আদালতে মামলা করতে পারবেনা। [গ] বাকী খাজনা আদায়ের জন্য তাকে তার বাসভিটে থেকে জমিদার উৎখাত করতে পারবে। [ঘ] জমিদার প্রজাকে কাছারীতে ডেকে আনতে বাধ্য করতে পারবে। [ঙ] জমিদারের দৈহিক নির্যাতনের কারণে প্রজা কোন ফৌজদারি মামলা করতে পারবেনা।

ঐ সময়ে মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও নেতাদের অস্তিত্ব না থাকলেও বাবু সমাজ, রাজা, মহারাজা, রায়বাহাদুর, জমিদার, স্বামীজী, বাবাজী, গুরুজী, ঋষি, মহাঋষি কেউ এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে এগিয়ে এলেন না কেন সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

আর একটি অসৎ ব্যবসার বাজার তখন খুবই রমরমা। সেটা হোল দাস ব্যবসা। ওটিকে মোটামুটি আড়াল করে রেখে দিয়েছেন অনেক কলমনবীশ ও ঐতিহাসিকেরা।

কলকাতায় দাসদাসী কেনার বড় হাটে প্রকাশ্য স্থানে শেকলে বাঁধা দাসদাসীদের ব্যবসার পণ্য হিসাবে আনা হোত। অনেক বাবু রাজা মহারাজারা গোলাম বাঁদী কিনে সাহেবদের উপহার দিতেন। অনেক ক্রীতদাসকে পালিয়ে যাওয়ার ভয়ে রাত্রে বন্দি করে রাখা হোত। "অনেক ক্রীতদাসকে খাঁচায় রাত্রিযাপন করতে হোত। সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুতিতে চাবুক দিয়ে তাদের প্রহার করা হোত। তাদের কোন রকমের স্বাধীনতা ছিল না। দাস মালিকদের মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারী সম্পত্তির সঙ্গে গোলামদেরও মালিক হতেন।" [পৃ. ১৭৫, ঐ, ভট্টাচার্য]

তখনকার ক্রীতদাস-দাসীদের বাজার মূল্য ছিল এই রকম। কিশোর ও যুবকের দাম ছিল ২৪ থেকে ১৬০ টাকা। কিশোরী ও যুবতীদের দাম ছিল ১৬ টাকা থেকে ২৪ টাকা মাত্র। আর বালকদের দর ছিল ৪ টাকা থেকে ১৫ টাকা। হাটে গরু মোষ কিনে যেমন নথিভুক্ত করার নিয়ম চালু আছে ঠিক তেমনিভাবে কোর্ট হাউসে জন প্রতি চার টাকা চার আনা ডিউটি দিয়ে গোলামদের রেজিস্ট্রি করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তখনকার খবরের কাগজে পালিয়ে যাওয়া দাসদাসীদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হোত। যেমন একটি উদাহারণে বলা যায়, "গত ২রা জুলাই ১৯৭২ থেকে দিনদারা নামে ১৫ বছরের একটি দাস ছেলে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছে। তার পিঠে ও হাতে অনেকগুলি আগুনে পোড়ার দাগ আছে। পায়ে আছে একটি লোহার বেড়ি। যদি বেড়িটা সে খুলেও ফেলে দেয় তাহলেও তার পায়ে একটা গোলাকার কালো দাগ থাকবে। ... যদি কোন ব্যক্তি তাকে ধরতে পারেন এবং ১ নম্বর লারকিন্স লেনে মালিকের কাছে পৌঁছে দেন, তাহলে তিনি পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাবেন।"

কিশোরী ও মহিলাদের প্রতি যে অত্যাচার করা হোত তা অত্যন্ত নোংরা কুৎসিত ও ভয়াবহ। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি "দাস বাণিজ্য সম্পর্কে একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে ১৭৮৫ সালে স্যার জোন্স বলেছিলেন, আমাদের এখানকার গোলামদের দুরবস্থার কথা আমি কিছু কিছু জানি, এবং তা এতো মর্মান্তিক যে বলতে সংকোচ হয়। গোলামদের উপর প্রতিদিন এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হয় বিশেষ করে বালক ও স্ত্রীলোকদের উপর, যে মর্যাদার দিক থেকে আমি তার কোন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে রাজি নই। ... এই বিরাট জনবহুল কলকাতা শহরে এমন একজনও পুরুষ বা স্ত্রীলোক নেই যার অন্ততঃ একটি গোলাম ছেলে বা মেয়ে নেই। তিনি খুব সামান্য মূল্যেই গোলামটি কিনেছেন এবং খোঁজ করলে দেখা যাবে হয়তো অন্নাভাবের কষ্ট থেকে মুক্তি "বার জন্য এই যাবজ্জীবন দুঃখের বোঝা গোলামটি অনিচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে অনেকেই জানেন নিশ্চয় যে, নদীর উপর দিয়ে নৌকা বোঝাই গোলা

আসা হয় কলকাতার বাজারে বিক্রি করার জন্য। আপনারা এও জানেন যে, এইসব গোলাম ছেলে মেয়েদের অধিকাংশই তাদের বাপ-মার কাছ থেকে চুরি করে আনা হয় অথবা দুর্ভিক্ষের সময় তাদের গোলামির জন্য সামান্য মূল্যে বেচে দেওয়া হয়।" [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দ্রষ্টব্য পৃ. ৫৪৫]

মুসলমান আমল থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত কিছু নিষ্কর জমি ছিল, যার কোন খাজনা লাগতো না। ইংরেজ সরকার যখন কর নির্ধারণ করেন তখন রামমোহন নিজের এবং সমস্ত জমিদার বা শোষকদের স্বার্থে দলবেঁধে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ অর্থাৎ 'আত্মীয়সভা' ও 'ধর্মসভা' সকলে একত্রিত হয়ে ভারতে এবং বিলেতে দরখাস্ত ও প্রতিবাদ করে সরকারকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের পক্ষে আমাদের নেতাদের টুঁ শব্দও পাওয়া যায় নি। তার অন্যতম কারণ এটাও হতে পারে যে, ক্রীতদাস দাসীরা কোন দিন রাজা মহারাজা বাবু শ্রেণীদের টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি করতে পারবে না আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করতেও পারবে না। আর একটি কথা হল, এই লক্ষ লক্ষ সুবিধাভোগী অনুরাগী ও অনুসারীদের অসুবিধায় পড়তে হতো ঐ ব্যবস্থার প্রতিবাদ বা উচ্ছেদ হলে। একথা সত্য যে, প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীতে এই দাস প্রথা প্রচলিত। যীশু, মুসা [আ] হযরত মুহম্মাদ [স] প্রভৃতি প্রত্যেক নবী এবং আম্বিয়াগণ দাসদের সম্পর্কে অনেক আদেশ উপদেশ দিয়ে গেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। ইতিহাসের পাতা থেকে উদাহরণ দেওয়া যায় যে, মুসলিম আমলে রাজা বাদশা বা সুলতানেরা প্রথাগতভাবে দাস কিনতেন। কিন্তু হযরত মুহম্মাদের [স] শিক্ষার ছোঁয়ায় তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন তাঁরা। স্নেহ আদর ও যত্ন দিয়ে লেখাপড়া শেখাতেন। এটা এই জন্যই সম্ভব হোত যে, দাসদাসীদের পশু মনে না করে মানুষ মনে করতেন তাঁরা। তাই দাসকে বড় করে যোগ্য করে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ভারতের দাস বংশ তার স্বর্ণোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হুগলী জেলার খানাকুল থানার রাধানগর গ্রামে জন্মেছিলেন তিনি। তাঁর আগের তিন পুরুষ মুসলমান নবাবদের কৃপাধন্য কর্মচারি ছিলেন। তাঁর প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও নবাবদের আমলে দক্ষ কর্মচারি হিসাবে 'রায়-রায়ান' উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। পিতামহ বজ্রবিনোদ ছিলেন দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের অধীনে নবাব কর্মচারি। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ও মুর্শিদাবাদের নবাবের কর্মচারি ছিলেন। রামমোহনের পিতার কিছুদিন অভাব অনটন চললেও ইংরেজ সরকারের সুনজরে পড়ে গিয়ে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির কাছ থেকে ভুরসুট পরগণার ইজারা পেয়েছিলেন ন' বছরের জন্য। কিন্তু রামমোহনের উন্নতি হয়েছিল নাকি অবনতি, তার মূল্যায়ণ করবেন সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ।

অসাধারণ দ্বারকানাথ

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ বা ঠাকুর্দা হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। এঁদের পূর্বপুরুষ এত দরিদ্র ছিলেন যে, দারিদ্রের কারণে ভাগ্যন্বেষণে একসময় বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল অন্যত্র। এই ঠাকুরবাড়ি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ঠাকুরবাড়ির অন্যান্যদেরও আলোচনা আনা হচ্ছে এর পরেই। এই ঠাকুরবাড়ির মাধ্যমে ভারতবর্ষের হয়েছে মহাকল্যাণ অথবা মহাসর্বনাশ।

দ্বারকানাথ ঠাকুর

দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে এ কথাটা মনে রাখা ভাল যে, রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর ইংরেজ তোষণ, জমিদারি পরিচর্যা, মদ মাংস বিলাসিতা স্ফূর্তি, স্বধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম অবলম্বন ইত্যাদি বিষয়ে মিল ছিল। তবে একটা বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য হোল, রামমোহনের অনুসারী ছিলেন দ্বারকানাথ, দ্বারকানাথের অনুসারী ছিলেন না রামমোহন।

হিন্দু সাহিত্য সংস্কৃতি আর্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন প্রিন্স। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রামমোহনের কাজ ও চিন্তাধারার সঙ্গে সহমত পোষণ করতেন তিনি। রামমোহন এবং প্রিন্স দুজনেই তাঁদের প্রাণপ্রিয় স্থান লন্ডনেই মারা যান। দুজনেরই লন্ডনে সমাধি আছে।

প্রিন্স দ্বারকানাথ বিলেত যাবার পূর্বাহ্নে অনেক ভূস্বামী ও জমিদারদের দেওয়া মানপত্রের উত্তরে বলেছিলেন যে, "সমস্ত পৃথিবীর কাছে তা প্রমাণ করেছে যে, অন্তরানুভূতি ও স্বার্থের দিক দিয়ে ইংলন্ড এবং ভারতবর্ষের ভূস্বামীরা অতি নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত।" [কিশোরীচাঁদ মিত্র : 'দ্বারকানাথ ঠাকুর'-এর দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তৃক অনুবাদ, পৃ. ১২১]

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই লন্ডনের লর্ড মেয়র ম্যানসন হাউসে এক ভোজসভায় দ্বারকানাথকে আপ্যায়ন করেন এবং কিছু কথা বলতে অনুমতি পেয়ে দ্বারকানাথ সকলের সম্মুখে বক্তব্য রাখলেন—"এই ইংলন্ডই পাঠিয়েছিল ক্লাইভ ও কর্ণওয়ালিসকে বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে ভারতের উপকার সাধন করার জন্য। এই ইংলন্ডই সেই সুদূরবর্তী দেশে এমন একজন মহান লোককে পাঠিয়েছিল যিনি পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপন করতে

পেরেছিলেন, যিনি সর্বপ্রথম সেই প্রাচ্যভূমিতে যথাযথ ও চিরস্থায়ী শৃঙ্খলার অবতারণা করতে পেরেছিলেন। এ হোল সেই দেশ, সমবেত সজ্জনেরা যার প্রতিনিধি স্থানীয়, যে দেশ মানবিক মর্যাদার সম্মানে দুবৃত্ত মুসলমানদের যথেচ্ছাচার থেকে তথা রুশীয়দের সন্ত্রাসজনক নিষ্ঠুরতা থেকে তাঁর দেশকে রক্ষা করেছে (উচ্চ হর্ষধ্বনি)। এবং ইংলন্ড এই সব কিছুই করেছে কোন প্রশ্তির আশা না করেই, বিনিময়ে কিছু লাভ করবে বলে নয়। পরন্তু নিছক উপচিকীর্ষার মনোভাব নিয়ে। তাঁর দেশবাসীর পক্ষে ইংলন্ডের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া অসম্ভব।..." [কৃষ্ণ কৃপালিনীঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর : বিস্মৃত পথিকৃৎ, পৃ. ১৯৮]

প্রিন্স ঠাকুর আরও বলেছেন, "ভারতের সুখসমৃদ্ধি বজায় রাখার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হোল, আপনাদের মহান ও যশোমন্ডিত দেশের সঙ্গে যুক্ত থাকা ...। বিধাতার বিধানে যে লক্ষ লক্ষ লোকের কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের দায় আপনাদের উপর বর্তেছে, সে দায়িত্ব পালনে আপনাদের সহৃদয় ব্যাকুলতা সমগ্র পৃথিবীর মুগ্ধ প্রশংসা অর্জনের দাবী রাখে।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ২১৭]

নীলকর সাহেবরা অত্যন্ত জোর ও প্রচন্ড জুলুম করে চাষীদের ধান চাষ বন্ধ করিয়ে নীল চাষ করাতো। এবং নীল চাষ করতে রাজী না হলে তাদের চাবুক মারা, গরু আটকে রাখা, মহিলাদের উপর অত্যাচার, তাদের ঘর ভেঙে এবং আগুন লাগিয়ে দেওয়া প্রভৃতি করে মিথ্যা মোকদ্দমা করে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতো যে অশ্রুপ্লুত নয়নে মনের বিরুদ্ধে দাদন অর্থাৎ চাষের জন্য অগ্রিম ঋণ নিয়ে টিপসই দিতে বাধ্য হোত। ডঃ কুমুদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "নীলযুগের ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায়, উৎকট মুনাফা লালসায় উন্মত্ত নীলকর দানবদের নির্মম উল্লাস আর শোনা যায় অসহায় নীলচাষীদের মৃত্যুকাতর আর্তনাদ। কোথাও নীলকরদের সদর্থক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়না। সেকালের সংবাদপত্রগুলি তার সাক্ষী।"

নীলকর বেইমান সাহেবরা লালসা সামলাতে না পেরে যেমন একটির পর একটি নীল কারখানা বাড়িয়ে তুলেছিল সেখানে ঠাকুরবাড়ির প্রিন্স দ্বারকানাথও অনেকগুলো নীলের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। সারা দেশ যখন নীলকর ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের নিন্দা করতে লাগলো, তখন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকায় তিনি লিখলেন, "এদেশে যাঁর ভূসম্পত্তি আছে এবং যিনি নিজে তাঁর জমিদারি দেখাশোনা করেন তাঁরই কাছে একথা সুবিদিত যে, নীল চাষের জন্য কি বিরাট পরিমাণ পতিত জমিতে আবাদ হয়েছে এবং নীল চাষের মালিকরা যে দেশ জুড়ে টাকা ছড়াচ্ছেন তাতে দেশের নিম্ন শ্রেণীরা কেমন স্বচ্ছন্দে দিনপাত করছে। আগেকার

দিনে যেসব চাষী জমিদারের জবরদস্তিতে বিনামূল্যে বা অল্পপরিমাণ ধানের বিনিময়ে কাজ করতে বাধ্য হোত তারা এখন নীলকরদের আওতায় খানিকটা স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছল্য ভোগ করছে। তারা প্রত্যেকেই নীলকরদের কাছ থেকে মাসিক চারটাকা বেতন পাচ্ছে এবং অনেক মধ্যবিত্ত যারা নিজেকে ও পরিবারকে প্রতিপালন করতে পারতো না তারা নীলকরদের দ্বারা উঁচু বেতনে সরকার প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হচ্ছে। এখন তারা জমিদারের বা বেনিয়ার খামখেয়ালি ও মর্জি দ্বারা নির্যাতিত হয়না।" [দ্রঃ সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারতের শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন, পৃ. ১৯]

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে লুণ্ঠনকারী বৃটিশদের যেখানে ২৭১টি নীল কারখানা ছিল সেখানে প্রিন্সের তো দেশীয় কালো সাহেবদেরও ছিল ১৪০টি নীল কারখানা। [তথ্য : প্রমোদ সেনগুপ্ত : নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ, পৃ. ৬]

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় ঠাকুরবাড়ির প্রিন্স লিখলেন একটি বক্তব্য। উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯-এ লন্ডনে কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে একটি রিপোর্ট পাঠাতে বলেন প্রিন্সকে। তখন প্রিন্স ঐ বছরের ৩০শে মে যে রিপোর্টটি পাঠালেন তাতে লেখা ছিল, "আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, নীলকরেরা যে উপকার চারিদিকে বিস্তার করেছে তার তুলনায় তাদের ক্বচিৎ দুর্ব্যবহার ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কৃষি ব্যাপারে জেলাগুলির যা উন্নতি সাধিত হয়েছে তার বেশিরভাগই সেখানকার নীলকরদের দ্বারা সাধিত হয়েছে। সাধারণভাবে একথা সত্য বলে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেক নীল কারখানা উন্নতির কেন্দ্র। যে লোক নীলের কারখানায় কাজ করে তাদেরও আশেপাশের লোকদের উন্নতি সাধন করে নীলের কারখানা।" [দ্রঃ সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐ বই, পৃ. ৬৮-৬৯]

১৮২৯-এর ১৫ই ডিসেম্বরে টাউন হলের সভায় দ্বারকানাথ বললেন, "আমি দেখেছি, নীলের চাষ ও ইওরোপীয়দের বসবাস দেশের ও দেশের সমস্ত শ্রেণীর লোকের প্রভূত উপকার সাধন করেছে। জমিদারেরা ধনী হয়েছেন ও উন্নতি করেছেন চাষীদের অবস্থাও অনেক উন্নত হয়েছে। যেসব জায়গায় নীলের চাষ নেই ও নীলের কারখানা নেই সেইসব জায়গার অধিবাসীদের চেয়ে তাদের অবস্থা অনেক ভাল হয়েছে। নীলের চাষ যেখানে হচ্ছে তার কাছাকাছি জায়গায় জমির দাম বেড়ে গেছে ও চাষবাসেরও খুব দ্রুত উন্নতি হয়েছে।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ৭৮]

ইয়ং বেঙ্গলের আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত তরুণদের পক্ষে এইসব লেখা ও কথা বরদাস্ত করা কঠিন হয়ে পড়ছিল, তাই তাঁরা 'ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় ১৮৩০-এর ১২ই ফেব্রুয়ারি এইসব জনদরদী নেতার মুখোশ খুলে দিয়ে লিখেছিলেন, "ইওরোপীয়গণ ভারতে আসিয়াই

এদেশের লোকের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। নানাজাতীয় মদ্য-রাম-জিন-ব্রান্ডি ও আধুনিক সভ্যতার অনুরূপ অন্যান্য উপকরণ আমদানি করিয়া কিরূপ অল্পসময়ের মধ্যে তাঁহারা এই বর্বর জাতিকে সভ্য করিয়া তুলিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।" [বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড, রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ১৩৭]

প্রিন্স যা-ই বলুন না কেন, প্রিন্সের কথা আর একটু যাচাই করতে সরকার রামমোহনের মন্তব্য জানতে চাইলে রামমোহন বললেন, "...আমি দেখেছি যে, নীলকুঠির আশেপাশের বাসিন্দারা নীলকুঠি থেকে দূরের জায়গার লোকেদের চেয়ে ভাল কাপড় পরে ও ভাল অবস্থায় বাস করে। নীলকরেরা আংশিক ভাবে ক্ষতি করে থাকতে পারে কিন্তু সবদিক বিচার করে বলা যেতে পারে যে, সরকারি ও বেসরকারি সবশ্রেণীর ইওরোপীয়দের চেয়ে এই নীলকরেরা এদেশে সাধারণ লোকের অনেক বেশী উপকার করেছে।" [তথ্য : The English Works of Raja Rammohan Roy, Edited by K.D.Nag and D.Burman Part (IV), p.83].

বৃটিশের কাছে সর্বপ্রকার যোগাযোগ রক্ষা, সাহায্য ভিক্ষা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সংবাদ পরিবেশন প্রভৃতি নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালনে গঠন করা হয়েছিল Land Holders Society । তার প্রাণপুরুষ ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রিন্স এবং ঠাকুরবাড়ীর বিলাসিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, সাধারণ মানুষ মুখে মুখে গানের মত বলতেন:

বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি কাঁটার ঝনঝনি,
খানা খাওয়ার কি মজা আমরা তাহার কি জানি,
জানেন ঠাকুর কোম্পানি।

প্রিন্সের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "যখন এখানে গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড ছিলেন তখন আমাদের বেলগাছিয়ার বাগানে অসামান্য সমারোহে গভর্নর জেনারেলের ভগিনী মিস্ ইডেন প্রভৃতি অতি প্রধান প্রধান বিবি ও সাহেবদিগের এক ভোজ হয়। রূপে, গুণে, পদে, সৌন্দর্যে, নৃত্যে,মদ্যে,আলোকে বাগান একবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল।" [দ্রঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা আত্মজীবনী, পৃ. ৩৯]

প্রিন্সের বাগানবাড়ির বর্ণনা দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের লেখা Memoir of Dwarakanath Tagore গ্রন্থে আছে যার অনুবাদ করেছেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। সেখান থেকে উদ্ধৃত করেছেন ডঃ ভট্টাচার্য—"এবাড়ীর সুপ্রশস্ত বৈঠকখানা এমন রীতিতে সজ্জিত হয়েছিল যা সে যুগে দুর্লভ। ভিলার শিল্পশালার দেওয়ালগুলো ছিল আধুনিক শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনে অলঙ্কৃত। এর কারণ স্বরূপ বলা যায়, এর মালিক ছিলেন চিত্র এবং ভাস্কর্য বিচারে যথার্থ

অভিজ্ঞ। বৈঠকখানার পিছনে ঝকমক করতো মার্বেল পাথরের বাঁধানো ফোয়ারা। তার উপরে ছিল কিউপিডের একটি মূর্তি। মতিঝিলের মাঝখানে ছিল একটি দ্বীপ, দ্বীপের উপরে একটি গ্রীষ্মাবাস। একটি ঝোলানো লোহার সেতু ও একটি হাল্কা কাঠের সেতুর সাহয্যে গ্রীষ্মাবাসটি মূল বাগানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এ গ্রীষ্মাবাস ছিল আমোদ প্রমোদের কেন্দ্র। পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত হলেও বেলগাছিয়া ভিলাকে বলা চলতো কলকাতার ওয়েস্টএন্ড বা কেনসিংটন। এখানে দ্বারকানাথ অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন। বলতে কি, বেলগাছিয়া ভিলার উৎসবগুলোর তো বিলাসবহুল ও জমকালো উৎসব সে যুগে কমই হোত । অভ্যাগতদের জন্য যে রান্না হোত তার প্রণালী ছিল অতুলনীয়। আভিজাত্যে ও শ্রেণী মর্যাদায় অতিথিরাও হতেন অনন্য। খাদ্য তালিকায় থাকতো ফরাসী ও প্রাচ্য দেশীয় খাদ্যের অফুরন্ত বৈচিত্র। তাদের মধ্যে অবশ্য সবচাইতে কদর ছিল কাবাব, পোলাও হোসেনির। মদ আমদানি করা হোত সোজা য়ুরোপ থেকে। আর দ্রাক্ষা মদিরার মধ্যে সেগুলো ছিল সেরা জাতের। ... কাউন্সিলের সদস্যরা এবং সুপ্রীম কোর্টের জজরাও দ্বারকানাথের আতিথ্য গ্রহণ করতেন। আর আসতেন বিভাগীয় জেনারেলগণ আর পরগণার জমিদাররা। এধরনের ভোজসভায় পুরনো সিভিলিয়ানরা ভোগক্লান্ত সামরিক কর্মচারীরা তরুণ সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করতেন।... বেলগাছিয়া ভিলাই ছিল সে যুগের একমাত্র ব্যক্তিগত বাগানবাড়ি বা একমাত্র স্থান যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর য়ুরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকেরা মিলিত হতেন, মেলামেশা করতেন স্বচ্ছন্দ অন্তরঙ্গতায়। ... সে যুগে সমাজের নেতৃস্থানীয়া মহামাননীয়া মিস্ ইডেনের উদ্দেশ্যে দ্বারকানাথ এখানে একটি নৈশভোজ ও নৃত্যোৎসবের আয়োজন করেন।... এ উৎসব উপলক্ষে কক্ষগুলো করা হয়েছিল আলোকোদ্ভাসিত। দর্পণের প্রতিবিম্বে উজ্জল। মির্জাপুর কার্পেট ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল কক্ষে কক্ষে। বুটিদার রক্তিমাভ কাপড় এবং সবুজ সিল্কের সমারোহে কক্ষগুলোর উৎসব সজ্জিত রূপ ছিল অনিন্দ্য। টেবিলগুলোর উপরের আচ্ছাদন ছিল শ্বেতপাথরের। তাতে শোভা পাচ্ছিল বর্ণ বৈচিত্রময় পুষ্পস্তবক। দুষ্পাপ্য বহু অর্কিড বিচিত্রভাবে শোভিত ছোট ছোট ঝোপ ও লতাপাতা দিয়ে সাজানো হয়েছিল সিঁড়ি বারান্দা বৈঠকখানা এবং কেন্দ্রস্থিত প্রশস্ত হলঘর। গ্রীষ্মাবাস এবং ঝুলন্ত সেতুটিকে সজ্জিত করা হয়েছিল লতাপাতা পুষ্প দেওদার পাতা ও বহুবর্ণ বিচিত্র পতাকা দিয়ে। প্রাঙ্গন এবং জল সরবরাহের কেন্দ্রটিকে আলোকোজ্জ্বল করা হয়েছিল হাজার হাজার অলঙ্কৃত বাতি দিয়ে। সেকালের জনৈক লেখক উৎসবস্থানটির বর্ণনা করেছেন ইন্দ্রপুরীর উৎসব বলে। হলঘরটি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল মধুর সংগীতে। বহু রাত্রি পর্যন্ত উৎসবে নৃত্য চলেছিল সমানভাবে। সেদিনের রাত্রির মত এত চমৎকার বাজী পোড়ানো ভিলায় আর দেখা যায়নি।" [পৃ. ৬৪-৬৫]

"এদেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের সময় থেকেই ঠাকুরবাড়ির সৌভাগ্যের সূত্রপাত। শুরু থেকেই তা যুক্ত হয়েছিল ভারতে বৃটিশ শক্তির আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে।" [কৃষ্ণ কৃপালিনী, ঐ, পৃ. ১৭]

"রামমোহনের মত দ্বারকানাথও তেজারতি কারবার করেছেন, জমিদারি কিনেছেন, জমিদারির আয় থেকেই তাঁর তেজারতি ব্যবসার পত্তন।" তাছাড়া 'প্রথম ভারতীয় চায়ের আবির্ভাব ১৮৩৯ সালে।' আর পৃথিবীতে প্রথম চা কোম্পানী ওই সালেই প্রতিষ্ঠিত। সেই আসাম টি কোম্পানিও ছিল প্রিন্স দ্বারকানাথের। [ঐ, পৃ. ৮৮]

"আবার তেজারতি কারবার থেকে লব্ধ টাকা কেবল যে তেজারতি কারবারে নিয়োগ করতেন এমন নয়, খাজনার কিস্তি খেলাপের জন্য যখনই কোন জমিদারি সুবিধামত দরে নিলামে উঠতো তিনি অমনি তা কিনে নিতেন।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ৫০]

নীতি ও বুদ্ধি বিচারের দিক দিয়ে রামমোহন ছিলেন তাঁর গুরু। গরীবের রক্ত শোষণ করা অর্থে প্রিন্সের এই প্রাচুর্যের পূর্বে তিনি ছিলেন মাত্র দেড়শো টাকা বেতনের সাহেব ট্রেভর প্লাউডেনের চাকর মাত্র। [তথ্য : ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৮২]

কিছু আধুনিকবাদীদের কাছে যেটা অমার্জনীয় অপরাধ, দেশ ও দেশবাসীর কাছে বেইমানি— তা হোল, বাবু জমিদার রাজা মহারাজা সমাজের নবউত্থিত নেতা ও প্রতিনিধি রাজা রামমোহন রায় এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে ইংরেজ জাতি স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই লন্ডনের পত্রিকায় তাঁরা ভারতে বাস করলে সুবিধা অসুবিধার কথা প্রকাশ করেন। তাতে রামমোহন পাঁচটি যুক্তি দেখিয়ে একটু আধটু অসুবিধার কথা জানালেও নটি যুক্তি দিয়ে ভারতে ইংরেজ থাকার সুবিধাগুলো বর্ণনা করেন। সুবিধা ও অসুবিধার দুটি উদাহরণ উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ ইওরোপীয়দের জ্ঞান বিজ্ঞান, মূলধন দেশের কৃষিকার্যে নিয়োজিত হলে, যেমন নীলচাষে হয়েছে তাতে ভারতীয়দের উপকার হবে। একটু আধটু অসুবিধার কথায় এদেশের আবহাওয়া অনেকের জন্য বিরূপ হতে পারে।

"ইংলন্ডে ভারতীয় অর্থ পাচারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল এজেন্সী হাউসগুলি। এই হাউসগুলির মধ্যে ম্যাকিন্টস এন্ড কোং-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য হাউসের মত এই হাউসের মূলধনও গড়ে উঠেছিল কোম্পানীর কর্মচারী ও দেশের ধনিকদের টাকায়। এই হাউসে ভারতীয় অংশীদারদের ১০৯৬৩০০০ টাকা এবং ইওরোপীয় অংশীদারদের ৯৫২৪৭০০ টাকা ছিল। এই কোম্পানীর সঙ্গেও রাজা রামমোহন জড়িত ছিলেন।" [দ্রঃ কুমুদ ভট্টাচার্য : রামমোহন-ডিরোজিও : মূল্যায়ন (২য় সংস্করণ), পৃ. ৫৭]

একটা কথা মনে রাখলে সুবিধা হবে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনি বা বিলেতের সাহেবদের যে কোন ভাবেই ভারতে মূলধন যোগ হয়েছে সেই মূলধন তাঁরা তাঁদের স্বদেশ থেকে আনেননি। তাঁরা তা সংগ্রহ করেছেন এদেশের অনুন্নত নির্যাতিত নিষ্পেষিত। বিশেষতঃ চাষী ও শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সম্মানে সত্য তথ্য বা সঠিক ইতিহাস যত লুকিয়েই রাখি না কেন কবির পিতার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরদের রুজি রোজগার যে সমাজবিরোধী অবৈধ ও অসৎ উপায়ে করা হয়েছিল তা কিন্তু ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত। দ্বারকানাথ স্বয়ং দু-একটি নয়, কতকগুলো বেশ্যাখানা পরিচালনা করতেন। ওটা ছিল অর্থ আমদানির অন্যতম উৎস। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা, দ্বারকানাথ ঠাকুরের তেতাল্লিশটা বেশ্যালয় ছিল কলকাতাতেই।" এত উপার্জন করেও দ্বারকানাথ ঠাকুরের আশা মেটেনি। মদের ব্যবসা শুরু করলেন। প্রচুর অর্থ কামিয়েছিলেন তাতে। আবার নতুন ব্যবসা শুরু করলেন আফিমের। আফিমে নেশাগ্রস্ত হয়ে দেশের লোকের সর্বনাশ হলেও তাতে কিছু এসে যেতনা তাঁর। আর ছিল ঘোড়ার রেস খেলা। তাতেও ভালো উপার্জনই হয়েছিল তাঁর। আর একটি রোজগারের বড় উৎস ছিল বিপদগ্রস্ত লোকদের হিতাকাঙ্খি সেজে মামলা মোকদ্দমার তদ্বির করা। চব্বিশ পরগণার সল্ট এজেন্টও ছিলেন তিনি। তাতেও ভালো আয় হয় তাঁর। তারপর হয়েছিলেন সেরেস্তাদার এবং পদোন্নতির ফলে হন দেওয়ান। এসবই ছিল তাঁর সংসারে আর্থিক মধুবর্ষণ। উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি : "অতএব মদের ব্যবসায় নামলেন রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা। কিছুদিনের মধ্যে আফিং-এর বাণিজ্যেও হাত পাকালেন এবং বাজিমাত করতেন কুরুচির রেসে। ঘোড়দৌড়ে একটা রুপোর কাপ দিলেন একবার দ্বারকানাথ। শীতকালের বাজার। কলকাতার ঘোড়দৌড় জমে উঠেছে। দ্বারকানাথের টাকা উড়ছে সেখানে।... মামলাবাজ বাবুদের সুপরামর্শ দিয়ে ভালই কামাতেন দ্বারকানাথ। এছাড়া ছিলেন ২৪ পরগণার সল্ট এজেন্ট এবং সেরেস্তাদার।" [দ্রষ্টব্য আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে কার্তিক ১৪০৬]

অনন্য রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ি

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১-তে জন্মে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। প্রচারিত ও প্রচলিত ইতিহাস সকলেরই জানা যে, তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, কলকাতায় ঠাকুর পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন মহর্ষি। বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন 'গীতাঞ্জলি' লিখে। পেয়েছিলেন নাইট উপাধি ও নোবেল প্রাইজ প্রভৃতি। বাল্যকাল থেকেই তিনি কবিতা রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাছাড়া সাহিত্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, চিত্রাঙ্কন, নৃত্য সবেতেই তিনি ছিলেন সফল ও সার্থক। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাবা মহা-ঋষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দশ সন্তান। তাঁর পিতামহ ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, যাঁর আলোচনা পূর্বেই হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথও দ্বারকানাথের মত ছিলেন জাঁদরেল জমিদার। রবীন্দ্রনাথ জমিদারও ছিলেন, সেই সঙ্গে ছিলেন প্রখ্যাত প্রতিভাবান কবি ও শিল্পী। তবে জমিদার হিসাবে তাঁর ওজনের চেয়ে কবি হিসাবে তাঁর ওজন ছিল অনেক বেশি।

কলকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথের পিতা নীলমণি ঠাকুর। তিনি প্রথমে ইংরেজদের অধীনে চাকরি করে সাহেবদের সুনজরে পড়েন এবং উন্নতির দরজা খুলতে থাকে ক্রমে ক্রমে। এঁরা কিন্তু বরাবরই ঠাকুর পদবিধারী নন, পূর্বে এঁরা ছিলেন কুশারী। পূর্বপুরুষ পঞ্চানন কুশারী যখন শ্রমিকের কাজ করতেন তখন তাঁকে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ঠাকুর মশাই বলতেন। ঐ 'ঠাকুর মশাই' থেকেই 'ঠাকুর' পদবির সৃষ্টি।

নীলমণির জ্যেষ্ঠ পুত্র রামলোচন ছিলেন সন্তানহীন। পত্নী অলকা সুন্দরীর সম্মতিতে রামলোচন তাঁর মধ্যম ভ্রাতা রামমণির দ্বিতীয় পুত্রকে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করেন। সেই দত্তক পুত্রের নাম দ্বারকানাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন খুবই সাধারণ অখ্যাত মানুষ। তাঁদের নামগুলোও ছিল অত্যন্ত মামুলি এবং আড়ম্বরবিহীন। যেমন কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব। কামদেব ও জয়দেব হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে গিয়ে তাঁদের নাম হয়েছিল যথাক্রমে কামালুদ্দিন ও জামালুদ্দিন। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের বংশকে একটা কলঙ্ক (?) বহন করতে হয় যে, ব্রাহ্মণ হলেও (পীর-ওলি থেকে) তাঁরা 'পীরালি' ব্রাহ্মণ। সেই যন্ত্রণা দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ— কমবেশি ভোগ করতে হয়েছে সকলকেই।

দ্বারকানাথ ইংরেজি শিক্ষিত আইন পড়া এবং খুবই বিষয়ী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজেদের আখের গোছাবার জন্য হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে রামমোহনের ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে প্রচারিত হলেও হিন্দুদের বহু দেবদেবীর মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্র দেবতার নাম ঠাকুরবাড়ির প্রত্যেক ছেলের নামের সঙ্গেই যোগ হয়েছিল। আর কন্যা সন্তানদের প্রত্যেকের নামেও 'দেবী' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধেই সৃষ্টি হয়েছিল ব্রাহ্ম ধর্ম। সেই হিন্দু ধর্মের ইন্দ্র তাঁদের প্রত্যেকের নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়া একটি উল্লেখযোগ্য রহস্য। যেমন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্ণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুধেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শুভেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীতিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। আর ঠাকুরবাড়ির দেবীদের মধ্যে দিগম্বরী দেবী, যোগমায়া দেবী, ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী, কাদম্বিনী দেবী, কাদম্বরী দেবী, কুমুদিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, বিনয়নী দেবী, সুনয়নী দেবী, প্রতিমা দেবী, বীণাপাণি দেবী, সারদা দেবী, সৌদামিনী দেবী, সুকুমারী দেবী, শরৎকুমারী দেবী, বর্ণকুমারী দেবী, মৃণালিনী দেবী, সুশীলা দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, উর্মিলা দেবী, মাধুরীলতা দেবী, রেণুকা দেবী, মীরা দেবী, প্রতিমা দেবী, নন্দিতা দেবী, কৃষ্ণ কৃপালিনী দেবী, সাহানা দেবী, সুশীলা দেবী, চারুবালা দেবী, শ্রীমতী দেবী, অলকা দেবী, ইরাবতী দেবী, ইন্দিরা দেবী প্রভৃতি কন্যা ও বধূদের নাম উল্লেখযোগ্য।

ঠাকুরবাড়ির জামাতাদের মধ্যে যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, নীলকমল মুখোপাধ্যায়, শেমেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়, রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, জানকীনাথ ঘোষাল, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নিত্যরঞ্জন

মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁদের নামগুলো উল্লেখ করার কারণ হোল, যে ঠাকুরবাড়ির ভারত তথা বিশ্বজোড়া খ্যাতি সেই বাড়ির ধর্মাবলম্বী অধিকাংশ পাত্র পাত্রীদের সঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্মীদের বাদ দিয়ে বেছে বেছে কুলীন ব্রাহ্মণ বংশ থেকে পাত্র পাত্রী সংগ্রহ করা হয়েছে। আমাদের মতো রবীন্দ্রভক্তেরা চোখবুজে এটা হজম করলেও নিরেপক্ষ এবং রবীন্দ্র বিরোধীরা এটাকে প্রতারণা বললে উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে হিন্দু ধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা করতেই ব্রাহ্ম সমাজ সৃষ্ট হয়েছিল।

জমিদারদের অত্যাচার অনাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার কথা লেখা হয়েছে পূর্বেই। আধুনিক অনেকগবেষকদের মতে, ঠাকুরবাড়ির জমিদারেরাও তার ব্যতিক্রম নন। জমিদারদের বড়দেবতা হোল অর্থ ও স্বার্থ। অর্থ আর স্বার্থ লাভ করতে ঠাকুর পরিবারের জমিদার হিসাবে দুর্নামের কালো দিক আড়াল করে রাখলেও প্রকৃত ইতিহাসের পাতা থেকে তা মোছা যাবেনা। "ঠাকুর পরিবারের এই মহর্ষি-জমিদারের প্রতি কটাক্ষ করে হরিনাথ লিখেছেন, 'ধর্মমন্দিরে ধর্মালোচনা আর বাহিরে আসিয়া মনুষ্য শরীরে পাদুকা প্রহার একথা আর গোপন করিতে পারিনা'।" [অশোক চট্টোপাধ্যায় : প্রাক্ বৃটিশ ভারতীয় সমাজ, পৃ. ১২৭, ১৯৮৮]

"প্রজা অত্যাচারের ক্ষেত্রে— এই ক্ষেত্রে এই 'মহর্ষি'রা যে কত নির্মম তা বোধহয়, সে সময় একমাত্র হরিনাথের পক্ষেই এমন করে বর্ণনা করা সম্ভব ছিল, আর কারও পক্ষে নয়।" [ঐ, পৃ. ১২৭]

হরিনাথ হচ্ছেন ভুক্তভোগী, অত্যাচারিত, নির্ভীক সাংবাদিক। তিনি তখনকার 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় এসব প্রকাশ করেছিলেন সদর্পে। হরিনাথ লিখেছেন, "ইত্যাদি নানা প্রকার অত্যাচার দেখিয়া বোধ হইল পুষ্করিনী প্রভৃতি জলাশয়স্থ মৎস্যের যেমন মা বাপ নাই; পশুপক্ষী ও মানুষ, যে জন্তু যে প্রকারে পারে মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করে, তদ্রুপ প্রজার স্বত্ত্ব হরণ করিতে সাধারণ মনুষ্য দূরে থাকুক যাঁহারা যোগী ঋষি ও মহা বৈষ্ণব বলিয়া সংবাদপত্র ও সভাসমিতিতে প্রসিদ্ধ, তাঁহারাও ক্ষুৎক্ষামোদর।" [কাঙাল হরিনাথের 'অপ্রকাশিত ডায়েরী', চতুষ্কোণ, আষাঢ়, ১৩৭১]

এই মহর্ষিদের সঙ্গে অফিসার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা ম্যাজিস্ট্রেটদের এমনই যোগাযোগ ছিল যে এঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন পদক্ষেপ তখনকার অফিসাররা নিতে পারতেন না। হরিনাথের এই সংবাদ প্রকাশ হবার পর লেফটেন্যান্ট গভর্নর ক্যাম্বেল সাহেব তদন্ত করে জানলেন যে ঘটনাটি সত্যই। তখন তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে বদলি করে দিলেন। [তথ্য: অশোক চট্টোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ১২৮]

"এর প্রেক্ষিতে সিরাজগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বদলির আদেশ হয়েছিল এবং যে যে জমিদার উপরের আবরণের গুণে তপস্বী বলিয়া গভর্নমেন্টে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা যে বিড়াল তপস্যী তা প্রমাণিত হয়েছিল। এসবের ফলশ্রুতিতে হরিনাথকে ঐ জমিদারের বিষনজরে পড়তে হয়েছিল।" [অশোক চট্টোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ১২৮]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই সময়কার পত্রিকাগুলো জমিদারদের সাহায্য ও সহযোগিতা ভোগ করতো বলে সেগুলো জমিদারদের পক্ষেই লিখতো, আর জমিদারদের দোষগুলোকে শুধু চেপে যেত তাই নয়, বরং সেগুলোকে বিপরীত সংবাদে পরিণত করতো। 'হিন্দু রঞ্জিকা', 'হিন্দু হিতৈষিণী', 'দেশ হিতৈষিণী' প্রভৃতি পত্রিকা এই বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে জমিদারদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। প্রজাদের পক্ষ থেকে সংঘটিত অত্যাচারের অলীক কল্পকথা রচনা করে এরা এই বিদ্রোহের জন্য জমিদারদের দায়ী না করে যাবতীয় দায়দায়িত্ব প্রজাদের ওপর চাপিয়েছিল। আর এদের পান্ডা হিসাবে কাজ করেছিল অমৃতবাজার পত্রিকা। যার সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ নীলবিদ্রোহের সময় প্রচণ্ড রকম প্রজাভীতি দেখিয়েছিলেন, এবং পাবনা কৃষক বিদ্রোহের সময় তিনি একেবারে বিপরীত অবস্থান নিয়ে জমিদারদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন সক্রিয়ভাবে— 'Thousands of ryots have combined togather and risen against their zemindars, plundering and devastating everything in their way. The life, property and honour of the people are in imminent danger.' (Amrita Bazar Patrika, 26.6.1873) ইংলিশম্যান, হেরল্ড, বেঙ্গল হরকরা, আপার ইণ্ডিয়া গেজেট, বঙ্গদূত, সুধাকর— এই পত্রিকাগুলোও ঠাকুরবাড়ির হাতের মুঠোয় ছিল; কারণ ওগুলো ছিল ঠাকুরবাড়ির সাহায্যপুষ্ট। [তথ্য: ডঃ বিনয় ঘোষ : সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৩১৮-১৯]

জমিদারদের অত্যাচারই যে বিদ্রোহী হতে বাধ্য করেছে, একথা অস্বীকার করে জমিদারতোষক শিশির কুমার ঘোষ প্রজাদের ন্যায়সঙ্গতাকে বিরোধিতা করে তাদের দাঙ্গাবাজ, লুটেরা প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করে জনসমর্থন থেকে তাদের বঞ্চিত করার

সুচতুর রাজনীতি করেছিলেন। এমনকি এই বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িকতার বহিঃপ্রকাশ বলেও চালানো হয়েছিল। 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও এই কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর অংশীদার হয়ে লিখেছিলেন, 'সিরাজগঞ্জ প্রদেশের ৪/৫ হাজার দুর্দান্ত প্রজা একত্র দলবদ্ধ হইয়া ভদ্রলোকদিগের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াছে। কুলকামিনীগণের সতীত্ব হরণ, দেবমূর্তি চূর্ণীকরণ প্রভৃতি ইহাদের নিত্যকর্মের মধ্যে গণ্য।' তথ্যের জন্য ১৪.৭.১৮৭৩-এর সোমপ্রকাশ দ্রষ্টব্য।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা লিখেছিল, "যে বদমায়েশেরা এই পলাশী বিদ্রোহের নেতা, তারা এই বিদ্রোহের সুযোগে অবাধ লুণ্ঠন ও হিংসামূলক কাজ চালিয়েছে এবং এই জঘন্য কাজে সরল ও অসহায় প্রজাদের যোগ দিতে বাধ্য করেছে।" [দ্রঃ ঐ, ১৪.৭.১৮৭৩ সংখ্যা]

ঐতিহাসিক মিঃ বাকল্যান্ড ঐ পত্রিকাগুলোর বানানো সংবাদগুলোকে মিথ্যা বলে নাকচ করে দিয়েছিলেন। [তথ্য : C.E. Buckland : Bengal under Lt. Governors, vol.I. p. 544]

প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে ঠাকুরবাড়ির অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার বিক্ষিপ্ত চেষ্টা করলে তা ব্যর্থ হয়। ঠাকুরবাড়ি থেকে বৃটিশ সরকারকে জানানো হোল যে, একদল শিখ বা পাঞ্জাবী প্রহরী পাঠাবার ব্যবস্থা করা হোক। মঞ্জুর হোল সঙ্গে সঙ্গে। সশস্ত্র শিখ প্রহরী দিয়ে ঠাকুরবাড়ি রক্ষা করা হোল আর কঠিনহাতে নির্মম পদ্ধতিতে বর্ধিত কর আদায় করাও সম্ভব হোল। ঠাকুরবাড়ির জন্য শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "অথচ এরাও কৃষকদের উপর থার্ড ডিগ্রি (প্রচন্ড প্রহার) প্রয়োগ করতে পিছপা হননি, কর ভার চাপানোর প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন, পরন্তু ভয় দেখিয়ে কর আদায়ের জন্য এবং বিদ্রোহীদের মোকাবেলার জন্য একদল শিখ প্রহরী নিযুক্ত করেছিলেন"। [দ্রঃ চট্টোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২]

স্বপন বসুও লিখেছেন, "সে সময়ে সাজাদপুরের অবস্থা সম্পূর্ণ শান্ত ও হিংসাত্মক ঘটনার অনুপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও জমিদারি রক্ষা করার জন্য কলকাতা থেকে সাজাদপুরে একদল পাঞ্জাবীকে সশস্ত্র পাহারাদারির জন্য পাঠান দ্বিজেন্দ্রনাথ (ইনি কবির সহোদর ভ্রাতা)।" [তথ্য : গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ : শ্রীস্বপন বসু, পৃ. ১৬৫]

জমিদারদের বিশেষতঃ ঠাকুরবাড়ির নেতাদের মারাত্মক ও প্রচন্ড প্রভাবের প্রমাণে বলা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বৌদির মৃত্যুর কথা সর্বজনবিদিত। কারও ধারণা বিষ খাইয়ে হত্যা, কারও ধারণা স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা। আত্মহত্যাই যদি ধরে

নেওয়া হয় তাহলে আশ্চর্যজনক দুটি জিনিস সামনে আসে। তা হোল, ইংরেজ আমলেও ঐ মৃতদেহ নিয়ে যাবার ক্ষমতা পুলিশের হয়নি। মহর্ষির আদেশে প্রশাসনকে তাঁর প্রাসাদেই আসতে হয়েছিল এবং রিপোর্টে বলতে হয়েছিল যে, স্বাভাবিক মৃত্যু। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল হোল কাদম্বরীর আত্মহত্যার তারিখ। ঐ সময় দেশে যত পত্রপত্রিকা ছিল, মহর্ষি নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন যে, এই সংবাদ কোনরকমে ছাপা যাবেনা। "তাঁর (কাদম্বরীর) মৃত্যুর পর দেহটি মর্গে না পাঠিয়ে বাড়ীতে করোনার ডাকা হয় মহর্ষির নির্দেশে। সেই সঙ্গে দেহ কাটাকটি করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়, আত্মহত্যার সংবাদটি যাতে সংবাদপত্রে ছাপা না হয় তার ব্যবস্থাও করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।" [অমিতাভ চৌধুরী : ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৭৩, ১৪০০ সাল]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এতগুলো ছেলেমেয়ের মধ্যে জমিদার হিসাবে তিনি নির্বাচন করলেন চোদ্দ নম্বর সন্তান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। এও এক বিস্ময়। অত্যাচার, শোষণ, শাসন, চাবুক, চাতুরী, প্রতারণা কলাকৌশলে রবীন্দ্রনাথই কি যোগ্যতম ছিলেন তাঁর পিতার বিবেচনায়? অনেকের মতে তাঁর পিতৃদেব ভুল করেন নি। প্রচন্ড বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীলতা বহু বিষয়েই অনস্বীকার্য।

জমিদারবাবুরা নতুন নতুন যে সব কর গরীব প্রজাদের কাছ হতে আদায় করতেন তা হৃদয় বিদারক। নানা নামের করগুলো ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত। যেমন গরুর গাড়ি করে মাল পাঠালে ধুলো উড়তো, তাই গাড়ির মালিককে যে কর দিতে হোত তার নাম 'ধুলট'। প্রজা নিজের জায়গায় গাছ লাগালেও তাকে একটি কর দিতে হোত, তার নাম 'চৌথ'। গরীব প্রজারা আখের গুড় তৈরি করলে যে কর লাগতো তা 'ইক্ষুগাছ কর'। হতভাগ্য প্রজাদের গরু মোষ মরে গেলে ভাগাড়ে সেই মৃত পশু ফেলার পর যে কর লাগতো তা হোল 'ভাগাড় কর'। নৌকায় মাল ওঠালে বা নামালে সে করের নাম ছিল 'কয়ালী'। ঘাটে নৌকা ভিড়ালে একটি কর লাগতো তার নাম 'খোটাগাড়ি কর'। জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে হলে একরকমের কর দিয়ে সম্মান জানাতে হোত, তার নাম 'নজরানা'। জমিদার কোনও কারণে হাজতে গেলে তাঁকে ছাড়িয়ে আনতে প্রজাদেরকে একটি কর দিতে হোত, তার নাম 'গারদ সেলামি' ইত্যাদি। [দ্রষ্টব্য স্বপন বসুর ঐ বই]

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে স্বার্থপূরণ ও অর্থের জন্য নিজের ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম ও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন অনেকেই। ঠাকুরবাড়ির অবস্থাও ঐ একই। বেশিরভাগই গ্রহণ করেছিলেন ব্রাহ্ম ধর্ম। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল মানুষের নৈতিক দৃঢ়তা। এটা না থাকলে মানবজীবন মূল্যহীন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যীশু, মোজেস, হজরত মুহাম্মাদ (স.) প্রমুখ যে মুখে ঈশ্বর আছেন একথা বলেছেন সে মুখে মৃত্যুর পূর্বে

কখনও বলার চেষ্টাও করেননি যে, ঈশ্বর নেই অথবা নাও থাকতে পারেন। মহাবীর ও বুদ্ধকে যদি মেনেই নেওয়া যায়, তাহলে একথা ঠিক যে তাঁরা কখনোও সানন্দে অবাধে মাংস খেতে পারেন না বা কাউকে খেতে বলতে পারেন না। মার্কস, লেনিন, স্টালিন, এঙ্গেলস ধর্ম মানুন আর নাই মানুন, কখনো তাঁদের পক্ষে বলা ও লেখা সম্ভব ছিলনা যে, গরীবদের মেরে ফেল বা শোষণ কর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দু ধর্মত্যাগী ব্রাহ্মদের উপবীত বা পৈতে ত্যাগ করা, গো মাংস বা কাবাব খাওয়া, মূর্তি পুজার বিরোধী হওয়া, হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া, হিন্দু ধর্মকে ঘৃণা করা ইত্যাদির প্রদর্শন ও দৃষ্টান্ত থাকলেও অনেকের মতে, ওগুলো ছিল অভিনয়। একথা যদি সত্য হয় তাহলে মানবতা নৈতিকতা বলে কতটুকু অবশিষ্ট থাকে যে প্রশ্ন থেকেই যায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও দেখা যাচ্ছে, দুর্গাপূজোর সময় পূজোর সব ব্যবস্থা করে দিয়ে পূজোর কটা দিন সরে পড়তেন অন্য কোথাও। [তথ্য : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, ১৯২০, পৃ. ৩৬]

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বাবার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হিন্দু পদ্ধতিতেই করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, 'মাতা পিতা স্ত্রী পুত্রকে দুঃখ দিয়া স্বজাতি হইতে পৃথক হওয়া কর্তব্য নহে' [দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পৃ.৫০]। ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীদের পৈতে ত্যাগ করা জরুরি ছিল। তাই দেবেন্দ্রনাথও পৈতে ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পুত্র রবীন্দ্রনাথের যথারীতি উপনয়ন বা অনুষ্ঠান করে পৈতে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ব্রাহ্মদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ছোটলোক ভদ্রলোক বলে কিছু মনে করা বা বিভেদ করা যেতনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন কালে ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু অনুষ্ঠানে উপবেশন করেছিলেন বলে তাঁকে ঐ অনুষ্ঠান হতে শূদ্র বলে অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হতে হয়। [তথ্য : রাজনারায়ণ বসুর লেখা আত্মচরিত, পৃ. ১৯৯]

দেবেন্দ্রনাথকে যাঁরা মহা-ঋষি বা মহর্ষি বানিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে সকলেই একমত ছিলেন না। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির প্রচণ্ড প্রভাবের ফলে সত্যকথা বলতে বা প্রকাশ করতে সৎসাহসের অভাব থাকলেও কিছু মানুষ ভাবতেন মহা-ঋষির এতগুলো পুত্রকন্যার জন্মদান তাঁর ঋষি হওয়ার অনুকূল নয় বরং প্রতিকূল। একজন তাঁকে সামনাসামনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রশ্ন করেছিলেন—"আপনি কেমন ঋষি, আপনার এত ছেলেপিলে?" এই প্রশ্নটি করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। [আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪.১১.১৯৯৯]

হিন্দুমেলা যে সৃষ্টি হয়েছিল সেটা ঠাকুর বাড়িরই অবদান। কারণ রবীন্দ্রনাথ দাবী করেছিলেন যে, 'তাঁদের বাড়ীর সহায়তায়ই হিন্দুমেলার জন্ম হতে পেরেছিল'।

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন, "ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা হিন্দু মেলাতেই সর্বপ্রথম লক্ষ্যণীয়। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প, ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।... এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। ... যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দু মেলা ও ইহা হিন্দুদিগের জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম কর্মের জন্য নহে, কেবল আমোদ প্রমোদের জন্য নহে। ইহা স্বদেশের জন্য—ভারত ভূমির জন্য।" [দ্রঃ যথাক্রমে জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী-১০, পৃ. ৬৬ ; যোগেশচন্দ্র বাগল : হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত (কলকাতা : মৈত্রী ১৯৬৮), পৃ. ৭]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিন্দু মেলাকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছিল 'জাতীয় সভা' ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে। এই সভায় কিন্তু মুসলমান-হরিজন-খৃষ্টানেরা ছিলেন অপাংক্তেয়। নবগোপাল মিত্র National Paper-এ লেখেন যে, খৃষ্টান ও মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত না করলে কেবলমাত্র হিন্দুদের নিয়ে গঠিত সভাকে জাতীয় সভা বলা যায় না। কিন্তু সভার অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য মনমোহন বসুর মতে : খৃষ্টান ও মুসলমানদের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন একেবারে অবান্তর এবং তাদের বাদ দিলেও জাতীয় সভার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়না। [দ্রঃ জাতীয় সভা, মধ্যস্থ, ২৩শে অগ্রহায়ণ ১২৭৯, পৃ. ৫৪২ ও ৫৪৪]

অনেকের মতে, হিন্দু-মুসলিম বিভেদের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল ঐ 'হিন্দুমেলা' ও 'জাতীয় সভা' থেকেই। এ মেলার পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নে ঠাকুরবাড়ির আর্থিক ও মানসিক সাহায্য আর সমর্থন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মেলার কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ঠাকুরবাড়ির সদস্য। প্রথম দিকে মেলার সম্পাদক ছিলেন গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পঞ্চম অধিবেশনের অন্যতম সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ষষ্ঠ ও সপ্তম অধিবেশনের সম্পাদকও ছিলেন তিনি। অষ্টম অধিবেশনে তিনি হন সহ সভাপতি, আর দশম অধিবেশনে হন সভাপতি। অষ্টম অধিবেশনের সহ সম্পাদক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এ মেলার কর্মকর্তা নির্বাচিত হননি

বটে, কিন্তু মেলার কাজে তাঁরা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা রচনার মাধ্যমে। [তথ্য : যোগেশচন্দ্র বাগল, ঐ, পৃ. ৬ এবং ৪৮]

দিবালোকের মত স্পষ্ট কথা এই যে, অনুন্নত হরিজন, নিপীড়িত নিষ্পেষিত মুসলিম ও অহিন্দু এবং হিন্দুমেলার সমর্থকদের মাঝে সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর তুলে দেওয়া বা সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ তৈরি করা ছিল এই মেলার বা সভার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। হিন্দুমেলার নেতা ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখে ফেললেন তাঁর জীবনস্মৃতিতে : "হিন্দু মেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত কী উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কটকে থাকিতেই আমি পুরুবিক্রম নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম।" [দ্রঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১৪১]

হিন্দুমেলার দ্বারা প্রভাবিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন এই নাটক রচনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বয়সে ছোট হলেও সক্রিয়ভাবে তখন থেকেই তিনি যোগ দিয়েছিলেন তাতে। তাঁর অন্য নাটক 'অশ্রুমতি', 'মানময়ী' প্রভৃতিতেও রবীন্দ্রনাথের তৈরি গান ও কবিতা যুক্ত হয়। ব্রাহ্ম হয়েও গোঁড়া হিন্দুর গোঁড়ামির নিদর্শন সতীদাহ প্রথারও কিসমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি? রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "জ্বল জ্বল চিতা! দ্বিগুণ দ্বিগুণ / পরান সঁপিবে বিধবা বালা। / জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন / জুড়াবে এখনই প্রাণের জ্বালা।। / শোন্, রে যবন! শোন, রে তোরা! / যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে, / সাক্ষী রলেন দেবতা তার / এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।।" [দ্রঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্য সংগ্রহ (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৬৯) পৃ. ২২৫]

কবি দেশে বা বিদেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যেটি যখন সুবিধে মনে করেছেন সেটিকেই অবলম্বন করেছেন। আবার প্রয়োজনে বর্জনও করতে পেরেছিলেন সেগুলো। এটা শুধু কবি রবি ঠাকুরেরই নয়, ঠাকুরবাড়ির যেন ছিল এই ট্রাডিশান। কবির পিতা ব্রাহ্ম হয়ে জানতেন যে, ব্রাহ্মদের উপবীত বা পৈতে ত্যাগ করতে হয় এবং অনেক ব্রাহ্মণই তাঁদের পৈতে ত্যাগ করেছিলেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার জন্য। কবির পিতা ব্রাহ্ম হয়েও হিন্দুমতে কবির উপনয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মাথা মুণ্ডনও করিয়েছিলেন তিনি। বালক রবীন্দ্রনাথ খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন যে, পরিচিতরা সকলেই জানেন তিনি ব্রাহ্ম ঋষির পুত্র। সুতরাং উপনয়নের কারণে মাথা ন্যাড়া করাতে প্রকাশ হয়ে যাবে তাঁদের সুবিধাবাদের কথা। কবির পিতা এই সমস্যার সহজ সমাধান করে

ফেললেন— তাঁকে নিয়ে চলে গেলেন হিমালয়ে বেড়াতে— "এমন দুশ্চিন্তার সময়ে তিনি খবর পাইলেন পিতা এবার তাঁহাকে লইয়া হিমালয় যাত্রা করিবেন।" [রবীন্দ্র-নজরুল চরিত, পৃ. ১২৯]

বাবার মৃত্যুর পর মাথা মুন্ডিত রবীন্দ্রনাথ

এ তো গেল বালক রবির ঘটনা। কবি যখন পিতা হলেন এবং তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের বয়স যখন ন' বছর হোল, তাঁরও উপনয়নের ব্যবস্থা করা হোল। তারিখটা ছিল ১৩০৫ সালের ১০ই বৈশাখ। উপনয়নের সময় রথীন্দ্রনাথকে হিন্দু নিয়মে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরতে হয়েছিল এবং মোট তিনদিন শূদ্র বা ছোটলোকদের মুখদর্শন করা নিষিদ্ধ বলে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বা আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। [দ্রঃ ঐ, পৃ. ১৩০]

তারপরের ঘটনা আরও চকমপ্রদ। প্রতিষ্ঠিত কবি, নোবেল প্রাইজ পাওয়া কবি, ব্রাহ্ম ধর্মের প্রধান আচার্য কবির ব্রাহ্ম পিতা মহা-ঋষি দেবেন্দ্রনাথ যখন মারা গেলেন সেই বছর অর্থাৎ ১৩১১ সালে তাঁর নিজের দীর্ঘ চিত্তাকর্ষক কেশ, সুবিন্যস্ত দাড়ি গোঁফ যা তিনি সযত্নে লালন করে এলেন তা তিনি হিন্দু ধর্মের নিয়মে মুণ্ডন করতে পারলেন নিমেষেই।

ঠাকুরবাড়িতে আর একটি সভা সৃষ্টি হয়েছিল বিষবৃক্ষের মত, সেটি হোল সঞ্জীবনী সভা। কবির মতে সেটা স্বাদেশিকের সভা। সভ্যদের দীক্ষা দেওয়া হোত ঋক বেদের মন্ত্র পড়িয়ে—'ঋক বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি ইত্যাদি নিয়ে এখানে যে সভা হোত' তা বাস্তবিক সত্য। [দ্রঃ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ১৬৭]

ব্রাহ্মদের মাথায় তখন এমন জিনিস ঢুকে ছিল যে, তাঁরা জানতে পেরেছিলেন কি পারেন নি, তাঁরা হয়ে গিয়েছিলেন হিন্দু থেকে গোঁড়া হিন্দু। ঐ হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের পোষাক পরিচ্ছদের পার্থক্য কিভাবে রক্ষিত হবে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা হয়। রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য মন্তব্যের সঙ্গে তাঁর ধারণামতে মন্তব্য করেন : 'ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে, অথচ পাজামাটা বিজাতীয়।' [রবীন্দ্র রচনাবলী-১০, জীবনস্মৃতি, পৃ. ৬৭]

রবীন্দ্রযুগে যে একটি মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্র চলছিল তার পূর্ণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা মুসলিম সমাজের ছিল না। যেটুকু প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের চিহ্ন পাওয়া গেছে তা অত্যন্ত ক্ষীণ ও সীমিত। একটি উদ্ধৃতি :

"কি পরিতাপের বিষয়, আমাদের শিশুগণকে প্রথমেই রাম শ্যাম গোপালের গল্প পড়িতে হয়। সে পড়ে গোপাল বড় ভাল ছেলে। কাশেম বা আব্দুল্লা কেমন ছেলে, সে তাহা পড়িতে পায় না। এখান হইতেই তাহার সর্বনাশের বীজ বপিত হয়। তারপর সে তাহার পাঠ্য পুস্তকে রাম লক্ষ্মণের কথা, কৃষ্ণার্জুনের কথা, সীতা সাবিত্রীর কথা, বিদ্যাসাগরের কথা, কৃষ্ণকান্তের কথা ইত্যাদি হিন্দু মহাজনদিগেরই আখ্যান পড়িতে থাকে। সম্ভবতঃ তাহার ধারণা জন্মিয়া যায়, আমরা মুসলমান ছোট জাতি, আমাদের মধ্যে বড়লোক নেই। এই সকল পুস্তক দ্বারা তাহাকে জাতীয়ত্ববিহীন করা হয়। হিন্দু বালকগণ ঐ সকল পুস্তক পড়িয়া মনে করে আমাদের অপেক্ষা বড় কেহ নয়। মুসলমানরা নিতান্ত ছোট জাত। তাহাদের মধ্যে ভাল লোক জন্মিতে পারেনা। এই প্রকারে রাষ্ট্রীয় একতার মূলোচ্ছেদ করা হয়। ... মূল পাঠ্য ইতিহাস সম্বন্ধে ঐ কথা। তাহাতে বুদ্ধদেবের জীবনী চারি পৃষ্ঠা আর হজরত মোহাম্মদের জীবনী অর্ধপৃষ্ঠা মাত্র। অথচ ক্লাসে একটি ছাত্রও হয়ত বৌদ্ধ নহে। আর অধিকাংশ ছাত্র মুসলমান। ... মূল পাঠ্য ইতিহাসে হিন্দু রাজাদের সম্বন্ধে অগৌরবজনক কথা প্রায় ঢাকিয়া ফেলা হয়, আর মুসলমানদিগের বেলা ঢাকঢোল বাজাইয়া প্রকাশ করা হয়। গুণের কথা বড় একটা উল্লিখিত হয় না। ফল দাঁড়ায় এই, ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িয়া ছাত্রেরা বুঝিল, মুসলমান নিতান্ত অপদার্থ, অবিশ্বাসী, অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর জাতি। পৃথিবী হইতে তাহাদের লোপ হওয়াই মঙ্গল।" [দ্রষ্টব্য 'আমাদের সাহিত্যিকদরিদ্রতা' : মুহম্মদ শহিদুল্লাহ]

অমুসলমান তো দূরের কথা, অনেক আধুনিক পাকে গড়া মুসলমান পাঠক পর্যন্ত মনে করবেন যে, এরকম উক্তি অর্ধশিক্ষিত আর সাম্প্রদায়িক মুসলমানই করতে পারে। কিন্তু একথা সত্য যে, লেখক ছিলেন অত্যন্ত উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনের মানুষ এবং হিন্দু বেদ ও সংস্কৃত প্রেমিক মনীষী। কলকাতা থেকে সংস্কৃতে অনার্স পড়ে এম.এ. করে পরবর্তীতে ফ্রান্সের প্যারিস ইউনিভার্সিটি থেকে পেয়েছিলেন ডি.লিট. এবং ডিপ্লোমা ইন ফনেটিক্স। তাছাড়া কলকাতা ঢাকা ও রাজশাহী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো অধ্যাপক, কখনো ডীন কখনো নানা বিভাগে অধ্যক্ষ হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের পূর্ণ মুসলমান হয়ে থাকাটা বোধহয় পছন্দ করতেন না। সেই জন্য তিনি বলতেন : মুসলমানেরা ধর্মে ইসলামানুরাগী হলেও জাতিতে তারা হিন্দু। কাজেই তারা 'হিন্দু-মুসলমান'। [তথা : আবুল কালাম সামসুদ্দিনের লেখা অতীত দিনের স্মৃতি পৃ. ১৫০]।

অধিকাংশ জমিদারবাবুরা চাইতেন না যে, গরীব বা ছোটলোক প্রজারা লেখাপড়া শিখে আলোর সামনে আসুক, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখুক তারা। আর সাতশো

বছরের রাজত্ব করা মুসলিম জাতির উঁচু মাথা নিচু করার ক্ষেত্রে বৃটিশ রাজত্বে দেশীয় বাবুদের হাতেই ছিল সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব। বিদ্যালয়ের নিয়ম কানুন, সিলেবাসও সেভাবে তৈরি হোত। যাতে মুসলমান অভিভাবকেরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি না করেন অথবা তাদেরকে সরিয়ে নেন্ অন্যত্র। যেমন নিয়ম করা হয়েছিল, বিদ্যালয়ে প্রবেশকালে প্রত্যেক ছাত্রকে বলতে হোত :

'জয় জয় মহারানী
সবিনয়ে তোমায় নমি,
জুড়িয়া দুখানি হাত
করি তোমায় প্রণিপাত।'

আর স্কুল থেকে বাড়ি যাবার সময় প্রত্যেককে বলতে হোত :

'সরস্বতী ভগবতী মোরে দাও বর,
চল ভাই পড়ে সব মোরা যাই ঘর।'

কিছু সমালোচক মনে করেন যে, বৃটিশের আনুগত্যভরা একটি ঘাঁটি ছিল ঐ ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরবাড়িতে যে সব নাটক হোত সেগুলোর লেখক ছিলেন তাঁরাই এবং অভিনয়ও করতেন অনেক ক্ষেত্রে ঐ বাড়ির পুরুষ ও মহিলারা। যে ভাষা ও বিষয় সেখানে ঝংকৃত হোত তার একটু নমুনা দেওয়া হচ্ছে :

"ওঠ! জাগ! বীরগণ। দুর্দান্ত যবনগণ,
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।
হও সবে এক প্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ ।।
বিলম্ব না সহে আর, উলঙ্গিয়ে তরবার
জ্বলন্ত অনল সম চল সবে রণে।
বিজয় নিশান দেখ উড়িছে গগনে।।
যবনের রক্তে ধরা হোক প্লাবমান
যবনের রক্তে নদী হোক বহমান
যবন শোণিত বৃষ্টি করুক বিমান
ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক বলবান।...
এত স্পর্ধা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের
অনায়াসে করিবে হরণ ?
তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারত ভূমে
পুরুষ নাহিক একজন ?"

"যায় যাক প্রাণ যাক, স্বাধীনতা বেঁচে থাক
বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব।
বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তরবার
ঐ শোন ঐ শোন যবনের রব।
এই বার বীরগণ, কর সবে দৃঢ়পণ
মরণ শয়ন কিম্বা যবন-নিধন,
যবন-নিধন কিম্বা মরণ শয়ন,
শরীর পতন কিম্বা বিজয় সাধন!"

[দ্রষ্টব্য : সরকার শাহাবুদ্দিন আহমেদ : ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র নজরুল চরিত, ১৯৯৮, পৃ. ১৬৮, ১৬৯, ২৮৩]

রবীন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়াচ তাঁকেও লেগেছিল। মুসলিম জাতি, ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠতম ও শেষ নবী এবং পবিত্র কোরআন শরীফ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অস্বচ্ছ। প্রমাণে বলা যায়— "মরহুম মোতাহার হোসেন চৌধুরী শান্তিনিকেতনে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার লেখায় ইসলাম ও বিশ্বনবী সম্পর্কে কোন কথা লেখা নেই কেন?' উত্তরে কবি বলেছিলেন, 'কুরআন পড়তে শুরু করেছিলুম, কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারিনি। আর তোমাদের রসুলের জীবন চরিতও ভাল লাগেনি'।" [দ্রষ্টব্য বিতন্ডা : সৈয়দ মুজিবউল্লাহ্, পৃ. ২২৯]

যে ব্রাহ্মণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাব সেই ব্রাহ্মকবি আবার ব্রাহ্মণ্যবাদ ফিরিয়ে আনতে লিখলেন : "ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে— দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়াছি।" আরও বল্লেন, 'আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।" [ব্রজেন্দ্র কুমার দেবমাণিক্যকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি (১৩০৯-এর ৭ই বৈশাখ), এপ্রিল ১৯০২, 'প্রবাসী' আশ্বিন, ১৩৪৮ পৃ. ৬৫৭]

হিন্দু ধর্মত্যাগী রবীন্দ্রনাথ একজন হেজিপেজি সাধারণ ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, তিনি ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। তবুও ব্রাহ্মণপ্রীতি বৃদ্ধি করতে এবং তা শিক্ষা দিতে তিনি লিখলেন :

"বেদ ব্রাহ্মণ-রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার।" (পূজারিনী দ্রষ্টব্য)

১৯০২-এ শান্তিনিকেতন ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে ব্রাহ্ম শিক্ষক কুঞ্জলাল ঘোষ কবির কাছে জানতে চান ছাত্ররা প্রণাম করেল তা নেওয়া হবে নাকি নিষেধ করা হবে? উত্তরে তিনি

লেখেন, "যাহা হিন্দু সমাজ বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবেনা; সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে, ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে। এই নিয়ম প্রচলিত করাই শ্রেয়ঃ।" [মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি (১৯শে অগ্রঃ, ১৩০৯), রবীন্দ্র জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৭]

জগদীশচন্দ্র মণ্ডল লিখেছেন, "যে কবি রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, সেই রবীন্দ্রনাথই অপরের বেলায় ধুয়ো তোলেন এতে হিন্দু ধর্মের প্রভূত ক্ষতি হবে।" লেখক এই জন্য লিখেছেন, ভারতের বৃহত্তর অনুন্নত হরিজনেরা আম্বেদকরের নেতৃত্বে যখন মাথা তুলতে চেয়েছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে গান্ধীর কথা শুনতে আবেদন জানান। কারণ গান্ধী উপবাস শুরু করেছিলেন এই জন্য যে, অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচন মেনে নিলে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। আম্বেদকরের সামনে যে বিরাট সুযোগ এসেছিল রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গে হিন্দুদের এলিট শ্রেণী মিলে এমন চাপ সৃষ্টি করলেন যে তার ফল দাঁড়ালো এই— যদি অনশনে গান্ধী মারা যান তার ফল হবে মারাত্মক। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর জন্য করুণ সুরে বাণী লিখলেন : "আজ তপস্বী উপবাস আরম্ভ করেছেন, দিনের পর দিন তিনি অন্ন নেবেন না। কিন্তু তাঁর বাণীকে গ্রহণ করাই তাঁর অন্ন, তাই দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে হবে।" [দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও আম্বেদকর, পৃ. ৪৮-৪৯]

উন্নত মুসলমান জাতিকে অবনত করার দীর্ঘ সর্পিল গতি কিভাবে সৃষ্ট এবং পরিচালিত তা বলার চেষ্টা করা হয়েছে প্রথম খণ্ডে। ইতিহাস যখন পাল্টাতে শুরু করা হোল, যখন মিথ্যার সংযোজন হোল, মুসলমান হিন্দুর মিলনের ব্যবধানকে যখন বড় করা হোল, তখন শিবাজীকে আমদানি করে শুরু হোল 'শিবাজী উৎসব'। তখন শিবাজীর প্রকৃত ইতিহাস বলতে যা ছিল তার সারমর্ম হোল : শিবাজী ছিলেন একজন দস্যু, তস্কর, পাহাড়ী ইঁদুর, সমাজ বিরোধী, লুণ্ঠনকারী মাত্র।

শূদ্র শিবাজীকে আওরঙ্গজেবের প্রতিদ্বন্দ্বী সাজিয়ে মুসলিম বিরোধী যে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছিল সেই তত্ত্বকে যাঁরা সানন্দে লুফে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথও ঐ দলের শুধু অন্যতমই ছিলেন না তার প্রচার, প্রসার ও প্রমাণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। অথচ বীর বলে কথিত মারাঠা জাতি ছিল হিংস্র ও লুণ্ঠনপ্রবণ যা আমার লেখা 'চেপে রাখা ইতিহাসে' প্রমাণ করা হয়েছে। একজন বিদেশী ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড স্যালিভ্যান তাঁর 'দি প্রিন্সেস অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে যা লিখেছেন তা হোল : শিবাজী ছিলেন সবচেয়ে বড় রকমের এক লুণ্ঠক ও নরহন্তা ডাকাত। আর তিনি যাদের নিয়ে তাঁর বাহিনী সংগঠিত করেছিলেন

তারা ছিল মারাঠী। শিবাজীর ঐ মারাঠা দল এমন অপরাধপ্রবণ ছিল যে, তরবারি ও ঘোড়া নিয়ে লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগ অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়তো তারা। ঐ লুণ্ঠন কাজে হিন্দু মুসলমানের কোন পার্থক্য ছিল না তাদের কাছে। মারাঠারা হিন্দু হয়েও অন্যায় ও অবৈধ পন্থায় ধন সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য অবাধে মন্দির ধ্বংস করতো, গোহত্যা করতো এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদেরও হত্যা করতো। যেখানেই তারা গেছে সেখানেই তারা ঘটিয়েছে অসংখ্য মৃত্যু আর সীমাহীন ধ্বংস।

মারহাট্টা বা মারাঠা শিবাজীকে নিয়ে যখন খুব হৈ চৈ শুরু হোল বিশ্বমানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ দিলেন হাল্কাভাবে নয়, প্রত্যক্ষ ও পূর্ণভাবে। তিনি শিবাজীর জন্য লিখলেন : "সেদিন শুনিনি কথা, আজি মোরা তোমার আদেশ শির পাতি লব, / কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বশেষ ধ্যানমন্ত্র তব / এ ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে এ মহাবচন করিব সম্বল।" শিবাজীর জন্য তিনি আরো লিখলেন, 'বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি' করে পরিহাস অট্টহাস্য রবে / তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস এই জানে সবে। / ... অশরীরী হে তাপস, শুধু তব তপমূর্তি লয়ে আসিয়াছ আজ / তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ ব'য়ে, সে তব কাজ। / ... মারাঠীর সাথে আজি হে বাঙালী এক কণ্ঠে বল জয়তু শিবাজী। / মারাঠীর সাথে আজি হে বাঙালী, একসঙ্গে চল মহোৎসবে সাজি।"

শিবাজীর চরিত্র প্রকৃত কী ছিল তা ঐতিহাসিকদের জানা ছিল। বড়মাপের এক বুদ্ধিজীবী লিখেছেন, "সেকালে বাংলায় আমাদের মহৎ বীরদের সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় রাজপুত, মারাঠা ও শিখ বীরদের জীবনী আমদানি করতে হয়েছে। ... জাতীয়তাবাদী নেতাগণ রাজনৈতিক গরজে সামগ্রিকভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছেন। এমনকি 'শিবাজী উৎসবে' মুসলমানকে টেনে আনার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করে ইতিহাসের ভুল উপস্থাপনা করতেন ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিতেন।" [এস. এ. সিদ্দিকী : ভুলে যাওয়া ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৯৩]

শিবাজী সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, "খড়্গহস্ত শিবাজীকে রঘুপতি যোজনা করেছিল যবনদিগের বিরুদ্ধে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে। শ্রী অরবিন্দও শিবাজীর এ খড়্গ তুলে দিয়েছিলেন বিপ্লবীদের হাতে, স্বদেশীদের হাতে। লক্ষ্য ঐ একই ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা।" [দ্রঃ স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তর পত্রিকার দান বা শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার বিপ্লববাদ, পৃ. ১৮৭ ও ১১]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক লিখেছেন, "হিন্দু জাতীয়তাজ্ঞান বহু হিন্দু লেখকের চিত্তে বাসা বেঁধে ছিল যদিও সজ্ঞানে তাঁদের অনেকেই কখনোই এর উপস্থিতি স্বীকার করবেন না।

এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছেন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাঁর পৃথিবীখ্যাত আন্তর্জাতিক মানবতাকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে কিছুতেই সুসঙ্গত করা যায় না। তবুও বাস্তব সত্য এই যে, তাঁর কবিতা সমূহ শুধুমাত্র শিখ, রাজপুত ও মারাঠাকুলের বীরবৃন্দের গৌরব ও মাহাত্মেই অনুপ্রাণিত হয়েছে। কোনও মুসলিম বীরের মহিমা কীর্তনে তিনি কখনোও এক ছত্রও লেখেন নি— যদিও তাঁদের অসংখ্যই ভারতে আবির্ভূত হয়েছেন। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, উনিশ শতকী বাংলায় জাতীয়তাজ্ঞানের উৎসমূল কোথায় ছিল।" [দ্রষ্টব্য : ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ২০৩] সুতরাং আমরা রবীন্দ্রনাথকে কলমের জোরে অসাম্প্রদায়িক এবং নিরপেক্ষ প্রমাণ করতে চাইলেও অনেকে তা মেনে নেবেন না সহজে।

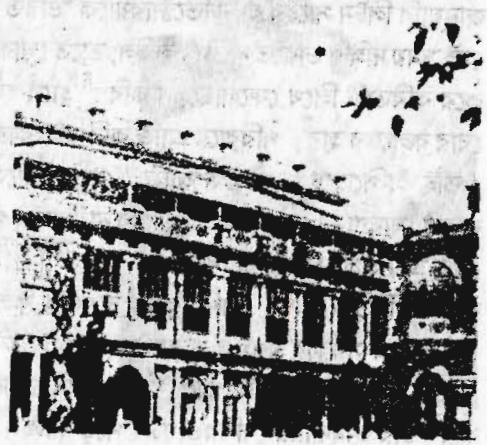

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি

যে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি বঙ্কিম সৃষ্টি করেছিলেন মুসলমান বিরোধিতা করার জন্যই, সেই বন্দেমাতরমের প্রথম অংশে রবীন্দ্রনাথ নিজেই সুর দিয়েছিলেন। বঙ্কিমের বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক হিন্দু লেখকেরাও কলম ধরেছিলেন কঠিন হাতে। কিন্তু তাঁরা ধোপে টেকেন নি কারণ বঙ্কিমের পৃষ্ঠপোষক ছিল ইংরেজ সরকার স্বয়ং। কিন্তু বঙ্কিমের সাহিত্যকে মুসলমানদের বিরুদ্ধেই কবি মেনে নিয়ে বলেছিলেন : "মুসলমান বিদ্বেষ বলিয়া আমরা আমাদের জাতীয় সাহিত্য বিসর্জন দিতে পারি না। মুসলমানদের উচিত নিজেদের জাতীয় সাহিত্য নিজেরাই সৃষ্টি করা।" (ভারতী পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার সম্পাদক আবুল আসাদ তাঁর 'একশ' বছরের রাজনীতি'তে)

ইংরেজদের চরম অত্যাচারে ষোল বছরের কিশোর কবি চুপি চুপি একটি কবিতা লিখে ফেলেছিলেন বৃটিশের বিরুদ্ধে। কবির বাড়ির হিন্দুমেলার সদস্য ও কর্মীরা ওটিকে ছেপে প্রকাশ করতে কঠিনভাবে নিষেধ করলেন। কবির শ্রম যাতে ব্যর্থ না হয় সেজন্য ঠাকুর পরিবার ও তাঁদের সহযোগীরা পরামর্শ করে একটি অমানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কবিতায় যেখানে যেখানে 'বৃটিশ' শব্দ আছে সেগুলোকে তুলে দিয়ে 'মোগল'

শব্দ ব্যবহার করা হোল। অথচ মোগল শাসন তো অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে— ১৭৫৭-র পর থেকেই সে সূর্য অস্তমিত। এ ঘটনা তো ১৮৭৮-এর। ১৮৭৭-এর ১লা জানুয়ারি লিটন সাহেব যখন ভিক্টোরিয়াকে 'ভারত সম্রাজ্ঞী' বলে ঘোষণা করেছিলেন সেই সময় দক্ষিণ ভারতে দুর্ভিক্ষ চলছিল, তাতে লোক মরেছিল ৫০ লাখ। তাই অভিমান করে কবিতাটি লিখে ফেলেছিলেন কবি : "হারে হতভাগ্য এ ভারতভূমি, / কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার / পরিবারে আজি করি অলংকার / গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে? / তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি / মোগল রাজের বিজয় রবে? / মোগল বিজয় করিয়া ঘোষণা যে গায় গাক্ আমরা গাব না, আমরা গাব না হরষ গান, / এস গো আমরা যে ক'জন আছি আমরা ধরিব আরেক তান।" [দ্রঃ কলকাতায় স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য (প্রবন্ধ) : প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত, কলকাতা ৩০০, পৃ. ১৩৩-৩৪]

ইংরেজ সরকার যখন বঙ্গ ভঙ্গ করতে চাইলেন তখন মুসলিম বিরোধী বুদ্ধিজীবী নেতারা ফেটে পড়লেন বিক্ষোভে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িয়ে ছিল কারণ তাঁর জমিদারির বেশিরভাগটাই পড়ে যাচ্ছিল নতুন বঙ্গে বা বর্তমান বাংলাদেশে। বিমলানন্দ শাসমল 'ভারত কী করে ভাগ হোল' পুস্তকে লিখেছেন, "ডঃ আম্বেদকর লিখেছেন : বাঙালী হিন্দুদের বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করার প্রধান কারণ ছিল, পূর্ববঙ্গে বাঙালী মুসলমানেরা যাতে যোগ্য স্থান না পেতে পারে সেই আকাঙ্খার দরুণ। বাঙালী হিন্দুরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে, বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করে এবং সেই সঙ্গে স্বরাজলাভের দাবী করে তাঁরা একদিন মুসলমানদের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের শাসক করে তুলবেন।" [দ্রষ্টব্য ঐ, পৃ. ২৫, ১৯৮১]

"১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতবর্ষে সৃষ্টি করল দুটি জাতীয়তাবাদ— একটি হিন্দু অপরটি মুসলমান। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯০৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হোল নিখিল ভারত মুসলিম লীগ। ... ১৯০৬ সালেই কংগ্রেস সাধারণভাবে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ালো এবং তারই প্রতিযোগী হিসাবে দাঁড়ালো নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ।" [পৃ. ২৫]

বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনে বেশিরভাগ হিন্দু বুদ্ধিজীবীই আকাশ বাতাস কাঁপাতে লাগলেন যে কিছুতেই বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ বরদাস্ত করা হবে না। রাজা মহারাজ জমিদার বাবু রায়বাহাদুর স্যার প্রভৃতি নানা উপাধিধারী ব্যক্তিদের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির কবিও এগিয়ে এলেন। ১৯০৫-এর ২৪ ও ২৭শে সেপ্টেম্বরের সভা দুটিতে তিনিই হয়েছিলেন সভাপতি। আর ১৬ই অক্টোবর 'রাখীবন্ধন' নামেও একটি উৎসবের নেতৃত্ব দিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বঙ্গভঙ্গ হবার ফলে আসাম ও বাংলার রাজধানী হবে ঢাকা। আর ঐ বঙ্গে মুসলমানেরা হবে সংখ্যাগুরু আর হিন্দুরা হবে সংখ্যালঘু। সুতরাং মুসলামানদের কাছে

ঢাকার গুরুত্ব বেশি হবেই। তাই ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ সাহেবের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের এবং ভারতের বহু মুসলিম নেতা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করলেন। কিন্তু হিন্দু নেতাদের প্রচেষ্টা ও প্রভাবে সরকারকে নতিস্বীকার করতে হোল, বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়ে একত্রিত হোল দুই বঙ্গ। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে যেসব মুসলিম নেতৃবৃন্দ লাফালাফি করেছিলেন তাঁরা শুধু ক্লান্ত হলেন না, হলেন খুব দুঃখিত ও মর্মাহত।

অনন্য ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ

বৃটিশ সরকার দুয়োরানী ও শুয়োরানীর গল্পের মতো ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করলেন যে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির ব্যবস্থা করবেন তাঁরা। মুসলমানদের অশিক্ষা অনুন্নতি ও অবনতির জন্য গদ্গদ বচন যাঁরা বলেন, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, মুসলমান শিক্ষিত না হয়ে পিছিয়ে গেল, তাদের নিজেদেরও উচিত শিক্ষায় এগিয়ে যাওয়া আর আমাদেরও উচিত সহযোগিতা করা। এ দরদ ও সমবেদনার বাণী সত্যিই বড় শ্রুতিমধুর। পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা শিক্ষায় পিছিয়ে ছিলেন একথা সত্য নয়, বরং পিছিয়ে রাখা হয়েছিল ইচ্ছাকৃতভাবেই। তার প্রমাণে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের মহামহা শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, রাজা, মহারাজা, স্যার, রায়বাহাদুর ও বাবুরা ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার কথায় খুশি হওয়ার পরিবর্তে ফেটে পড়েছিলেন রাগে দুঃখে আর হিংসায়।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ কলকাতার গড়ের মাঠে এক বিরাট সমাবেশ করা হয়। তখন কবির বয়স ছিল ৫১ বছর। ঠিক তার দুদিন পূর্বে ২৬শে মার্চ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয়েছিল। সেখানেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, ঢাকায় ইউনিভার্সিটি হতে দেওয়া যাবেনা। ঐ গুরুত্বপূর্ণ সভায় বাঘা বাঘা দেশীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন— "নতুন রাজ্য পুনর্গঠনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন কিনা বা শিক্ষা বিষয়ে করণীয় কী? —তা আলোচনার জন্য এক জনপ্রতিনিধিপূর্ণ সভা হয় টাউন হলে।" [দ্রষ্টব্য কলকাতা ইতিহাসের দিনলিপি : দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ পর্ব (বিংশ শতাব্দী : প্রাক স্বাধীনতাকাল), এপ্রিল ১৯৯৫, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত]

প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রগুলো যাতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি না হয় তার জন্য শিল্প নিপুণতা দেখালেন তাঁদের লেখায়। আর ঐ বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত সভার সভাপতি যিনি

হয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন ঠাকুরবাড়ির কবি রবীন্দ্রনাথ। তাহলে কি রবীন্দ্রনাথ চাননি যে তাঁর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত মুসলমান কৃষক ও শ্রমিক সন্তান এবং অনুন্নতরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের আলো পেয়ে ধন্য হোক? কবির সঙ্গে আর ও যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন ডঃ স্যার বাসবিহারী ঘোষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ব্যানার্জী প্রমুখ। বলতে আরো লজ্জা হয় যে, স্যার আশুতোষ মুখার্জীর নেতৃত্বে সেই সময়কার ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ সাহেবকে যাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় না হয় তার জন্য আঠারো বার স্মারকলিপি দিয়ে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। নীচতা এত নিচে নেমেছিল যে, তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদ্রুপ করে বলতেন মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিবাদপত্রে বলা হয়েছিল যে, ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে কেন্দ্র করে গোটা পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের একটা শিক্ষিত পরিমন্ডল গড়ে উঠবে। তবুও ঢাকা ইউনিভার্সিটি হোল। তার ভাইস চ্যান্সেলর হলেন সাহেব মিঃ ফিলিপ হরতগ। ২৫ বছর তিনি উপাচার্য ছিলেন। বড়লাট হার্ডিঞ্জ হিন্দুদের এই বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, হিন্দুদের চিন্তার কোন কারণ নেই— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা বাড়তে দেওয়া হবেনা, মাত্র দশ মাইল পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। [তথ্য : জীবনের স্মৃতিদ্বীপে : ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার— এ. আসাদের একশ' বছর রর রাজনীতি পুস্তকে উদ্ধৃত, পৃ. ৭২, ১৯৯৪]

যেসব জঙ্গি ও গুপ্ত সমিতি সৃষ্টি হয়েছিল, যাদের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ডাকাতি, বোমা, রিভলভার, ছোরা, তলোয়ার প্রভৃতি ব্যবহার করা, সেগুলো ইতিহাসে যে রঙেই রঙিন করা হোক না কেন তাতে মুসলমানদের মুসমানত্ব বজায় রেখে প্রবেশের অধিকার ছিলনা। এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে তার আলোচনা হয়েছে। তাতেও ঠাকুরবাড়ির অনেকে তথা রবীন্দ্রনাথও সংযুক্ত ছিলেন। 'স্বদেশী আন্দোলন' বলে চালানো হলেও এটা ছিল সন্ত্রাসবাদ। কবি স্বয়ং লিখেছেন, "আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন হয়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলাম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয়নি, বিরুদ্ধে ছিল।"

কিন্তু কেন ছিল? গিরিজাশঙ্কর রায় লিখেছেন, "আমরা দেখিয়াছি, দেখিতেছি অরবিন্দ, বঙ্কিম-প্রদর্শিত জাতীয়তাকেই সজ্ঞানে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতেই অনুসরণ করিতেছেন।... তিনি একপায়ে দাঁড়াইয়া বগলা মন্ত্র জপ ও বগলা মূর্তি পূজা শেষ করিয়া আসিয়াছেন। ... গুপ্ত সমিতিতে মা কালীও আছেন এবং শ্রীগীতাও আছে। এতে মুসলমান ভ্রাতাগণ যদি বলেন যে, 'এ ব্যবস্থায় দেশ উদ্ধারের জন্য আমরা যা-ই বা কি করিয়া, আর থাকিই বা কোন মুখে'?" [দ্রঃ শ্রী অরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ, পৃ. ৪৫২-৫৩]

অতএব মুসলমানেরা যোগ দেয়নি নয়, যোগ দেবার দরজা খোলা ছিলনা। সমগ্র মুসলিম জাতি হরিজন ও অনুন্নত সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে মুসলানদের উন্নত অবস্থা থেকে

অবনত করার কুব্যবস্থা এবং হরিজন ও অনুন্নতদের উন্নতির পথ বন্ধ করার পরিপ্রেক্ষিতে বাবু সমাজ অঙ্কুরিত হবার পর থেকেই ইংরেজ সরকার যত রকম কৌশল অবলম্বন করেছিল তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হচ্ছে, কলকাতাকে এবং সেই সঙ্গে কলকাতার কয়েকটি পরিবারকে বেছে নেওয়া যাঁদের দিয়ে প্রচুর অনুগত ও অনুসারী তৈরি করা সম্ভব হবে। ঠাকুরবাড়ি সেক্ষেত্রে ব্রিটিশদের পক্ষে একটি বৃহত্তর প্রাপ্তি।

লক্ষ লক্ষ মানুষ অর্ধাহার অনাহারে যখন মারা যাচ্ছে, মাথা তুলতে চাইছে বিপ্লবের জন্য, তখন ব্রাহ্ম সমাজ নিয়ে হৈ চৈ করছেন বাবু সমাজ। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন ব্রাহ্ম সমাজের জন্য জমি কেনা হোল। সূক্ষ্মদ্রষ্টাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হোল যে, ঐ দলিলে 'ব্রাহ্ম' না লিখে 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল। ব্রাহ্ম সমাজ যে ভবিষ্যতে আবার হিন্দু সমাজেই ফিরে আসবে এটা তারই ইঙ্গিত ছিল।

পূর্বেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, বৃটিশ বঙ্গদেশকে ভারতের মূল কেন্দ্র করে নিয়েছিল। তার পরে যেটা উল্লেখযোগ্য কথা সেটা হোল, মুসলমান শাসকদের সময় শাসকদলের নিকটস্থ হতে পেরেছিলেন অর্থাৎ চাকর থেকে চাকরিজীবী এবং প্রশাসনের সহযোগী হয়েছিলেন কিছু ভাগ্যবান বঙ্গীয় ব্যক্তি। সেটাও নিজেদের আখের গোছাবার জন্যই হয়েছিল; তাতে আন্তরিকতা ছিল অল্প। ঐ 'খাপ খাওয়ানোর' বুদ্ধিটুকু ছিল বলেই মুসলিম শাসক সম্প্রদায় এবং তাদের কোর্ট কাছারি অফিস আদালতের ভাষা, ফার্সি ও উর্দুকে ভালভাবেই রপ্ত করেছিলেন তাঁরা। সেই সঙ্গে এটাও তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, নিজেদের বংশধরদের ফার্সি শেখাতে পারলেই তাঁরা শাসকদের আমলা বা সহযোগী হয়ে সুখ শান্তি আর অর্থের একটি মোটা অংশীদার হতে পারবেন। ফলে তখনকার হিন্দু সমাজের ফার্সি জানা মানুষেরা মুসলমান শাসকদের মুগ্ধ করতে এবং ঔদার্য প্রদর্শন করতে পোষাক পরিচ্ছদ কথাবার্তা আচার ব্যবহারে নিজেদেরকে তাঁদের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। এমনকি শাসক সম্প্রদায় এবং তাঁদের আমলাদের সঙ্গে মিলন মৈত্রীর পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের বাড়ির কন্যাদের তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন অনেকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঠাকুরবাড়ির পূর্বপুরুষ জয়দেব ও কামদেব তাঁদের আখের গোছাতে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে জামালুদ্দিন ও কামালুদ্দিনে পরিণত হয়েছিলেন।

সুবিধাভোগী দলের বাইরে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বঞ্চিত দলটি ছিল তাঁরাই ক্রমে ক্রমে ছোটলোক অচ্ছুত আদিবাসী হরিজন ব্রাত্য প্রভৃতি নাম পেয়ে উন্নতিশূন্য হয়ে বেঁচেছিলেন মাত্র।

বৃটিশের বাছাই করা ঠাকুরবাড়িটি বৃটিশ সরকারের উন্নতি ও প্রশাসনের সঙ্গে উন্নয়নশীল সমাজে সর্বক্ষেত্রে জড়িয়েছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে। এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কলকাতা ইউনিভার্সিটি ছিল শাসকদের একটি কর্মযজ্ঞের ঘাঁটি। ঠাকুরবাড়ির পুরুষ ও

মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় কেমনভাবে জড়িয়ে ছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী দেওয়া হল এখানে :

১। ১৮৩০-এর ১৭ই অগস্ট প্রতিষ্ঠিত হোল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। তার কর্তা ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর।

২। 'প্রগতিপন্থী'দের সভা হোল কলকাতায় ঐ বছর ১০ই নভেম্বর। তার সভাপতি ছিলেন ঠাকুরবাড়ির প্রিন্স।

৩। ঐ সালেই 'সর্বস্বত্ত্ব দীপিকা সভা' স্থাপন। তারও সম্পাদক ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

৪। ৬ নম্বর প্রেস আইন বাতিলের সুপারিশ সভা। তার মধ্যমণি ছিলেন প্রিন্স।

৫। কলকাতার চৌরঙ্গী থিয়েটারকে ঋণমুক্ত করলেন যিনি তিনিও ঐ প্রিন্স।

৬। 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'কে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'য় পরিণত করা হোল। তারও নেতা ঐ প্রিন্স।

৭। বৃটিশ প্রতিনিধি জর্জ টমসনকে হিন্দু কলেজে সম্বর্ধনা প্রদান। ১৮৪৩-এর ১১ই ডিসেম্বর। তারও মূলনায়ক ঠাকুরবাড়ির প্রিন্স।

৮। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' থেকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশ। এতেও নেতৃত্ব প্রিন্সের।

৯। 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র সৃষ্টি। বৃটিশের সহযোগিতায় বোম্বাই ও মাদ্রাজে তার শাখা স্থাপন। এখানেও নেতৃত্ব ঠাকুরবাড়ির প্রিন্সের।

১০। 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'র প্রতিষ্ঠা ১৮৫৫র ১৫ই ডিসেম্বর। সভাপতি প্রিন্স ঠাকুর।

১১। ঐ বছর ২৫শে ডিসেম্বর অধ্যক্ষ সভার প্রতিষ্ঠা। সম্পাদক ঠাকুরবাড়ির প্রিন্স।

১২। ১৮৬১-র ১লা অগস্ট ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার জন্ম। তার মূলধন দিয়েছিলেন ঐ প্রিন্স দ্বারকানাথ।

১৩। বৃটিশের বাছাই করা আন্তর্জাতিক নেতা কেশব সেনকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি প্রদান করলেন ঐ প্রিন্স।

১৪। শান্তিনিকেতনে 'তপোবন' তৈরির পরিকল্পনায় বিশ বিঘে জমি ক্রয়। উদ্যোক্তা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৫। 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রিকার প্রকাশ। অর্থ জোগালেন ঠাকুরবাড়ির দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৬। 'ব্রাহ্ম সমাজ'কে বিভক্ত করে 'আদি ব্রাহ্ম সমাজে'র সৃষ্টি। মূল নায়ক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৭। ১৮৬৭-র ৫ই জানুয়ারি 'জোড়াসাঁকো থিয়েটারে'র উদ্বোধন। অভিনেতা ও অভিনেত্রী প্রত্যেকেই ঠাকুরবাড়ির সদস্য।

১৮। ঐ বছর ২৬শে মার্চ 'চৈত্রমেলা'র প্রথম অধিবেশন। তার দুই উদ্যোক্তা হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯। ঐ বছর ১৮ই এপ্রিল 'বিদ্বৎজন সভা'র সৃষ্টি। কর্মকর্তা হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২০। ১৮৭৪-র ১২ই ডিসেম্বর প্রথম বাঙালী সিভিলিয়ান হলেন যিনি তিনি ঠাকুরবাড়ির সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২১। ১৮৭৫-তে বিলেতের ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করা হোল একজন 'সঙ্গীতাচার্য'কে। তিনি হলেন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

২২। ১৮৭৬-এর ফেব্রুয়ারিতে 'হিন্দুমেলা' আরম্ভ হোল। তার সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৩। ১৮৭৭-এর ২৯শে জুলাই 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। পরিচালক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আরও যাঁরা সম্পাদনা করেছিলেন তাঁরা হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলাদেবী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৪। ১৮৮০-র ১৮ই জানুয়ারি এক বাঙালীকে বৃটিশ কর্তৃক 'অর্ডার অফ দি ইন্ডিয়ান এম্পায়ার' উপাধি প্রদান। তিনি হচ্ছেন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

২৫। ঐ বছরের ২৬শে এপ্রিল মাদ্রাজ ও বাংলার নেতাদের নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট বি.এল. গুপ্তর বাগানে বিশেষ মিটিং। তারও মুখ্য ব্যক্তিদ্বয় হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৬। ১৮৮১তে কলকাতা টাউন হলে প্রথম ভারতীয় ব্যক্তির প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হয় স্যার লেঃ গভর্নর ইডেনের উপস্থিতিতে। সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছোটভাই রমানাথ ঠাকুর।

২৭। ১৮৮৪-র জুলাই মাসে 'নবজীবন' পত্রিকার প্রকাশ। তাতে লেখকদের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৮। ১৮৮৪-র এপ্রিলে 'বালক' পত্রিকার জন্ম। সম্পাদিকা ঠাকুরবাড়ির জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।

২৯। ১৮৮৬-র ১২ই অগস্ট সৃষ্টি হোল মহিলাদের 'সখী সমিতি'। পরিচালিকা ঠাকুরবাড়ির স্বর্ণকুমারী দেবী।

৩০। ভিক্টোরিয়া-পুত্রের ভারতাগমনের আনন্দে তাঁকে মোটা অঙ্কের উপঢৌকন দিয়ে প্রশংসাপত্র পেলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারিখ ১২.১২.১৮৮৯।

৩১। ১৮৯১-এ 'সাধনা' পত্রিকার প্রকাশ। সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩২। রানী ভিক্টোরিয়ার ৬০তম জন্মবার্ষিকীতে আনন্দে 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' অভিনীত হয়। সমস্ত খরচ বহন করেন সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

৩৩। ইটালীর যুদ্ধ জাহাজের সমস্ত অফিসারদের নেমন্তন্ন। আপ্যায়নে বিশেষ সভার ব্যবস্থা করেন সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর। ১৯.২.১৮৯৯ -এ কলকাতায়।

৩৪। ১৯০৪-এর ১০ই জানুয়ারি সরস্বতী ইনস্টিটিউটে এক বিশেষ সভা হয়। তার সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৫। ১৯০৫-এর ৮ই জানুয়ারি প্রাচীন পুঁথিকেন্দ্রিক একটি সভা হয়। তার সভাপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৬। ঐ বছর এপ্রিল মাসে 'ভান্ডার' পত্রিকার প্রকাশ। সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৭। ২৯শে এপ্রিল শেক্সপিয়র সোসাইটির একটি সভা হয়। সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৮। ঐ বছর ক্যালকাটা স্কুল অব আর্টের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল পদে বসানো হয় ঠাকুরবাড়ির অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

৩৯। ১০ই অক্টোবর নিবেদিতাকে নিয়ে একটি বিশেষ সভা হয়। চাঁদা তোলা হয় ৭০ হাজার টাকা। প্রধান আকর্ষণ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

৪০। 'বন্দেমাতরম' নামের একটি সম্প্রদায় শিবাজী উৎসব পালন করতে ভারতমাতার ছবি ব্যবহার করে। চিত্রকর ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারিখ ১০.৬.১৯০৬।

৪১। অপরিচিত বৌদ্ধ ধর্মের উপর এক আলোচনাচক্র হয়। প্রধান বক্তা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪২। বৃটিশ মিত্র রামমোহনের ৭৫তম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে রেভারেণ্ড আণ্ডারসেনের ইচ্ছায় প্রধান বক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪৩। বিখ্যাত সঙ্গীত বিশারদকে এনে এক বিশেষ আলোচনাচক্র হয়। যার সভাপতি হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪৪। ইংলণ্ডের পণ্ডিত ও শিল্পাচার্য মিঃ রোটেনস্টাইনকে কলকাতায় আনানো হয়। প্রত্যেকদিন ঠাকুরবাড়িতে তাঁকে নিয়ে হোত এক বিশেষ আলোচনা। এই কর্মযজ্ঞ শুরুর তারিখটি ছিল ৩১.১২.১৯১০।

৪৫। সরকারের নির্দেশে ১৯১৩-র ২৮শে অক্টোবর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট. দিল রবিঠাকুরকে।

৪৬। ইংরেজ ভাইসরয় গভর্নমেন্ট হাউসে ২৬.১২.১৯১৩-তে সম্মানসূচক এক ডিগ্রি দান করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

৪৭। ১৯১৪-র ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে মিঃ উইলিয়াম ডিউকের সভাপতিত্বে সঙ্গীত ও বাদ্য নিয়ে অনুষ্ঠান হয়। সেদিন প্রধান আকর্ষণ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪৮। ঐ বছর ১০ থেকে ১২ই এপ্রিল কলকাতা টাউন হলে যে 'লিটারারী কনফারেন্স' হয় তারও সভাপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪৯। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সঙ্গীতসম্মিলনীর সভায় সভাপতি হন ঐ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৮.২.১৯২০ তারিখে।

৫০। ১৯২২-এর ৯ই অগস্ট শান্তিনিকেতনে এলেন সিলভাঁ লেভি। তাঁকে আনলেন ঠাকুরবাড়ির রবীন্দ্রনাথ।

৫১। ১৯২৪-এর ২১শে জানুয়ারি মিঃ এলমহার্স্ট আলফ্রেড থিয়েটারে বক্তৃতা দেন, সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫২। ১৯২৫-এর ১৮ই জুলাই আর্ট থিয়েটার কোম্পানি রবি ঠাকুরের বই মঞ্চস্থ করে স্টার থিয়েটার হলে।

৫৩। ১৯.১২.১৯২৫-এ 'অল ইণ্ডিয়া ফিজিক্যাল কংগ্রেসে'র গুরুত্বপূর্ণ সভা হয়, সভাপতি কবি রবীন্দ্রনাথ।

৫৪। রামমোহনের মৃত্যুশতবার্ষিকী পালনে সিটি কলেজে বিশেষ সভা হয়। সালটি ছিল ১৯২৭। বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫৫। ঐ বছরের ৪ঠা মার্চ মুসলিম খাঁন গোষ্ঠীকে আড়াল করতে প্রাচ্য সঙ্গীত, আধুনিক সঙ্গীত ও কীর্তন সৃষ্টি এবং প্রচারের ব্যবস্থা হয়। প্রধান বক্তা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫৬। ভরতপুরের রাজবাড়িতে এক গুরুত্বপূর্ণ গোপন সভায় হিন্দি ভাষার পরিপুষ্টির এক আলোচনায় প্রধান অতিথি হন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯২৭-এর ২৮শে মার্চ।

৫৭। ১৯২৮-এর ৫ই জানুয়ারি 'এসোসিয়েশন ফর উওম্যানস ওয়ার্ক ই বেঙ্গলে'র সভা কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে হয়, সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫৮। ১৯২৯-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারি মিঃ টুকের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে কানাডা রওনা হন।

৫৯। ঐ বছর ২৭শে ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিংয়ে হয় প্রাচীন চিত্রশিল্পের উপর এক বিশেষ আলোচনা। প্রধান বক্তা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬০। ১৯৩০-এর ২রা ফেব্রুয়ারি গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের মাঠে বেঙ্গল লিটারারীর কনফারেন্স হয়। সভাপতিত্ব করেন ঠাকুরবাড়ির স্বর্ণকুমারী দেবী।

৬১। ৮ই ফেব্রুয়ারি সাহিত্য পরিষদের একটি বিশেষ সভায় চলতি ব্যবহৃত বাংলা শব্দের দীর্ঘ তালিকাকে সংস্কৃত শব্দ সম্বলিত তালিকায় পরিণত করেন কিছু বুদ্ধিজীবী। নেতৃত্ব দেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬২। সরকারি নির্দেশে ৬ই অগস্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্বর্ধনা দেয়।

৬৩। স্যার হ্যামিলটন তাঁর 'আদর্শ পল্লীকেন্দ্র' দেখতে রবি ঠাকুরকে আমন্ত্রণ জানান।

৬৪। ১৯৩৩-এর ১১ই ফেব্রুয়ারি গান্ধীজীর 'হরিজন' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের লেখা পাঠালেন।

৬৫। বরানগরে ১৯৩৩-এর ৮ই এপ্রিল হিন্দু মহাসভার এক সাম্প্রদায়িক সভা হয়। তাতেও যোগ দিলেন রবীন্দ্রনাথ।

৬৬। ১৯৩৪-এর ২১-৩১শে অক্টোবর মাদ্রাজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬৭। ঐ বছর ২৯শে নভেম্বর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬৮। ১৯৩৫-এর ৮ই ফেব্রুয়ারি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির দেওয়া 'ডক্টর' উপাধিতে ভূষিত হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬৯। ১৯৩৬-এর ১৫ই মার্চ পাটনায় নাটক মঞ্চস্থ করতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়া হয়।

৭০। তখনকার ষড়যন্ত্রের কারখানা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৬-এর ১১ই সেপ্টেম্বর আরবি ফারসি মিশ্রিত চলতি বাংলা ভাষার শব্দ ও বানান পরিবর্তন যজ্ঞে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত স্বীকৃতি দেন। রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরের তলায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও সই করেন।

৭১। বঙ্গের প্রাক্তন গভর্নর মিঃ রোনাল্ড সাহেব ইংলণ্ডে ৯.১২.১৯৩৮-এ চিত্রকলা প্রদর্শনী উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথকে ডেকে নিলেন।

৭২। ১৯৩৯-এর ১৯শে অগস্ট মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে ডাক পড়ল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

৭৩। ঐ বছর ৮ই সেপ্টেম্বর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে না গিয়ে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে যে প্রচারপত্র তৈরি করা হয় তাতে ছিলেন বাঙালী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, স্যার নীলরতন সরকার, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় আর তাঁদের মধ্যমণি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনেক বাদসাদ দিয়ে এই ৭৩টি ঘটনার প্রত্যেকটিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছেন ঠাকুরবাড়ি অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ির পুরুষ ও মহিলারা। যেমন দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ। ঢাকায় যাতে কোনমতেই ইউনিভার্সিটি না হয় তার জন্য গড়ের মাঠে যে সভা হয়েছিল তাতেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ আলোচনা বিশদভাবে পূর্বেই করা হয়ে গেছে। এরকম বহু ঘটনা আছে যা উল্লেখ করলে তালিকাটি হয়ে উঠবে বড়ই ক্লান্তিকর।

'চেপে রাখা ইতিহাস' এবং 'বজ্রকলমে'র প্রথম খণ্ডে যেটা জানানো হয়েছে সেটা হোল, ইংরেজ সরকার যাঁদের ইচ্ছা তাঁদেরকে হিরো করেছে, আবার যাঁদের ইচ্ছা তাঁদেরকে করেছে সিন্ধু থেকে বিন্দু।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কথা বারবার বলা হয়েছে। সে বিশ্বাসে আমাদের কারোরই কমতি নেই। কিন্তু কি করে স্বীকার করা যাবে যে তাঁর মত কবি ভারতবর্ষে আর কেউ ছিলেন না? আবার প্রশ্ন উঠবে, যদি তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী না-ই হবেন তাহলে তখনকার কবি সাহিত্যিক তো অনেকেই ছিলেন, তাঁরা প্রতিবাদ করলেন কই?

রবীন্দ্রভক্ত অধ্যাপক দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রবিরোধী সমালোচনা' বই থেকে তথ্য দিয়ে বলা যায়, রবীন্দ্রযুগে বিখ্যাত লেখক, কবি, সমালোচক ও পত্রিকার সম্পাদকেরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন কালের গতিতে চাপা পড়ে গেছে সেসব। কারণ তাঁদের পিছনে ছিলনা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের ভাবের অস্পষ্টতা ও নৈতিক স্খলনের কথা স্পষ্ট করে বলেছিলেন। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী বিপিনচন্দ্র পাল ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন কবির কড়া সমালোচক। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও বুদ্ধদেব বসু ছিলেন ঐ যুগের মহারথী। তাঁরাও এগিয়ে এসেছিলেন কবির বিরুদ্ধে। [তথ্য : ঐ,পৃ. ১, ছাপা ১৯৯৪]

'বুর্জোয়া' শব্দটি একরকমের গালি বললেও অত্যুক্তি নয়। যার অর্থ কায়েমী স্বার্থবাদী বা স্বার্থপর ধনী। রবীন্দ্রনাথকেও যখন 'বুর্জোয়া' বলা হোল, তিনি কিন্তু তা মেনেই নিলেন। কারণ তিনি ছিলেন ধনী জমিদার। আর জমিদারেরা অধিকাংশই যে অত্যাচারী ও লুণ্ঠনকারী তা অস্বীকার করা যায় না। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া বলাটা অপবাদ দেবার সামিল নয় এবং এটা অনিবার্য ঐতিহাসিক ঘটনা।' [ঐ, পৃ. ২]

কবি রবীন্দ্রনাথকে দয়ার প্রতিমূর্তি বলে আমরা অনেকে মেনে নিলেও জমিদার রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তার বিপরীতই ছিলেন :

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সামন্তবাদী প্রজাপীড়ক জমিদার ছিলেন। তাঁর দফায় দফায় খাজনা বৃদ্ধি এবং জোর-জবরদস্তি করে তা আদায়ের বিরুদ্ধে ইসমাঈল মোল্যার নেতৃত্বে

শিলাইদহে প্রজাবিদ্রোহ হয়েছিল।" [অধ্যাপক অমিতাভ চৌধুরী : জমিদার রবীন্দ্রনাথ, দেশ ১৪৮২ শারদীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য]

চারিদিকে নিষ্ঠুরতার এবং দুর্নামের প্রতিকূল বাতাসকে অনুকূল করতে "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটারি অমিয় চক্রবর্তী একবার বিশাল জমিদারির একটি ক্ষুদ্র অংশ দরিদ্র প্রজাসাধারণের জন্য দান করার প্রস্তাব করেছিলেন। ঠাকুরমশাই ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে বলেছিলেন— 'বল কি হে অমিয়! আমার রথীন (কবির একমাত্র পুত্রের নাম) তাহলে খাবে কী'?" [দ্রষ্টব্য অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনা থেকে উদ্ধৃত পুস্তক— রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা : আবু জাফর]

অধ্যাপক অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন, "জমিদার জমিদারই। রাজস্ব আদায় ও বৃদ্ধি, প্রজা নির্যাতন ও যথেচ্ছ আচরণের যেসব অস্ত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার জমিদার শ্রেণীর হাতে তুলে দিয়েছিল, ঠাকুর পরিবার তা সদ্ব্যবহারে কোন দ্বিধা করে নি। এমন কি জাতীয়তাবাদী হৃদয়াবেগ ঔপনিষদিক ঋষি মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি এবং হিন্দু মেলার উদাত্ত আহ্বানও জমিদার রবীন্দ্রনাথকে তাঁর শ্রেণীস্বার্থ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি।" [দ্রষ্টব্য অরবিন্দ পোদ্দার : রবীন্দ্রনাথ ও রাজনৈতিক গ্রন্থ]

সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ও বলেছেন, শান্তিনিকেতনে একটি চাকরি পেয়ে তাঁর সরকারি চাকরি ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হলেন জমিদার মর্জির, ঠিক নেই, কখনো আবার চাকরি নষ্ট করে দিলে তাঁর খাবার অভাব হবে। রবীন্দ্রনাথ ইন্টলারেন্ট (অসহিষ্ণু) ছিলেন। যে মাষ্টার রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিবাদ করতেন তাঁর চাকরি থাকতো না।

অন্নদাশঙ্কর রায় আরও বলেন, "জমিদার হিসেবে ঠাকুর পরিবার ছিল অত্যাচারী। গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বুট পরে প্রজাকে লাথি মেরেছেন, পায়ে দলেছেন দেবেন ঠাকুর। এটাই রেকর্ড করেছিল হরিনাথ মজুমদার। যিনি মহর্ষি বলে পরিচিত, তিনি এরকম ভাবে মানুষকে পদাঘাতে দলিত করেন! গ্রাম জ্বালাবার কথাও আছে। আবুল আহসান চৌধুরীর কাছে এর সমস্ত ডকুমেন্ট আছে। সমগ্র ঠাকুর পরিবার কখনো প্রজার কোনও উপকার করে নাই। স্কুল করা দীঘি কাটানো এসব কখনো করে নাই। মুসলমান প্রজাদের টিট্ করার জন্য নমঃশূদ্র প্রজা এনে বসতি স্থাপনের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি রবীন্দ্রনাথের মাথা থেকেই বের হয়েছিল। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার তাঁর 'গ্রাম্যবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় ঠাকুর পরিবারের প্রজাপীড়নের কথা লিখে ঠাকুর পরিবারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।" [দ্রষ্টব্য দৈনিক বাংলা বাজার, ১৪.৪.১৯৯৭ এবং ১.৫.১৯৯৭ সংখ্যা]

স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর জন্য লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক।" [দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ঐ বই, পৃ. ৪]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি জ্যোতিন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শিবনারায়ণ রায় প্রমুখও লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। বিরোধীদের মধ্যে নিত্যপ্রিয় ঘোষও একজন অন্যতম সমালোচক। প্রমথ চৌধুরী ও অজিত কুমার চক্রবর্তী বিরোধীদের মধ্যেই গণ্য। সরলাবালা দাসী ছিলেন বিরোধী লেখিকা। তিনি কবিকে চিঠি লিখেছিলেন, "যদিও উপন্যাস হিসাবে লেখকের যথেচ্ছ লিখিবার ক্ষমতা ও অধিকার আছে, কিন্তু এমন রচনায় অধিকার আছে কি, যা সমস্ত দেশকে মিথ্যা অসম্মানের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারে?" ইত্যাদি। [ঐ, পৃ. ১০-১১]

বিদ্যাবিশারদ কালীপ্রসন্ন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লিখেছেন, 'তিনি হচ্ছেন কলা কৈবল্যবাদের কবি'।

অমিতাভ চৌধুরী যা লিখেছেন তা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেই যায়—"গীতাঞ্জলি নামটাই ধার করা। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলেন শিলাইদহ কুমারখালি অঞ্চলে। কুমারখালির বিশিষ্ট তান্ত্রিকের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। বাংলা ১২৯৫ অর্থাৎ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যার্ণব মশাই একটি বই লেখেন। বইটির নাম 'গীতাঞ্জলি'। কুমারখালির মথুরানাথ যন্ত্রে মহেশচন্দ্র দাস মুদ্রিত করেন।"

কবির শান্তিনিকেতনের শিক্ষক কর্মী সহযোগী ও বান্ধবের দল যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনেকে নানা ভাষার যোগ্য অনুবাদকও ছিলেন। কবির প্রতিভা বিকাশের পূর্বে এতদিন পর্যন্ত যাঁরা সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে ছিলেন তাঁরা বেশিরভাগই মুসলমান। যেমন মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী, শেখ সাদী, হাফিজ, ওমর খৈয়াম, হালি, মির্জা গালিব, ফিরদৌস প্রমুখ ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় কবি ও সাহিত্যিক। তাঁদের বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্য রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখার বহু ক্ষেত্রে মিল দেখে কবি তাঁদের ভাব চুরি করেছেন না লিখে কথাটা উল্টোভাবে লেখা হোল 'সমাজ দর্পণে' : "কবির জন্মের পূর্বেই মধ্যযুগের সাধকেরা বিনা স্বীকৃতিতেই চুরি করে নিয়েছেন। অদৃশ্য সিঁধ কাটবার কোথাও কোন একটি সহজ পথ নিঃসন্দেহে আছে।"

রবীন্দ্রগবেষকদের বক্তব্য যে, রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতাটি মধ্যযুগের পারস্যের কবি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমীর কবিতার নকল। যেটি পরে প্রমাণিত হয়েছে।

"বায্ আঁ, বায্ আঁ
হর আঁচে হাস্তী বায্ আঁ।
গর কাফির গর গবরওয়া
বোত পরস্তি বায্ আঁ।
ই দরগাহে মা দরগাহে

না-উম্মিদ নীস্ত।
শতবার গর তওবাহ শিকস্তী বায্ আঁ।"

এই কবিতাটি সামনে করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"এসো হে আর্য, এসো অনার্য
হিন্দু মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খ্রীষ্টান।
মা'র অভিষেক এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

রবি ঠাকুরের রচিত 'চিত্রা' কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' এবং 'মানসী' কাব্যের 'বধূ' কবিতা দুটির ভাব ও কাঠামো ইংরেজ কবি মিঃ শেলী ও মিঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার অনুরূপ বলে অনেক গবেষকের মত।

"নারায়ণ বিশ্বাস প্রথম ধরে দেন 'গোরা' এবং 'ঘরে বাইরে' নকল। একথা অবশ্য আগে বলবার চেষ্টা করেছিলেন প্রিয়রঞ্জন সেন। তারপর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত একটি মেয়েও 'গোরা' এবং 'ঘরেবাইরে'র সাথে দুটি ইংরেজি উপন্যাসের সাদৃশ্যের কথা বলেছিলেন। এর বেশি বলতে সাহস পাননি। কালীমোহন ধরে দিয়েছিলেন রবীন্দ্র কবিতার নকল। ... 'জনগণমন' তিনি লিখেছেন আশুতোষ চৌধুরীর পরামর্শে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে। আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন তাঁর ভাইঝি জামাই, প্রমথ চৌধুরীর বড় ভাই। এই রবীন্দ্রনাথই ডঃ ডেভিডের মধ্যস্থতায় আশুতোষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে 'চার অধ্যায়' লেখেন। এটা এখন প্রমাণ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, 'ঘরে বাইরে'ও তাঁকে টাকা দিয়ে লেখানো হয়। অনেক অন্ধ রবীন্দ্রভক্ত বলেছেন যে, পঞ্চম জর্জকে বন্দনা করে নয়, 'জনগণমন' আসলে ঈশ্বরকে বন্দনা করে লেখা। ঈশ্বর তো বিশ্বব্যাপী। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর কেন শুধু বৃটিশ ভারতের উপনিবেশের ভৌগলিক সীমায় আবদ্ধ রইলেন? এ প্রশ্নের কী জবাব দেবেন তাঁরা?" [দ্রষ্টব্য : ডেইলি পত্রিকা 'দৈনিক বাংলা বাজার'; তারিখ ১.৫.১৯৯৭]

'চার অধ্যায়ে'র কথা বলতে গেলে এ কথাটুকু লুকিয়ে রাখা যাবে না যে, ওটাতে আছে ইংরেজের মহিমা প্রচার। কারণ ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে বইটির হাজার হাজার কপি বিভিন্ন কারাগারে আটক রাজবন্দীদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল

এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রামেগঞ্জে যাত্রা ও নাটকে অভিনয় করে দেখানো হয়েছিল। [দ্রষ্টব্য ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত : সরকার শাহাবুদ্দিন আহমেদ, পৃ. ৪০৪]

মুসলিম বিদ্বেষী বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত সমীহ করতেন রবীন্দ্রনাথ। কারণ তাঁর জানা ছিল যে, বঙ্কিম বৃটিশের এক নম্বরের বাছাই করা ব্যক্তি। শত্রু মিত্র সকলকে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং সৃজনশীল লেখক।

একবার রবীন্দ্রনাথের সাধ হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একতাল লড়াই করার। কিন্তু সাহস করে সামনে থেকে ঠেলা না দিয়ে পিছন থেকেই মেরেছিলেন ধাক্কা। বঙ্কিম বুঝতে পেরেছিলেন এ ওস্তাদি ধাক্কা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কারও নয়। ব্যাপারটি এইরকম : "কিছুদিন আগে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির এক কর্মচারী ও ব্রাহ্ম সমাজের সহ সম্পাদক কৈলাশচন্দ্র সিংহ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক পাল্টা প্রবন্ধ লেখেন। একটুখানি উদ্ধৃতি দিই— 'হে বঙ্গীয় লেখক! যদি ইতিহাস লিখিতে চাও তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর। কাহারও অনুবাদের প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করিও না। উইলসন, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতির পদলেহন করিলে কিছুই হইবে না। স্বাধীনভাবে গবেষণা কর। না পার গুরুগিরি করিও না' ইত্যাদি।"

বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত উত্যক্ত হয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন যে এ ধাক্কা রবীন্দ্রনাথের। জবাব লিখতে গিয়ে তাঁর মনের ক্ষোভ প্রকাশ হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা সম্বন্ধে তিনি বললেন, 'গালিগালাজের বড় ছড়াছড়ি, বড় বাড়াবাড়ি আছে। আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি গালিগালাজে প্রভু অপেক্ষা ভৃত্য মজবুত। এখানে বলিতে হইবে প্রভুই (রবীন্দ্রনাথ) মজবুত। তবে প্রভু, ভৃত্যের (কৈলাশচন্দ্র সিংহ) মেছোহাটা হইতে গালি আমদানি করেন নাই, প্রার্থনা মন্দির হইতে আনিয়াছেন। উদাহরণ অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন। কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না। মেছোহাটার ভাষা এতদূর যায় না।' [দ্রষ্টব্য : 'জ্যোতির্ময় রবি ও কালো মেঘের দল : সুজিতকুমার সেনগুপ্ত, পৃ. ৯৮-৯৯]

রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, তিনি ধরা পড়ে গেছেন বঙ্কিমের অনুমানের কষ্টিপাথরে। তিনি জানতেন যে, বৃটিশ পাওয়ার হাউসের সঙ্গে বঙ্কিমের যোগ ছিল প্রত্যক্ষ। তাই তিনি পরাজয় বরণ করে 'ভারতী' পত্রিকায় লিখলেন, "বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, 'ভারতী'তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে 'গালিগালাজের বড় ছড়াছড়ি আছে'। শুনিয়া আমি নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। বঙ্কিমবাবুর লেখা প্রসঙ্গে আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি। কিন্তু কোথাও গালি দেই নাই। তাঁহাকে গালি দেওয়ার কথা আমার মনেও আসিতে

পারে না। তিনি আমার গুরুজনতুল্য। তিনি আমার চেয়ে কিসে না বড়? আমি তাঁহাকে ভক্তি করি। আর কেই বা না করে?"— পরিশেষে তরুণ রবীন্দ্রনাথ খোলাখুলিভাবে বললেন, "ভুল বোঝাবুঝির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যেন তাঁকে মার্জনা করেন ও আগের মতোই যেন তিনি তাঁকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন।" [ঐ, পৃ. ৯৮-৯৯ দ্রষ্টব্য]

একমাত্র কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাঁর 'মিঠেকড়া'তে পরিষ্কার বলেই দিয়েছিলেন যে, "রবীন্দ্রনাথ মোটেই লিখতে জানতেন না, স্রেফ টাকার জোরে ওঁর লেখার আদর হয়। কিন্তু বরাবর এতো নির্বোধের মতো লিখলে চলে কখনো? ...'গীতাঞ্জলি' নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর জনরবের কি ধূম— রবীন্দ্রনাথ কোন বাউলের খাতা চুরি করে ছেপে দিয়েছেন। ... শেষে অবশ্যি নামও জানা গেল— স্বয়ং লালন ফকির মহাশয়ের বাউল গানের খাতা চুরি করেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। আজ অবিশ্বাস্য শোনালেও একথা কিন্তু সত্যি, সেদিন বহু ব্যক্তি শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন কর্তাকে বলেছেন এবং লিখেছেন— রবিবাবু বড় কবি স্বীকার করি। ... যাকগে, তা গীতাঞ্জলির খাতাটা এবার উনি ফিরিয়ে দিন। প্রাইজ তো পেয়েই গেছেন, অনেক টাকাও হাতে এসে গেছে, ওতো আর কেউ নিতে যাচ্ছে না, তা গান লেখা খাতাটা উনি দিয়ে দিন।"

"পাঁচকড়িবাবু সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে, রবীন্দ্রনাথের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা একটা হুজুগ মাত্র। ... কারণ রবীন্দ্র সাহিত্য অনুরাগ বিশুদ্ধ ন্যাকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। পাঁচকড়িবাবু একথাও বহুবার স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন— রবীন্দ্রনাথের প্রায় যাবতীয় সৃষ্টিই নকল। বিদেশ থেকে ঋণ স্বীকার না করে অপহরণ।" [দ্রষ্টব্য জ্যোতির্ময় রবি ও কালো মেঘের দল : সুজিতকুমার সেনগুপ্ত, পৃ. ১১১ এবং ১৬১]

বিরুদ্ধ-লেখাতে কবি কিন্তু দুঃখ পেতেন খুব। দ্বিজেন্দ্রলালের লেখায় বেদনা পেয়ে তাঁর পুত্র দিলীপ কুমারকে কবি লিখেছিলেন, "কোনদিনই তোমার পিতার বিরুদ্ধে কারোর সঙ্গে আলোচনা করিনি। ... তোমার পিতাকে আমি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধাই করেছি।" [অধ্যাপক দীপন চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫]

১৯৩৯-এ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দুঃখের সঙ্গে লিখেছিলেন,"কাব্য বিশারদ সুরেশ সমাজপতি, দ্বিজু রায়, বিজয় মজুমদার, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি অনেক প্রধান ব্যক্তি কুশ্রী ভাষায় অক্লান্তভাবে আমার প্রতি শরবর্ষণ করেছেন। [পৃ. ১৭]

কবির সঙ্গে কাদম্বরীর অবৈধ প্রেমকে কেন্দ্র করে নাকি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংঘর্ষ হয়েছিল। সেটাকে কেন্দ্র করে ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'পাপের ছাপে' লেখায় কবিবিরুদ্ধ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ঠাকুরবাড়ির সুভোঠাকুর সম্পাদিত 'ভবিষ্যত' পত্রিকায় কবির বিরুদ্ধে লেখা বের হয়। সুভোঠাকুর কবির জন্য লিখেছিলেন, "পয়েট টেগোর কে হন তোমার জোড়াসাঁকোতেই থাকো / বাবার খুড়ো যে হন শুনিয়াছি, মোর কেহ হয় নাকো।" [পৃ. ২৩]

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্র বিরোধী লেখা লিখেছেন। অধ্যাপক দীপন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "এই কাদম্বরী ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে আর এই এক পারিবারিক কলঙ্ক এবং নানা সমালোচনা শুরু হয়ে যায়।" [পৃ. ২৪]

রবীন্দ্র বিরোধী নবীন কালা পাহাড়দের লালন করেছিল 'অগ্রগতি'। 'অগ্রগতি' পত্রিকাটি সেই সময়কার বিখ্যাত পত্রিকা বলা যায়। তাতে নামজাদা যেসব লেখকেরা লিখতেন তাঁরা হচ্ছেন সুভো ঠাকুর, আশু চট্টোপাধ্যায়, বিরাম মুখোপাধ্যায়, মণি বাগচি, হীরালাল দাশগুপ্ত, দীনেশ দাশ, বিমল মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য কুমার, সাগরময় ঘোষ প্রমুখ। বস্তুত 'কল্লোল' এবং 'অগ্রগতি' প্রধানত ছিল রবীন্দ্র সমালোচক।

রবীন্দ্রনাথকে অশ্লীল লেখার অভিযোগে অনেকেই অভিযুক্ত করেছেন। কবি বিরক্ত হয়েছেন তাতে, দুঃখও পেয়েছেন অনেক। কবি লিখেছিলেন, "এ রকম তর্ক উঠলে আমি কুণ্ঠিত হই। বর্তমান কালে আমার লেখা মুখরোচক হোক না হোক, আমি কিছুমাত্র অপেক্ষা করিনে। ... আমাকে কেউ পছন্দ করুন বা না করুন, এখন আমার চেয়ে ভাল লিখতে পারুন বা না পারুন, সে আলোচনা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।" [পৃ. ৬০]

কিছু গবেষকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথকে তৈরি করে নিয়েছে বৃটিশ। আর নোবেল প্রাইজও পাইয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। আমরা সকলে তাতে একমত হই আর না হই, কবির প্রখর প্রতিভা অনস্বীকার্য জেনেও তাঁর পারিবারিক প্রারম্ভিক আলোচনা করলে দেখা যাচ্ছে, যদিও তিনি কবিতা লিখতে পারতেন হঠাৎ একদিন তাঁর ভাগ্না জ্যোতিপ্রকাশ মামাকে ডেকে বললেন, "তোমাকে কবিতা লিখিতে হইবে। ইহার পর চৌদ্দ অক্ষরে পয়ার কি করিয়া লিখিতে হয় তাহাও শিখাইয়া দিলেন। তখন তাঁহাকে আর কে ঠেকাইয়া রাখে?"

"উহা দেখিয়া তাঁহার এক দাদা হেমেন্দ্রনাথ কিংবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শ্রোতা সংগ্রহের উৎসাহে সকলকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন" [দ্রঃ আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয়, ১৯৯৩, নীরদ সি. চৌধুরী, পৃ. ৯৩]

পত্রিকাওয়ালাদের উপরে ঠাকুরবাড়ির প্রভাবের কথা আগেই বলা হয়েছে। তখনকার 'ন্যাশনাল' পত্রিকার সম্পাদক নবগোপাল মিত্রকে ঠাকুরবাড়িতে আনানো হোল। কবির কবিতা দেখানো হোল তাঁকে। তিনি সংশোধন করে দিলেন কিছু কাটাকাটি করে।

নর্মাল স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট গোবিন্দবাবুও ছিলেন এক বিশেষ ব্যক্তি। তিনি স্কুলে রবিকে ডেকে বললেন, সুনীতি সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখে আমাকে পড়ে শোনাও। কবি লিখে আনলেন এবং উচ্চ স্বরে তা আবৃত্তি করলেন। কবিকে যে কবিতা লিখতেই হবে, তাঁকে যে প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে, একটা হৈ চৈ যে করতেই হবে এটা প্রমাণিত হতে পারে ঐ অল্প দৃষ্টান্ত থেকেই। এগুলো কাকতালীয় নয়, এ এক বিশেষ ইঙ্গিত। তাহলে কি সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছিল যে, ঠাকুরবাড়িতে এমন একজনকে তৈরি হতে হবে যাঁকে নোবেল প্রাইজ দিতে কোন বাধা থাকবে না সাহেবদের?

নোবেল প্রাইজের কথা বলতে গিয়ে 'গীতাঞ্জলি' নামটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে তা বলা হয়েছে। প্রচার করা হয়েছে যে, গীতাঞ্জলির অনুবাদ নিজেই করেছিলেন কবি। কিন্তু একদল বুদ্ধিজীবী সন্দেহ পোষণ করে আসছেন তাতে। কারণ বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করা একটা কথা। আর বাংলা কবিতার ইংরাজিতে কাব্য ও কবিতা করে অনুবাদ করা অন্য কথা। অবশ্যই তিনি বাংলা ভাষার কবি ছিলেন। ইংরেজি ভাষার কবি তিনি আদৌ ছিলেন না।

যাঁকে দীনবন্ধু এন্ড্রুজ বলা হয়, ঐ মিঃ এন্ড্রুজ ছিলেন একজন বিলেতি সাহেব পণ্ডিত এবং ধর্মতত্ত্বে বিজ্ঞ। ১৮৭১-তে জন্ম এবং ১৯৪০-এ মৃত্যু। "১৮৯৩ সনে ক্লাসিকাল ট্রাইপস (অনার্স)-এ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। আর ১৮৯৫ সনে থিওলজি ট্রাইপসেও প্রথম শ্রেণীতেই পাস করেন। উহা ডবল ফার্স্ট হওয়া, শিক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক।" ১৯০৬ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত তিনি স্টিফেন কলেজের প্রফেসর ছিলেন। পরে সিমলার সানাওয়ার-এ লরেন্স মিলিটারি এসাইলামের প্রিন্সিপাল হন। ভারতবর্ষে আসেন ১৯০৪-এর মার্চ মাসে, ৩৩ বছর বয়সে। দিল্লিতে কেম্ব্রিজ ব্রাদারহুডে যোগ দেন। ১৯১২-তে রবীন্দ্রনাথ যখন বিলাতে, তখন তিনিও ভারত থেকে সেখানে পৌঁছালেন। পূর্বেই যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল না তা বলা যায় না। সেই বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী-সভায় যেখানে উইলিয়াম রোটেনস্টাইনের বাড়িতে কবি স্বয়ং, সঙ্গে আছেন বিখ্যাত কবি ইয়েটস্, সেখানে মিঃ নেভিনসন এনড্রুজকে নিয়ে গেলেন কেন? সেই গুরুত্বপূর্ণ সভাতে মিঃ এজরাপাউণ্ড পর্যন্ত ছিলেন। মিঃ এনড্রুজের লেখা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে, কবির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ হয়ে গেছে পূর্বেই। তাঁকে দেখেই কবি বলেছিলেন— "But in a moment he had clasped my hand

and said to me : 'Oh Mr. Andrews, I have so longed to see you. I cannot tell you how much I have longed to see you." যার বাংলা দাঁড়ায় : একটি মুহূর্তে তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন এবং বললেন, ও এন্ড্রুজ মশাই, আপনাকে অনেকদিন থেকে দেখতে চাইছিলাম। আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না যে আপনার জন্য কতটা অধীর ছিলাম আমি।

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য হয়ে যেমন মিস মার্গারেট নোবল অবিবাহিতা হয়েই জীবন কাটিয়েছেন, এন্ড্রুজও তেমনি অবিবাহিত হয়ে বাংলাদেশেই কাটিয়েছিলেন তাঁর জীবন। তিনি নাম পেয়েছিলেন 'নিবেদিতা' আর ইনি নাম পেয়েছিলেন 'দীনবন্ধু'।

• রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী তিনি ইচ্ছামত লিখে দিতেন বা সংশোধন করতেন একথা নীরদ সি. চৌধুরী লিখেছেন— "তিনি রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি যেখানে উচ্চাঙ্গের বলিয়া মনে করিতেন না, উহাকে সাহিত্যিক করিয়া দিতেন।... রবীন্দ্রনাথের যে সব মত তাঁহার ভাল লাগিত না তাহা বদলাইয়া নিজের বিচার অনুযায়ী পরিবর্তন করিয়া দিতেন। অর্থাৎ তিনি রবীন্দ্রনাথকে যতটুকু সম্ভব শ্রেষ্ঠ অ্যানড্রুজ বলিয়া দেখাইতেই চাহিতেন।... ইয়েটস্ সম্পাদনার কার্যে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি কিছু সংশোধন করিতেছেন, এইরূপ কোন ইঙ্গিত করিয়া থাকিবেন। অ্যানড্রুজ উহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া রোটেনস্টাইনকে বলিয়া উহা বর্জন করাইলেন। ... নিজের ইংরেজি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মোহ দেখিয়া ইয়েটস্ একটু বিরক্তির বশেই রোটেনস্টাইনকে ১৯৩৫ সনে লিখিয়াছিলেন, '... Tagore does not know English. No Indian knows English. Nobody can write with music and style in a language not learned in childhood and ever since the language of his thoughts.' [দ্রঃ ঐ, পৃ. ১০৯]

এখানে বোঝা গেল যে, প্রখ্যাত কবি ইয়েটস্ রোটেনস্টাইনকে লিখেছেন এই বিশ্বাসেই যে, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি জানেন না, কোন ভারতীয়ই ভাল ইংরেজি জানে না। আর যে ভাষা কেউ শৈশবে শেখেনি বা যে ভাষা কারোর চিন্তাভাবনার ভাষা নয় তার পক্ষে সে ভাষা সুন্দর করে লেখা সম্ভব নয়। কিন্তু মিঃ ইয়েটস্ বেচারা ভুলই করেছিলেন। তিনি তখন জানতেই পারেন নি যে ঐ লেখাগুলো তাঁদের ইংলণ্ডেরই এক মহারথীর শিল্প নিপুণতা।

নীরদবাবু লিখেছেন, "এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি যথাযথ ইংরেজি অনুবাদ করেন নাই, যে কোন কারণেই হোক উহা অশুদ্ধ অনুবাদ হইয়াছিল।" তিনি আরো দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির যে কবিতাগুলো অনুবাদ করে বা করিয়ে তিনি পেয়েছিলেন নোবেল প্রাইজ, সেগুলো ইংরেজ কবিদের নকল

মাত্র। এটা তাঁর ভিত্তিহীন দাবী নয়! কবির ইংরাজি করা গীতাঞ্জলির ৬১, ২৬ ও ৮৬ নং কবিতাগুলোর পাশাপাশি ইংরেজ কবি Solomon এবং St. Francis-এর ইংরেজি কবিতা বা গান পরস্পর সাজিয়ে দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের তৈরি করা কবিতার সঙ্গে ইংরেজ কবিদের বহুলাংশেই মিল রয়েছে। অনেকের ধারণা ভাব ও ভাষায় মিল রয়েছে প্রায় ৯০ শতাংশ। তাহলে কি তাঁদেরই ইঙ্গিতে বিলেতের কবিদের 'থিম' তাঁকে পূর্বেই গোপনে পরিবেশন করা হয়েছিল?

একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়ার পিছনে যাঁদের ভূমিকা ছিল তাঁদের মধ্যে অবিভক্ত বঙ্গে সৃষ্টি করা বাঙালী বুদ্ধিজীবীবৃন্দ প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশে রাজা মহারাজা প্রভৃতি উপাধিধারী বৃটিশের সহযোগীদের নামও হিসেবের বাইরে নয়। আমরা অধিকাংশ মানুষ এইটুকুই জানি, শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত বহু বিভাগ সুশোভিত বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ঠাকুরবাড়ির অর্থেই হয়েছে। অর্থ দিয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন নোবেল প্রাইজের টাকা, তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দিয়েছেন তাঁর সম্পূর্ণ গহনা ইত্যাদি। কিন্তু এ তথ্য সম্পূর্ণ নয়। আসল কথা হচ্ছে, বৃটিশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিতে ভারতের রাজা মহারাজা রায়বাহাদুর প্রভৃতি বৃটিশ সহযোগীদের বহু অর্থ যোগ হয়েছে এখানে। সেইসঙ্গে বহির্ভারতের সাহেব-মেমদেরও বিপুল অর্থ পৌঁছেছে এখানে— "দেশ বিদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং অনেক প্রতিষ্ঠানও শান্তিনিকেতনে অর্থ সাহায্য করেন। যেমন ত্রিপুরারাজ প্রথম থেকেই আর্থানুকুল্য করেন। বরোদা, জয়পুর, পিঠাপুরম, কাঠিয়াওয়ার, পোরবন্দর, লিমডি, আওয়াগড়ের রাজন্যবৃন্দ, হায়দারাবাদের নিজাম, হালোয়াসিয়া ট্রাস্ট ইত্যাদি।" [দ্র. বিশ্বভারতীর অনুমোদিত 'শান্তিনিকেতন নির্দেশিকা', ১৯৯০, পৃ. ১৫]

মিঃ উইলিয়াম পিয়ারসন মৃত্যুর পূর্বে দান করে গেছেন তাঁর জীবনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ। 'দীনবন্ধু' উপাধিপ্রাপ্ত সাহেব মিঃ এন্ড্রুজ তাঁর জীবনের সমস্ত অর্থ দেওয়া ছাড়াও ভারত ও ভারতের বাইরে থেকে 'বহু অর্থ কবিকে সংগ্রহ করে দেন'। মিঃ লেনার্ড এলমহার্স্ট-এর স্ত্রী মিসেস ডরোথি দীর্ঘকাল ধরে দান করে গেছেন বিপুল অর্থ। ফ্রান্সের ম্যাডাম ডীন 'বিশ্বভারতীতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অর্থ দান করেন'।

ছাপাখানার মেশিন যন্ত্রপাতি কেনবার জন্য মোটা অঙ্কের টাকা এসেছিল আমেরিকা থেকে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। তাছাড়া 'গান্ধীজী নিজে বিশ্বভারতীর জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন'। [তথ্য ঐ, পৃ. ১৫]

এই প্রতিষ্ঠানটি হিন্দু ধর্ম বহির্ভূত ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের প্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছিল বলেই প্রচারিত। 'মহর্ষিদেবকৃত ট্রাস্ট ডীডে উল্লেখ আছে যে, ধর্মভাব উদ্দীপনের জন্য

বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার উদ্যোগ করিবেন। এই মেলায় সকল সম্প্রদায়ের সাধু পুরুষেরা আসিয়া ধর্ম বিচার ও ধর্মালাপ করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোনপ্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না।' [দ্র. ঐ, পৃ. ৩৪-৩৫]

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের দুটি ক্ষেত্র। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন। শ্রীনিকেতন "প্রধানতঃ পল্লীসংগঠন কুটীর ও কারুশিল্পচর্চা কৃষি বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্র। এখানে বি. এস-সি. (কৃষি) ও এম. এস-সি. (কৃষি) এবং বি. এস. ডব্লিউ. ও এম. এস. ডব্লিউ. পড়ানো হয়। ইংল্যাণ্ড নিবাসী এল. কে. এলমহার্স্ট-এঁর আর্থানুকুল্যে গঠিত।" [ঐ, দ্রষ্টব্য পৃ. ৪৩]

উচ্চশিক্ষিতএবং ভারতে প্রাচীন সভ্যতা সৃষ্টির সমর্থক ছিলেন এল. কে. এলমহার্স্ট। তাঁর দান ও মানের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শ্রীনিকেতনকে যিনি রক্ষা করেছেন, তিনি একজন বিদেশী— কি না তিনি দিয়েছেন।" [দ্রঃ নন্দন, শারদ সংখ্যা ১৪০১]

রতনকুঠী গেস্ট হাউস যেটি বিরাট মোটা অঙ্কের অর্থে তৈরি হয়েছে, সেটি 'দানবীর রতন টাটার আনুকুল্যে নির্মিত। ঐ দানবীরের নামানুসারে ঐ অঞ্চলকে বলা হয় রতনপল্লী'।

এই শান্তিনিকেতন থেকে এনড্রুজ পৃথিবীর বহু জায়গায় গিয়েছেন। যেমন পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিজি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি। ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশেই তাঁকে ঘুরতে হয়েছে। তার আসল কারণ ছিল রাজনৈতিক। নীরদ সি. চৌধুরী লিখেছেন, "তাঁহাকে যাযাবর বলিলে ভুল হইবে। যাযাবর বিশিষ্ট উদ্দেশ্যে খাদ্যের জন্য একস্থান হইতে অন্য জায়গায় যায়, পাখিরাও খাদ্যের জন্যই একদেশ হইতে বহু দূরদেশে যায়। এনড্রুজ যাইতেন রাজনৈতিক উত্তেজনার তাড়নায়।"

কবির সঙ্গে এনড্রুজের সম্পর্ক ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। সেইসময় ভারতের রাজনৈতিক প্রখ্যাত হিন্দু নেতা ছিলেন গান্ধীজী, মুসলমানদের মধ্যে ছিলেন আলি ব্রাদার্স অর্থাৎ মৌলানা মহম্মদ আলি ও শওকত আলি। গান্ধী যখন মৌলানাদের খেলাফত কমিটিতে যোগ দিলেন তখন সারা ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে তৈরি হোল এক মিলন সেতু। রবীন্দ্রনাথ তখন আমেরিকায়। আর শান্তিনিকেতনের হর্তাকর্তা ঐ সময় এনড্রুজই। এনড্রুজ শওকত আলিকে শান্তিনিকেতনে সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন। ইংরেজ বা সরকার বিরোধী শওকত আলির সেখানে আসার সংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ এন ড্রুজকে লিখলেন : "If Shaukat Ali can come to Shantiniketan and talk to our boys about his fanatical programme it will be difficult for me to ask students from all parts of the world to come there and accept from India her gift of peace and wisdom ..." [দ্রঃ নীরদ সি. চৌধুরী : আত্মঘাতী বাঙালী-৩য়,

পৃ. ১১৭] যার ভাবার্থ হোল, শওকত আলি যদি শান্তিনিকেতনে এসে ছাত্রদেরকে তাঁর গোঁড়া মতবাদের কথা বলেন তাহলে আমার পক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের ছাত্রদেরকে সেখানে আসতে বলা এবং ভারত থেকে শান্তি ও জ্ঞানের পাঠ নিতে বলা কঠিন হবে।

'গীতাঞ্জলি'র গুপ্তরহস্য বলতে গেলে আরো দু-একটি কথা জানানো প্রয়োজন। গীতাঞ্জলি যাঁরা দেখেননি তারা অনেকে মনে করেন যে, মোটা গীতাঞ্জলি বইখানির পুরো ইংরেজি অনুবাদ বিলেতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর তাঁর কবি প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁরা দিয়ে দিলেন নোবেল প্রাইজ।

"ইহার পর ইংরেজী 'গীতাঞ্জলী'তে রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ কবিতার অনুবাদ আছে বলা প্রয়োজন। ইহার নাম 'গীতাঞ্জলী' হইলেও বইটিতে বাংলা 'গীতাঞ্জলী'র সব গান (বা কবিতা) অনূদিত হয় নাই— বাংলাতে ১৫৭টি গান ছিল, উহার মধ্যে শুধু ৫৩টি মাত্র ইংরেজি করা হইয়াছিল, ইংরেজি 'গীতাঞ্জলী'তে সবশুদ্ধু ১০৩টি কবিতা ছিল (বইটি বড় টাইপে মাত্র ১০১ পৃষ্ঠা হইয়াছিল, দাম হইয়াছিল মাত্র চার শিলিং ছয় পেন্স— আমাদের টাকায় তিন টাকা ছয় আনা)। বাকি ইংরেজিতে অনূদিত কবিতা আসিয়াছিল প্রধানত 'নৈবেদ্য' ও 'খেয়া' হইতে, অল্প কয়েকটি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবিতা হইতে।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ১৪২]

ঠাকুরবাড়ির ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কবিতা, কাব্য, গান, চিত্রাঙ্কনের প্রতিভা অধিকাংশেরই ছিল। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাছাড়া অর্থের জোরে বহু প্রতিভাবান ও প্রতিভাবতীদের তাঁরা পুষতে পারতেন, ইচ্ছামত আনাতে পারতেন ও পারতেন ইচ্ছামত কাজে লাগাতে। রবীন্দ্রনাথের দাদা সোমেন্দ্রনাথও অত্যন্ত প্রতিভাবান ছিলেন, যিনি চারণকবির মত চলতে ফিরতে কবিতা বা গান তৈরি করতে পারতেন। কোন্ মর্মবেদনা দুঃখ বা জ্বালায়, ঘৃণা বা অভিমানে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তা বলা বেশ কঠিন। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ দাদার জন্য যা লিখেছেন তার মর্মার্থ হোল, তিনি নাকি রবীন্দ্রনাথকে খুব ভালবাসতেন।

এবার একটি মর্মান্তিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "রবীন্দ্রনাথের অখ্যাত দাদাদের মধ্যে সবচেয়ে গুণী সোমেন্দ্রনাথ, পাগল হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁর ভ্রাতৃপ্রেম চলে যায়নি। তিনি ছোটবেলায় ছোটভাইয়ের কবিতার সমঝদার বের করার জন্যে আমলাদের মাঝখানে ঘুরে বেড়াতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন— 'আমার দাদা এই সকল রচনায় গর্ব অনুভব করিয়া শ্রোতা সংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন'।" "রবীন্দ্রনাথ যেবার নোবেল প্রাইজ পেলেন সোমেন্দ্রনাথের কী আনন্দ। সারা বাড়ি দৌড়ে বেড়ান আর চিৎকার করেন— 'রবি প্রাইজ পেয়েছে, রবি প্রাইজ পেয়েছে'। আবার নাতিরা

যখন তাঁর কাছে যায় তিনি ঘরের ভেতর তাদের ডেকে এনে ফিসফিস করে বলেন, 'জানিস তো গীতাঞ্জলীর সবকটি কবিতা কিন্তু আমার লেখা। রবি আমার কাছ থেকেই তো নিয়েছে।' এই কথা শুনে নাতিরা যখন বলেন, 'তাহলে তুমি এত আনন্দ করছ কেন', সোমেন্দ্রনাথ তখন খেপে যান, চেঁচিয়ে বাড়ি মাৎ করে বলেন, 'তোদের এত হিংসে কেন রে, আমার ছোটভাই নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, আমি আনন্দ করব না তো কে করবে? কার লেখা, তাতে কী?" [দ্রঃ অমিতাভ চৌধুরী : ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ২৩, ছাপা ১৪০০ বঙ্গাব্দ]

অন্যদিকে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর মনে হয় রবীন্দ্রনাথের উপর তিনি ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন। সোমেন্দ্রনাথ পিছনে তাঁকে 'কেরাণী' বলে তিরস্কার করতেন। তার অর্থ এও হতে পারে যে তাঁর লেখাগুলোই কেরাণীর মত লিখে দিয়ে পেয়ে গেলেন নোবেল প্রাইজ। কিছুদিন এমন হয়েছিল যে বাড়িতে কোন অতিথি এলেই তাঁকে নিয়ে গিয়ে বলতেন, "চল আমার সঙ্গে। আমার বাড়ীতে একজন কেরাণী আছে। তাকে দেখবে চল।" তারপর আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলতেন, "ঐ দেখ কেরাণী, কলম পিষছে তো পিষছেই। তাঁর ধারণা ছিল, তিনি যদি ঠিকমত লিখতেন, তাহলে ছোটভাইয়ের (রবীন্দ্রনাথ) চেয়ে অনেক বড় লেখক হতে পারতেন।" [ঐ. পৃ. ২৩]

সোমেন্দ্রনাথের প্রতিভার কথা কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। তিনি খুব পান খেতেন— তাঁকে রোজ পান সেজে দিতেন নাতবৌ কমলাদেবী— দীনেন্দ্রনাথের স্ত্রী। এই কমলাদেবী তাঁর খুব প্রিয়পাত্রী ছিলেন। দেখতে না পেলেই সোমেন্দ্রনাথ মুখে মুখে কবিতা বানিয়ে ডাক পাড়তেন তাঁকে। [পৃ. ২৫]

কবি সারা জীবনের অজস্র লেখার মধ্যে কত মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন। তাতে তাঁর বাবা, কাকা, দাদু, দিদি, ভাই, ছেলে, মেয়ে, জামাই, নাতি, নাতনি, বন্ধুবান্ধব কতজনই স্থান পেয়েছেন। কিন্তু এতবড় প্রতিভা দাদা সোমেন্দ্রনাথের মত্যুর পর কবির কোন শোকমাখা বাক্য বা বেদনা প্রকাশের চিহ্নস্বরূপ কোন লেখা পাওয়া যায় না মোটেই। তাই বিখ্যাত রবীন্দ্র-গবেষক শ্রী অমিতাভ চৌধুরীও ঐ একই প্রশ্ন নিয়ে লিখেছেন : "সোমেন্দ্রনাথের মৃত্যু তাঁর অতি নিকটজন ছাড়া কারও মনে কোন রেখাপাত করেনি। ছোটভাই রবীন্দ্রনাথের কোন শোকজ্ঞাপক মন্তব্যও আমরা জানতে পারিনা। বিশাল ঠাকুরবাড়ির বিশাল পরিবারের ভিড়ে তিনি হারিয়ে গেছেন।" [ঐ, পৃ. ৩০]

একটা কথা উড়িয়ে অস্বীকরা করা যাবেনা যে, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পূর্বে কবির বাজারদর ছিল খুব নিচুমানের। মূল্য নির্ধারকেরা অনেকে লিখেছেন, "ঠাকুর নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পূর্বে প্রায় অশিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হতেন। আমার ম্যাট্রিকুলেশন

পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্রে ঠাকুরের একটি রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সেটাকে বিশুদ্ধ ও সাধু বাংলায় লেখার নির্দেশ ছিল। এবং এটা ছিল ১৯১৪ সালে তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির একবছর পরে।" [জাস্টিস আব্দুল মওদুদ : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, ১৯৮২, পৃ. ৪০৮]

এই প্রেক্ষিতে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯০৭-এ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ রীবন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সঙ্গীতের উপর একটা ডিগ্রি দেবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু অক্সফোর্ডের তদানীন্তন চ্যান্সেলর লর্ড কার্জন এই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দেন। কার্জনের বক্তব্য হোল, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি খ্যাতিসম্পন্ন গুণী ভারতবর্ষে আছেন। [অধ্যাপক ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার : রবীন্দ্রনাথ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পৃ. ১৪৮]

রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রথম প্রকাশক চিন্তামণি ঘোষ দায়িত্ব নিয়েছিলেন ১৯০৮ সালে। তার পূর্ব থেকেই অব্যাহত ছিল কবির লেখালেখির গতি। কিন্তু প্রথম দিকে কোন প্রকাশক এগিয়ে আসেননি, নিজের খরচেই ছাপাতে হয়েছিল তাঁর বই 'কবিকাহিনী'। প্রকাশক হিসাবে নাম ছিল কবির বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষের। দ্বিতীয় বই 'বনফুল' প্রকাশ করেন কবির দাদা ঐ সোমেন্দ্রনাথ। যিনি গীতাঞ্জলীর লেখক বলে দাবী করেছিলেন। কবির বই ছাপানোর পর সেইসময় জনগণের দৃষ্টিতে বইগুলো এমনই অচল ছিল যে, প্রেসের ভিতরেই অবিক্রিত হয়ে থেকে যেত সেগুলো। কবি তা স্বীকার করে নিজের ভাষায় বলেছেন, "শুনা যায়, সেই বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেল্ফ ও তাঁহার চিত্তকেভারাতুর করিয়া বিরাজ করিতেছিল।" [শ্রী অমিতাভ চৌধুরীর ঐ বই, পৃ. ৭৮]

তারপর কবির ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বইগুলো ছাপেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। ভাগ্নে বলেছেন, "১৮৯৬ সালে 'রবিমামা'র প্রথম কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশ করেন তিনিই। তারপর বহুবছর রবীন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে অনেকটা নিজের উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে। নিজের খরচে বইয়ের পর বই তিনি ছাপিয়েছেন। ... রবীন্দ্রনাথের বই অনেক সময় বিক্রি করতে হয়েছে অর্ধেক দামেও। তা নিয়ে সেকালে কম ঠাট্টা বিদ্রুপ হয়নি। ... ১৯০০ সালে কবির বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে তিনি লিখেছিলেন— 'ভাই, একটা কাজের ভার দেব? ... আমার গ্রন্থাবলী ও ক্ষণিকা পর্যন্ত সমস্ত কাব্যের কপিরাইট কোন ব্যক্তিকে ৬০০০ টাকায় কেনাতে পারো? শেষের যে বইগুলি বাজারে আছে, সে আমি সিকিমূল্যে তার কাছে বিক্রি করব— গ্রন্থাবলী যা আছে, সে এক তৃতীয়াংশ দামে দিতে পারব (কারণ এটাতে সত্যের অধিকার আছে, আমি স্বাধীন নই। আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস, যে লোক কিনবে সে ঠকবে না। ... আমার প্রস্তাবটা কি তোমার কাছে দুঃসাধ্য বলে ঠেকছে?

যদি মনে কর ছোটগল্প এবং বউঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি কাব্য গ্রন্থাবলীর চেয়ে খরিদ্দারের কাছে বেশি সুবিধাজনক বলে প্রতিভাত হয় তাহলে তাতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস কাব্য গ্রন্থগুলোই লাভজনক।' এইভাবে নানারকম ঝামেলার মধ্যে কবির বই প্রকাশ করতে হয়েছে। পরে প্রকাশনার ভার নিল এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। তাদের কাছ থেকে দায়িত্ব এসে পড়ে বিশ্বভারতীর ওপর ১৯২৩ সালে।" [পৃ. ৭৯]

এরপর কবির লেখাগুলোর উপর ঠেকে গেল ইংরেজদের পরশমণির প্রভাব। কবির বই ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে বিলেতের ম্যাকমিলান কোম্পানি প্রকাশ করলেন সেগুলো। তারপরে বিশ্বভারতীও ইংরেজি বই প্রকাশ করতে শুরু করল। এক্ষেত্রে অনেকেই মনে করেন যে, যদি কবি নজরুল-সুকান্তের মত দরিদ্র হতেন তাহলে প্রতিভা বিকাশ এবং পরিণতি কী হোত তা বলা কঠিন।

বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির এমন হার্দিক সম্পর্ক ছিল যে, একজন বিদেশী বৃটিশ আইনজীবী ঠাকুরবাড়ির সম্পদ, সম্পত্তি সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক উন্নতির পরামর্শদান ইত্যাদি বিষয়ে যুক্ত ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে।

ইংরেজদের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করা এবং ইংরেজরাজকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে এবং বিপক্ষে দুটি দল ছিল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে বললেন : "রাগ করিয়া যদি বলি 'না আমরা চাইনা', তবুও আমাদিগকে চাহিতেই হইবে, কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এক হইয়া মহাজাতি বাঁধিয়া উঠিতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজ রাজত্বের যে প্রয়োজন তাহা কখনোই সম্পূর্ণ হইবে না।" [অধ্যাপক ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার : রবীন্দ্রনাথ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ১৯৮৮, পৃ. ১৩৩ দ্রষ্টব্য]

ইওরোপ বা বিলেতকে তিনি এত উঁচু নজরে দেখে ফেলেন যে, তিনি লেখেন, "য়ুরোপ গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে?" [দ্রষ্টব্য ঐ, পৃ. ১৩৩-৩৪]

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদেরকে অত্যন্ত ভালবেসে লিখেছিলেন, "শ্রীযুক্ত দেশানুরাগ যদি পারেন তো আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার বিশ্বাস ইংরাজ মেয়েদের মত সুন্দরী পৃথিবীতে নেই। নবনীর মত সুকোমল শুভ্র রংয়ের উপর একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা এবং দীর্ঘ পল্লব বিশিষ্ট নির্মল নীল নেত্র— দেখে পথকষ্ট দূর হয়ে যায়।" [দ্রষ্টব্য নীরদচন্দ্র চৌধুরী : আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ২৫]

কবি আরও লেখেন, "আজ পৃথিবীকে য়ুরোপ শাসন করিতেছে বস্তুর জোরে, ইহা অবিশ্বাসী নাস্তিকের কথা। তাহার শাসনের মূল শক্তি নিঃসন্দেহেই ধর্মের জোর, তাহা ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না।"

কবি আরও লেখেন, "ইংরেজদের আহ্বান আমরা যে পর্যন্ত গ্রহণ না করিব, তাহাদের সঙ্গে মিলন যে পর্যন্ত না সার্থক হইবে, সে পর্যন্ত তাহাদিগকে বলপূর্বক বিদায় করিব, এমন শক্তি আমাদের নাই। যে ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, ইংরেজ সেই ভারতের জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ— আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে দূর করিব, আমাদের এমন কী অধিকার আছে। বৃহৎ ভারতবর্ষের আমরা কে?"

তিনি আরও লিখলেন, "ইংরেজদের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, ইংরেজ তাহা যে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সেজন্য আমরা দায়ী আছি। আমাদের দৈন্য ঘুচাইলে তবেই তাহাদেরও কৃপণতা ঘুচিবে। ... সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে, তবেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ যাহা দিতে আসিয়াছে, তাহা দিতে পারিবে।"

কবি এও লিখেছেন, "অন্য পক্ষে যাহারা কাণ্ডজ্ঞানবিহীন অসংযত ক্রোধের দ্বারা ইংরেজকে উন্মত্তভাবে আঘাত করিতে যায়, তাহারা ইংরেজের পাপ প্রকৃতিকেই জাগরিত করিয়া তোলে। ভারতবর্ষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ইংরেজের লোভকে, ঔদ্ধত্যকে, ইংরেজের কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতাকেই উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে, এই যদি সত্য হয়, তবে এজন্য ইংরেজকে দোষ দিলে চলিবেনা, এর অপরাধের প্রধান অংশ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।" [রবীন্দ্র রচনাবলী খণ্ড ১৩, পৃ. ৫৩ এবং ডঃ পোদ্দার, ঐ, পৃ. ১৩৫ দ্রষ্টব্য।]

১৯০৮-এর ২৪শে ডিসেম্বর লর্ড মিন্টোকে যে অভিনন্দন জানানো হয়, অর্থাৎ প্রশাসকদের শোষণ ভুলে গিয়ে শান্তিপূর্ণ শাসনে বিগলিত হয়ে অভিনন্দনে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল তা আজকের নিরিখে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তাতে নামকরা সব হিন্দু জমিদার ও বুদ্ধিজীবী এলিটরা সই করেছিলেন। যেমন ছিলেন দুই বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের সমস্ত দেশি সদস্য আর প্রধান প্রধান জমিদারবর্গ। আর ছিলেন ঠাকুরবাড়ির রবীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় তালিকায় নাম ছিল ঠাকুরবাড়ির সত্যেন্দ্রনাথের। [তথ্য: অধ্যাপক পোদ্দার, ঐ, ১৩৮-৩৯]

অরবিন্দ, বিপিন পাল, পি. মিত্র প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির অনেকেই যুক্ত ছিলেন এ কথার দু রকম অর্থ হতে পারে। একটা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে ছিলেন ঠাকুরবাড়ি, দ্বিতীয়তঃ, এও হতে পারে যে, ঐ দলের গূঢ় তথ্য জানার জন্য দলে যোগ

দিয়েছিলেন। যদি ধরেই নেওয়া হয় যে, কবি সন্ত্রাসবাদের পক্ষেই ছিলেন, তাহলে স্পষ্টভাবে তিনি একথা কিভাবে বলতে পারলেন, "আজ দস্যুবৃত্তি তস্করতা অন্যায় পীড়ন দেশহিতের নাম ধরিয়া চারিদিকে সঞ্চরণ করিতেছে, একি এক মুহূর্তের জন্য তাহারা সহ্য করিতে পারেন যাহারা জানেন আত্মহিত, দেশহিত, লোকহিত যে কোন হিতসাধনই লক্ষ্য হউক না কেন, কেবলমাত্র বীর ও ত্যাগী ও তপস্বী তাহার যথার্থ সাধক। জাতির চরিত্রকে নষ্ট করিয়া আমরা জাতিকে গড়িয়া তুলিব এমন ভয়ঙ্কর ভুলকে তিনি কখনোই এক মুহূর্তের জন্য স্থান দিতে পারেন না যিনি ধর্মকেই শক্তি বলিয়া জানেন।"

রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের বাংলাভাষার গদ্য পদ্য সাহিত্য কাব্য রচনায় যেন ছিলেন হিমালয়। তিনি জানতেন বাংলা ভাষা কোথায় কোথায় প্রচলিত। সমগ্র বঙ্গ দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার, উড়িষ্যা, নেপাল, ভুটান, ত্রিপুরা ও আসাম প্রভৃতি বিরাট এলাকা জুড়ে বাংলাভাষা প্রচলিত ছিল তখন। অতএব বাংলা ভাষাভাষী লোক যত বৃদ্ধি হবে এবং তাঁরা যত শিক্ষিত হবেন ততোই রবীন্দ্রনাথ খুশি হবেন এটাই সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। কিন্তু বঙ্গভাষীদের খণ্ড বিখণ্ড করে তাদের একতাবদ্ধ হতে না দিয়ে এবং বাংলা, ফার্সী ও নানা ভাষার মিশ্রণে প্রস্তুত উর্দু ভাষার গুরুত্ব কমিয়ে তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত বাংলা শব্দ, উর্দু ব্যাকরণ আর দেবনাগরী অক্ষর নিয়ে একটি খিচুড়ি ভাষা তৈরি করার প্রয়োজন বোধ করে ইংরেজরা। ঐ সময় ইংরেজের স্তাবকেরা সরকারের ঐ কাজে সহযোগিতা করবে তা স্বাভাবিকই ছিল। বাংলা ভাষাকে নিহত না করলেও আহত করার মত কাণ্ড যাঁরা বরদাস্ত করেন নি তাঁরা হচ্ছেন বাঙালী মুসলিম ডঃ শহীদুল্লাহ, বাঙালী মুসলিম সৈয়দ নওয়াব আলি, বাঙালী মুসলিম মাওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ। অপরদিকে ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীরা প্রতিবাদ না করে মেনে নিলেন সেটা। বৃটিশ শাসকের হিসাব অনুযায়ী ভারতে তখন নাকি ১৭৯টি ভাষার অস্তিত্ব ছিল। দেশ স্বাধীন হলে ইংরেজির পরিবর্তে কোন্ ভাষা সর্বভারতীয় ভাষারূপে গৃহীত হবে এ প্রশ্ন তুলেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তা আশ্চর্যের চেয়েও আশ্চর্য। গান্ধীজীকে রবীন্দ্রনাথ লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন— "The only possible National language for inter provincial inter-course is Hindi in India." কি করে যে তিনি বাঙালী কবি হয়ে হিন্দি ভাষাকে বরণ করে নিয়ে কাদের খুশি করলেন, কারা ক্ষতিগ্রস্ত হোল সে প্রশ্ন থেকেই গেল। বাংলা ভাষার বেঁচে থাকা এবং তার উন্নতিতে উপকার হোল কি অনিষ্ট হোল সে বিচারের দায়িত্ব প্রত্যেক বাঙালীরই।

বঙ্গের মুসলমানেরা বাংলাভাষা পছন্দ করতেন না বা করেন না এটা কিন্তু রটনা, ঘটনা নয় মোটেই। বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি ও প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের অবদান কারোর চেয়ে কম নয় বরং বেশি। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের রচনাবলী থেকে তা প্রমাণিত। সারা পৃথিবীতে প্রথম বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছে বিশেষতঃ মুসলিম বাঙালীরাই। এই বিষয়ে এক বাঘা বাঙালী লেখকের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"সেই অবিভক্ত বাংলার বিধানসভায় নব নির্বাচিত মুসলমান সদস্যরাই ছিল খাঁটি বাঙালী। এর আগে রাজনীতিতে আসতেন শুধু বড় বড় জমিদার, উকিল, ব্যারিষ্টার বা রায়বাহাদুর খাঁনবাহাদুর। তাঁদের পোষাক হয় সাহেবী অথবা চোগা চাপকান। মুখের ভাষা সব সময়ই ইংরেজি। কিন্তু গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধিরা বিধান পরিষদে নিয়ে এলেন বাংলা ভাষা। লুঙ্গির ওপরে পাঞ্জাবী পরে আসতেও তাঁদের দ্বিধা নেই। পশ্চিমবাংলার দিকের মুসলমানরা তো ধুতিও পরেন নিয়মিত। তাঁরা তাঁদের বক্তব্য বাংলা ভাষায় পেশ করতে লাগলেন। তখন নিয়ম ছিল কোন সদস্য বাংলায় বক্তৃতা করলে তা রেকর্ড করা হোত না। বক্তব্যের সারাংশ ইংরেজিতে তর্জমা করে দিতে হত। তাই সই। তবু তাঁরা বাংলা বলবেনই।

বাঙালী হিন্দু নেতারা ততদিনে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি ধরেছেন বটে, কিন্তু বক্তৃতার সময় ইংরেজির ফোয়ারা ছোটান। কে কি বললেন, সেটা বড় কথা নয়। কে কত জোরালো ইংরেজির তুবড়ি ছোটাতে পারেন, সেটাই যেন গর্বের বিষয়। হিন্দু নেতাদের মধ্যে এরকম একটা হীনম্মন্যতা ছিল যে, সর্বসমক্ষে বাংলা বললে লোকে যদি ভাবে যে, লোকটা ইংরেজি জানে না! শিক্ষিত মুসলমানদের ও বালাই নেই। যাঁরা ইংরেজিতে ভাল বক্তা, তাঁরাও ইংরেজি ছেড়ে প্রায়ই শুরু করতেন বাংলায়। স্বয়ং ফজলুল হক ছিলেন শিক্ষাদীক্ষায় অনেকের চেয়েই উঁচুতে, তিনি মাঝেমাঝেই ইংরেজির বদলে শুধু বাংলা নয়, একেবারে খাঁটি বরিশালী বাঙাল ভাষায় কথা বলতেও দ্বিধা করতেন না।"
[দ্রঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা পূর্ব-পশ্চিম, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯৭]

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেএকদল পণ্ডিতের মত যে, তিনি ছিলেন বাউল। বৃহত্তর জনসাধারণ এসব হয়ত কিছুই জানেন না। তাঁরা শুধু জানেন তিনি প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, সুরকার, চিত্রকর, অভিনেতা, জমিদার, দার্শনিক ইত্যাদি। স্বপক্ষ বিপক্ষ প্রত্যেককে স্বীকার করতেই হবে তাঁর বহুমুখী মৌলিক প্রতিভাকে।

বাউল সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সুধারণা ও কুধারণা দুটোই বিদ্যমান। অনেকেই মনে করেন, বাউলেরা একটি বিশেষ ধার্মিক সম্প্রদায়। তাঁদের ঐ ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিনীতি বর্জন করে গান গীত বা কবিতার মধ্যেই সীমিত

তাঁদের সাধনা। অন্য কোন দলের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ, তর্কযুদ্ধ, মামলা-মোকদ্দমার রাস্তায় মোটেই যেতে চান না তাঁরা। তাছাড়া প্রকৃত বাউলেরা তাঁদের বাউলতত্ত্ব গোপন রাখতে চান একান্তভাবে। বিভিন্ন ধর্ম থেকে আসা মানুষেরাই এই বাউলতত্ত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ইহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মের মতো কোন নবী বা অবতারকে তাঁরা মেনে চলেন না। বিভিন্ন স্থানে নানা নেতা গজিয়ে ওঠেন আর তাঁর নামেই তাঁর ভক্তেরা নিজেদের নামকরণ করে থাকেন। ফলে বাউল সম্প্রদায় বহু নামে পরিচিত। যেমন অধ্যাপক ডক্টর সুধীর চক্রবর্তীর মতে : "বাউল, নেড়া, দরবেশ, সাঞি, আউল, সাধিবনীপন্থী, সহজিয়া, খুশি বিশ্বাসী, রাধাশ্যামী, রাম সাধনিয়া, জগবন্ধু-ভজনিয়া, দাদু পন্থী, রৈদাসী, সেনপন্থী, রামসুনেহী, মীরাবাঈ, বিথল ভক্ত, কর্তাভজা, স্পষ্টদায়িক বা রূপকবিরাজী, রামবল্লভী, সাহেবধনী, বলরামী, হজরতজী, গোবরাই, পাগলনাথী, তিলকদাসী, দর্পনারায়ণী, বড়ি, অতিবড়ি, রাধাবল্লভী, সখীভাবুকী, চরণদাসী, হরিশ্চন্দ্রী, সত্নপন্থী, মাধবী, চুহড়পন্থী, পুরাপন্থী, বৈরাগী, নাগা, আখড়া, দুয়ারা, কামধেষী, মুকুটধারী সংযোগী, বারসাম্প্রদায়িকা ভাট, মহাপুরুষীয় ধর্মসম্প্রদায়ী, জগমোহিনী, হরিবোলা, রাত ভিখারী, উৎকলী, বিন্দুধারী, অনন্তকুলী, সৎকুলী, যোগী, গুরুদাসী বৈষ্ণব, খণ্ডিত বৈষ্ণব, করণ বৈষ্ণব, গোপ বৈষ্ণব, নিহঙ্গ বৈষ্ণব, কালিন্দী বৈষ্ণব, চামার বৈষ্ণব, হরিব্যাসী, রামপ্রসাদী বড়গল, নস্করী, চতুর্ভুজী, হারারী, বাণশয়ী, পঞ্চধুনী, বৈষ্ণব তপস্বী, আগরী, মার্গী, পল্টুদাসী, আপাপন্থী, সৎনামী, দরিয়াদাসী, বুনিয়াদদাসী, আহমদপন্থী, বীজমার্গী, অবধুতী, তিঙ্গল, মানভাবী কিশোরী ভজনী, কুলিগায়েন, টহলিয়া বা নেমো বৈষ্ণব, জোন্নী, শাঙম্মী, নরেশপন্থী, দশামার্গী, পাঙ্গুল, বেউরদাসী, ফকিরদাসী, কুম্ভপাতিয়া, খোজা গৌরবাদী, বামে কৌপীনে, কপীন্দ্র পরিবার, কৌপীন ছাড়া চোরাধারী, কবীরপন্থী, খাকী, মুলুকদাসী" ইত্যাদি। [দ্রঃ কর্তাভজা ধর্মমত ও ইতিহাস : অধ্যাপক শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, পৃ. ২০-২১, ১৩৮৩]

এইসব নামগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে ইচ্ছামতো নেতা নেত্রী বেছে নিয়েছেন এঁরা। এইসব তান্ত্রিক বৈষ্ণব ফকির যোগীদের বেশিরভাগই অশিক্ষিত ও নিরক্ষরপ্রায়। এঁদের গুপ্তসাধনা অত্যন্ত বীভৎস ও কুৎসিত। যা প্রকাশ্যে প্রচার করা বিপজ্জনক। সেই জন্যেই অত্যন্ত গোপনে তাঁরা রক্ষা করে চলেন তাঁদের তন্ত্রকে। অনেক শিক্ষিত গবেষক তাঁদের শিষ্য সেজে ভিতরে প্রবেশ করে পরে প্রকাশ করে দিয়েছেন অনেক তত্ত্ব।

"মিথুনাত্মক যোগসাধনী আধ্যাত্মবাদী বাউল সম্প্রদায়ের সাধনার মূল পদ্ধতি। বাউলের সাধনা দেহকেন্দ্রিক। 'দেহমন্দিরে প্রাণের ঠাকুর' অন্বেষণই বাউলের সাধনার সার।" [দ্রঃ বসন্তকুমার পাল : মহাত্মা লালন ফকির, পৃ. অবতরণিকা-১০, ১৩৬২]

প্রকৃত বাউলেদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁরা শরীরের কোনও স্থানের কেশ বা চুল কাটেন না। মল মূত্র শুক্র এবং রজঃ প্রভৃতি নোংরা অখাদ্য বস্তু নিজেদের মধ্যে

বিশেষ ভঙ্গিমায় রবীন্দ্রনাথ

খাওয়া ও খাওয়ানোর প্রথা আছে যেটা সাধারণভাবে অনেকের কাছেই কদর্য, বীভৎস, জঘন্য ও ঘৃণ্য বলে বিবেচিত। অধ্যাপক ডক্টর সুধীর চক্রবর্তী মহাশয়ও লিখেছেন, "বাউলদের ব্যাপারে দ্বিতীয় যে চিন্তাভাবনা বহু মানুষকে তাঁদের সম্পর্কে কৌতূহল অথবা বিদ্বেষ টেনে এনেছে সেটা চারিচন্দ্র ভেদ, অর্থাৎ মল মূত্র রজ বীর্য পান। বাউল তো শুধু নয়, আমাদের কায়াবাদী সাধকদের অনেকে দুই চাঁদ (মল মূত্র) বা চার চাঁদের চর্চা করেন। এ তো বহু শত বছরের ধারা। এককালে বাউলদের 'মুতখেকো' বলা হয়েছে। তাঁদের এই বিচিত্র সাধনাকে 'কদর্য' 'বীভৎস' 'জঘন্য' এইসব নিন্দাত্মক বিশেষণে ঘৃণা করা হয়েছে। ... সম্ভবতঃ ঐ বীর্যপানরত পুরুষ নিজের বীর্য দ্বারাই শরীরে এন্টিবডি উৎপন্ন করবে এবং তাতে শুক্রাণুর উৎপাদন অবশ্যই অল্প হবে। তাই দেখা যায়, বাউলদের সন্তান সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। ... রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাউলগানের ভাবমূল্যে ও ছন্দে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং দেশবাসীকে প্রথম সচেতন করেছিলেন বাউল গানের নিজস্বতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে।" রবীন্দ্রনাথ নিজেকেও বাউল বলে পরিচয় দিয়েছেন। ডক্টর সুধীরবাবু এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "তাঁর কোন কোন রচনাকে তিনি এমনকি 'রবীন্দ্র বাউলের রচনা' বলে মেনে নিয়েছেন।" [দ্রঃ 'দেশ', পৃ. ৩৬, ডিসেম্বর ১৯৯১]

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর শ্রী ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয় 'বাংলার বাউল' নামে এক বিখ্যাত বই লিখেছেন। বইটিতে তিনি ঋক সাম যজু অথর্ব বেদ বেদান্ত সামনে করে সংস্কৃত নানা শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বাউল সম্প্রদায়ের মূল উৎস বেদ থেকে। ক্ষিতিমোহনবাবু বাউলদের সম্পর্কে লিখেছেন, "দেহের মধ্যেই তাঁহাদের বিশ্ব। জাতি ও সমাজের বন্ধন উভয়ের কাছেই অর্থহীন। ... এই সন্তমত বা বাউলিয়া মতে সব গুরুরাই প্রায় হীনবংশজাত ও নিরক্ষর। এইসব নিরক্ষর দীনহীনের কথা বহুকাল ভারতের কোন বড় পণ্ডিতজনের লেখায় আত্মপ্রকাশ

করিতে পারে নাই। ... কলিকাতায় যখন ভারতীয় দর্শন মহাসভার মহা-অধিবেশন হইতেছে তখন তাহার স্থান হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-মন্দির। একেবারে পাণ্ডিত্যের প্রধান ঘাঁটিতে। দার্শনিক পণ্ডিতদের বিরাট সভায় বসিয়া সভাপতিরূপে ১৯২৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ যে Philosophy of our People নামে অভিভাষণ পড়িলেন, তাহা বাংলাদেশের এই নিরক্ষর বাউলদেরই কথা। এই অভিভাষণের সব তত্ত্ব ও আগাগোড়া বাণী বাংলার পল্লীবাসী নিরক্ষর বাউলদের রচনা হইতেই সংগৃহীত। তাহার পরে ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় নিমন্ত্রণ করিল সেখানে বিদ্বৎজন সভায় হিবার্ট বক্তৃতা দিতে। অক্সফোর্ড হইল সারা জগতের অভিজাত পণ্ডিতের একেবারে মুখ্যতম কৌলীন্য পীঠ। সেখানে বসিয়া গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দিলেন তাহাও ভারতের কোন শাস্ত্রসম্মত অভিজাতদর্শন বা বিদ্বানদের ধর্মতত্ত্ব লইয়া নহে। তাহা ভারতেরই নিরক্ষর দীনহীন সন্ত বাউলদের মানবধর্ম বা Religion of Man। ... বাউলদের বেশের ও ভাষের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই ভাবেরই মিলন আছে। তাঁহারা সর্বকেশ রক্ষা করেন, কারণ কেশের বিশেষভাবে রক্ষা না-রক্ষার দ্বারা বিশেষ সম্প্রদায় সূচিত হয়।" [পৃ. ১-৩, ঐ বই দ্রষ্টব্য]

"অথর্ববেদকে বাউলেরা নিজেদের প্রাচীনতম বাণী বলেন।" [পৃ. ১২] "তান্ত্রিকদের সঙ্গে বাউলদের কায়াবোধ এবং কায়াযোগেরই মিল দেখা যায়।" [পৃ. ২০] এই তান্ত্রিকদের নোংরামির কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

ডক্টর ক্ষিতিমোহনবাবু আরও লিখেছেন, "মহাভারতে বাউলিয়া বহু তথ্য আছে। ... বাউলদের সেরা কথাই মৈত্রেয় উপনিষদে, দেহই তোমার দেবালয়। তাহাতে যে জীব তিনিই তো শিব।" [এরপর আছে সংস্কৃত শ্লোক]

উপাচার্য মহাশয় সুনিপুণ ভাষায় বাউলদের সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন তাতে তাঁদের বীভৎস নোংরামির কথা চেপে রাখেন নি তিনি। তাঁর ভাষায়, "দেহতত্ত্বের গান ইঁহারা করেন। ইঁহাদের 'দেহ সাধনায় চারিচন্দ্রের ভেদ' অতি গোপনীয় ব্যাপার এবং তাহা অতি বীভৎস।" [পৃ. ৫১]

ঐ সব নিরক্ষর বাউলদের অশুদ্ধ গ্রাম্য ভাষার যে সব গান ভাইস চ্যান্সেলর স্বয়ং সংগ্রহ করেছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ সে সব গানের এমন সমর্থন ও প্রশংসা করলেন এবং তদানীন্তন ডিগ্রিধারী শিক্ষিতদের প্রতি কটাক্ষ করে যা মন্তব্য করেছিলেন তা অনেকের মতে সীমাতিরিক্ত ও অসমীচীন— "রবীন্দ্রনাথ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বলিলেন, 'শিক্ষিত লোকের মুরদ তো আমার অজানা নাই। এইসব জিনিস যে তাঁহাদের রচনার শক্তির বাহিরে তাহা আমি খুবই বুঝি। একটা গান পাইলে হয়তো তাহারা কতক অনুরূপ

আর একটা গান করিতে পারেন। কিন্তু মূলটা রচনা করা কোন শিক্ষিত লোকের কর্ম নয়। আমার তো তাহার কাছাকাছি শক্তিও নাই'।" [দ্রঃ বাংলার বাউল, পৃ. ৬৪, ঐ]

উপাচার্য ক্ষিতিমোহনবাবু তাঁর সংগ্রহ করা বাউলদের ঐ দ্ব্যর্থবোধক গানের সংগ্রহলিপি প্রকাশ করায় নিষেধ থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু প্রকাশ করে ফেলেছেন। তিনি তাঁর ভাষাতেই লিখেছেন, 'ইহার পর আমি নিজে আর বাউল বাণী বাহির করি নাই। যদিও তাহা সাজাইয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। প্রায় চল্লিশ বৎসর এগুলি শুধু নিজের কাছেই রাখিয়া নিজেই আলোচনা করিয়াছি। কখনো বন্ধুবান্ধবদের দেখাইয়াছি এবং আমার অন্তরের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছি, যাহার জন্য আমার এই সংগ্রহ। পরে রবীন্দ্রনাথ ও চারুবাবুকে তাঁহাদের দায়িত্বে দুই একটি বাণী প্রকাশ করিবার জন্য আমার খাতাগুলি দিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ তাহা তাঁহার দার্শনিক সভায় সভাপতির অভিভাষণে ব্যবহার করিয়াছেন। ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে আমার কাছে ঋণও স্বীকার করিয়াছেন।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ৬৪-৬৫]

ভাইস চ্যান্সেলর ড. ক্ষিতিমোহন সেন জানিয়েছেন, তরুণ বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বাউলদের সঙ্গে জড়িয়ে পরেন। তাঁর জমিদারির শিলাইদহ পরগণার কাছেই ছিল প্রতিভাবান লালন ফকিরের স্থান, সেটা ছিল কুষ্টিয়ার নিকট। লালনের জন্ম হিন্দু বংশে। সিরাজ সাঁই নামে মুসলমান ফকিরের কাছে দীক্ষা নেন ঐ লালন বাউল। লালনের শিষ্যধারার একজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের ডাকহরকরা বা পিওন, তার নাম ছিল গগন। সেই গগন বাউলের বাউলগান রবীন্দ্রনাথ তাঁর Hibbert বক্তৃতায় উদ্ধৃত করেছিলেন। লালনের সাধনাতে হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মেরই লোক দেখা যায়। "তাঁহার (লালনের) সাধনাতে দুই ধর্মেরই যোগ দেখা যায়— এই ধারার সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল।" [দ্রষ্টব্য ড. সেনের ঐ বই, পৃ. ৫৯] সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাউলদের নিবিড় যোগাযোগ ও প্রভাব প্রমাণিত হয়।

শুধুমাত্র কবির দাড়ি গোঁফ মাথার চুল না কাটা আর গেরুয়া রঙের লম্বা আলখাল্লা পরাটাই তাঁর বাউল হওয়ার পর্যাপ্ত কারণ নয়। সমালোচকেরা বাউলদের আলো ও কালো দিক বিচার করতে গেলে তাঁদের শ্রেণীহীন সমাজ গড়ার সারল্য যেমন চোখে পড়বে তেমনি উদারতার অতি বাড়াবাড়ি হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের সঙ্গে অবাধ যৌনজীবনের কালোদিকও প্রকাশিত হবে তাঁদের কাছে।

আমাদের ভারতীয় সমাজে কথিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেশির ভাগ মানুষই অতিমানুষ মহান মানুষ প্রতিভাবান মানুষের প্রতি ভক্তির মাত্রা বাড়াতে বাড়াতে তাঁকে বানিয়ে ফেলেন ঋষি, মহা-ঋষি, যোগী, মুনি, সাধক— সবশেষে ভগবান পর্যন্ত করে ফেলেন তাঁকে। অপরদিকে চরিত্রহীন, লম্পট, সমাজবিরোধী, অসংযমী, ব্যভিচারী প্রভৃতি লোককে সমাজের এত পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও ভাল চোখে দেখা হয় না। কবির ব্যক্তিগত

ব্যবহারিক জীবনে নারীসঙ্গ, অবাধ মেলামেশা যৌনতা বিষয়ে বিতর্ক আনবার কোন প্রয়োজনই নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী।

"১৯২৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তাঁর স্নেহধন্য দিলীপ কুমার রায়কে এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন। বিষয় : নারীর ব্যভিচার। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন, 'সমাজে যদি অশান্তি না ঘটে তাহলে ব্যভিচার ব্যভিচারই হয় না। সাঙ্ঘাতিক কথা, আজকালও এই দুঃসাহসিক উক্তি করতে কেউ সাহস পাবে না। তিনি বলেছেন 'ব্যভিচারের ফলে যদি সন্তান সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে আজকাল সেটাও সমস্যা নয়। কেননা কন্ট্রাসেপটিভ বেরিয়ে গেছে। নিবারণের উপায়গুলোও সহজ। সুতরাং গর্ভধারণ করতে হয় বলে দেহকে সাবধান রাখার দায় আর তেমন নেই।... সমাজ নিজের প্রয়োজন বশতঃ স্বভাবকে ঠেকিয়ে রাখে। ঠেকিয়ে রাখতে তার অনেক ছল বল কৌশল অনেক কড়াকড়ি অনেক পাহারার দরকার হয়। কিন্তু প্রয়োজনগুলোই যখন আলগা হতে থাকে, তখন স্বভাবকে ঠেকিয়ে রাখা আর সহজ হয় না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের দৃষ্টান্ত দেখ না। আমার যখনই ক্ষিদে পায়, তখন আমার কাছে যদি ফল না থাকে, তবে তোমার গাছ থেকে ফল পেড়ে খেতে আমার স্বভাবতই ইচ্ছা হয়। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তি সম্পত্তির সীমা রক্ষা করা সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক, এইজন্যই ফল পেড়ে খাওয়াটা চুরি। এই চুরি সম্বন্ধে সমাজ আমাদের মনে যে সংস্কার দৃঢ়বদ্ধমূল করে দিয়েছে সেটা নিজের ব্যবস্থা রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে। ... বস্তুত চুরি না করার নীতি শাশ্বত নীতি নয়, এটা মানুষের মনগড়া নীতি। এ নীতিকে পালন না করলে সমাজে যদি অশান্তি না ঘটে, তবে পরের দ্রব্য নেওয়া চুরিই নয়। এই কারণে তুমি দিলীপ কুমার রায় যদি আমি রবীন্দ্রনাথের লিচুবাগানে আমার অনুপস্থিতিতে লিচু খেয়ে যাও, তুমিও সেটাকে চুরি বলে অনুশোচনা কর না, আমিও সেটাকে চুরি বলে খড়্গহস্ত হই না। ব্যভিচার সম্বন্ধে এই কথাটাই খাটে। এরমধ্যে যে অপরাধ সেটা সামাজিক। অর্থাৎ সমাজে যদি অশান্তি ঘটে, তবে সমাজের মানুষকে সাবধান হতে হয়। যদি না ঘটে, তাহলে ব্যভিচার ব্যভিচারই হয় না।"

অধ্যাপক চৌধুরী লিখেছেন, "এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, চমকে ওঠার মত। সামাজিক রীতিনীতির কথা বরবাদ করে সত্য বস্তুকে তিনি সামনে তুলে ধরেছেন। 'ঋষি কবি'র চেয়ে রক্তমাংসের মানুষ রবীন্দ্রনাথ যে অনেক বড় তা তিনি দেখিয়েছেন।" [দ্রষ্টব্য অমিতাভ চৌধুরী : ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ]

রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ জীবন আলেখ্য যদি খুব খুঁটিয়ে দেখা যায় তাহলে অন্ধভক্ত ও স্বপক্ষীয়দের বাদ দিলে আরো দুটি পক্ষ থাকে, একটি বিপক্ষ এবং অপরটি নিরপেক্ষ। এই শেষ দুটি পক্ষের অনেকের একথা বলা অস্বাভাবিক নয় যে, বৃটিশের হাতে ভারতকে

তুলে দেওয়ার চক্রান্তে যে দলটি সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে তার মধ্যে ছিলেন ঠাকুরবাড়ির অনেক পুরুষ এবং মহিলা। প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে অনুগত ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের পরামর্শ, পরিকল্পনা গ্রহণ, মদ-মাংস-ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ব্যভিচার বা ইন্দ্রিয়রসের ছড়াছড়ি করিয়ে দেওয়ার মূল কারখানা যে ক'টি ছিল ঠাকুরবাড়ি তার শ্রেষ্ঠতম না হলেও শ্রেষ্ঠতর হওয়ার দাবীদার। এই সাংঘাতিক ধারণার সঙ্গে আমরা সহজে একমত হতে পারব না, কিন্তু এই দাবীকে খুব সহজে উড়িয়ে দেওয়ার স্পর্ধাও নেই আমাদের। কারণ এঁদের পক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দও আছেন। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন, বাঙালী জাতির সর্বনাশ করেছে ঠাকুরবাড়ি। বাঙালী জাতির পৌরুষ সৃষ্টিতে সহায়ক না হয়ে ক্ষতিকারক হয়েছে ঐ ঠাকুরবাড়ি। এককথায় ঠাকুরবাড়ির কালচার সম্পর্কে স্বামীজীর মনোভাব ছিল অত্যন্ত কঠোর। একটি উদ্ধৃতি দিলে পরিষ্কার হবে বিষয়টি— "কিন্তু স্বামীজী ঠাকুরবাড়ির কালচার সম্পর্কে কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন, ঠাকুরবাড়ির প্রভাব বাঙালী জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। তাঁর মত ছিল, ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য দর্শন বাঙালীর সমাজে পৌরুষ সৃষ্টিতে সাহায্য করবে না। তিনি রূঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন, এই পরিবার ইন্দ্রিয় রসের বিষ বাঙলাদেশে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাঁর তীব্র মন্তব্য : 'আমার জীবনোদ্দেশ্য রামকৃষ্ণ নয়, বেদান্ত নয়, আর কিছুই নয়— শুধু জনগণের মধ্যে পৌরুষ আনা'।" [দ্রষ্টব্য পবিত্রকুমার ঘোষ : সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকা, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭]

রবীন্দ্রনাথের গুণাবলীর মধ্যে একটি হোল, তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজের গুলিতে ভারতীয়দের নিহত হওয়ার কারণে দরদী হয়ে ত্যাগ করেছিলেন নাইট বা 'স্যার' উপাধি। প্রশ্ন হোল সেটা তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ত্যাগ করেছিলেন নাকি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন ?

ভারতীয় নেতা যাঁরা বিলেতে থাকতেন রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি পাওয়ায় ক্রোধে এবং ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন তাঁরা। সে সংবাদ কবির কাছে পৌঁছয়। সেই সঙ্গে গুজব হোক বা সত্য, কবিকে ঐ ভারতীয় প্রবাসী নেতারা খুন করে দেবেন বলে হুমকি দেন। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন, "তাঁর প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সংগঠন 'গদর পার্টি'র সদস্যদের প্রকাশ্য বিরূপতা; তাঁরা তাঁদের পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'স্যার' খেতাব গ্রহণ করে কবি নিজেকে সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট বিকিয়ে দিয়েছেন। একটি গুজব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে বিপ্লবীরা তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা রচনা করেছেন।" [দ্র. ডঃ পোদ্দারের পূর্বোক্ত বই, পৃ. ১৬৮]

অনেকের মতে এই হুমকির পর কবি নানারকম চাপে বা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়েই ঐ উপাধি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। সাধারণভাবে মনে হবে, বৃটিশের উপর ঘৃণা এবং

ক্রোধেই তিনি ঐ খেতাব ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু খেতাব ত্যাগের পত্রটিতে বৃটিশের কাছে যেভাবে অনুনয় বিনয় এবং তাদের মহানুভবতার কথা উল্লেখ করেন তাতে তাঁর দেশভক্তি অপেক্ষা ইংরেজভক্তির প্রাবল্য অস্বীকার করা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত প্রোফেসর ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার সেই দরখাস্তের বয়ানের অংশ উদ্ধৃত করেছেন, যাতে তিনি জানাতে চেয়েছেন যে, কবি রবীন্দ্রনাথ চেমস্‌ফোর্ডকে যে পত্রশিখেছিলেন তার শেষাংশে তিনি লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তিনি লেখেন— "তাঁর অন্তঃকরণের মহানুভবতার (নোবলনেস অব হার্ট) জন্য তিনি তখনও পরম শ্রদ্ধা পোষণ করেন। হার্ডিঞ্জের মহানুভবতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয় কিছু ছিল।" [দ্র. ঐ, পৃ. ১৩৯]

তাছাড়া তিনি ঐ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন একথা সত্য হলেও তা তিনি ত্যাগ করতে পেরেছিলেন বলে কোন প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি। কারণ তাঁর উপাধি ত্যাগের চিঠিটি ছিল ইংরেজ তোষণে ভরা এবং বৃটিশের কাছে তা গৃহীত হয়নি আদৌ।

আমাদেরকে শেখানো হয় যে, রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগে নিষ্ঠুরতার জন্য তাঁর ব্রিটিশের কাছ হতে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ পাওয়া পুরস্কার 'নাইট' বা 'স্যার' টাইটেল ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রযুগে সারা ভারতে যতো রায়বাহাদুর, খাঁনবাহাদুর, নাইট বা স্যার উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল বিশেষভাবে। এসব বিষয় ভুলে গিয়েও যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার দুটি কারণে : একটি হোল, তাঁর যোগ্যতা ছিল বলেই তিনি পেয়েছিলেন নাইট বা স্যার উপাধি। আর দ্বিতীয়টি হোল, সেটা পাওয়ার পরেও দেশের স্বার্থে ত্যাগ করেছেন সেই লোভনীয় উপাধিটি। সুতরাং তাঁর ইতিহাস স্বর্ণোজ্জ্বল করে রাখতে হবে আমাদের।

তাহলে অন্ততঃ একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বৃটিশের আর এক বিখ্যাত সুহৃদ অত্যন্ত অনুগত সহযোগী মুম্বই-এর ধনী ও মানী ব্যক্তি ছিলেন মোহাম্মদ ইউসুফ ইসমাইল। তাঁকেও ঐ একই বছরে দেওয়া হয়েছিল 'নাইট' বা 'স্যার' উপাধি। "যখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বা তা নিয়ে হইচই জোর কদমে চলছে। এই সব উত্তেজনার মধ্যে দেশপ্রেমী স্যার ইউসুফ ইংরাজ প্রদত্ত তাঁর উপাধি পরিত্যাগ বা বর্জন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবং সে বিষয়ে ইংরাজ কর্তাদের নিকট চিঠি লেখেন খেতাব ফেরত পাঠিয়ে।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ও ইউসুফ একই বছরে উপাধি পেলেন এবং নিজের নিজের উপলব্ধি বা অনুভূতির প্রেক্ষিতে দুজনেই তাঁদের উপাধি ত্যাগ করলেন। প্রকৃত বিচারে উভয়েই হবেন ইংরেজের সহযোগী বা স্তাবক অথবা উভয়েই হবেন দেশপ্রেমী বা

বীর। দুজনেই প্রতাপশালী ও ধনী। একজনের ইতিহাস জীবন্ত, আর একজনের ইতিহাস পাতালের অতলতলে সমাধিস্থ।

স্যার মোহাম্মদ ইউসুফ ইসমাঈল

রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি বিতর্কিত। তিনি তাঁর সুচিন্তিত মার্জিত ও প্রগাঢ় ভক্তিসহ উপাধিটি ফেরত দেবার জন্য ইংরেজি ভাষায় যে অনুনয় পত্রটি পাঠিয়েছিলেন, সেটা আমাদের ভারতীয়দের কাছে প্রচারিত ও প্রকাশিত। কিন্তু যেটা বিতর্কিত সেটা হোল, ইংরেজ সরকার কি সেটা গ্রহণ করেছিলেন? মনে হয় সরকার সেটা ফেরত নেননি। তার প্রমাণে বলা যায়, স্যার ইউসুফ স্যার রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে লিখেছিলেন যে : তিনি গভর্নরকে জানিয়েছিলেন, তাঁর পাওয়া ঐ নাইট উপাধি তিনি ত্যাগ কাতে চান। তাতে তাঁকে গভর্নরের পক্ষ থেকে উত্তরে জানানো হয় যে, ওটা ফেরত নেওয়া সম্ভব নয়।

স্যার ইউসুফ স্যার রবীন্দ্রনাথকে আরও লেখেন : আমার চিঠির উত্তরে তা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয় জানলাম। কিন্তু আপনি কী পদ্ধতিতে ফেরত দিয়েছেন বা ফেরত দেবার বিশেষ কোন নিয়ম আছে কিনা জানাতে অনুরোধ করছি।

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আমি নিজে কখনোও এই উপাধি ব্যবহার করিনা এবং বন্ধুদেরও তা করতে দিই না।' রবীন্দ্রনাথ আরও যা লিখলেন তার অর্থ এইরকম: আমি যখন নাইটহুড ফেরত দিয়ে চিঠি দিলাম তখন আপনার মতো আমাকেও জানানো হোল যে, শুধুমাত্র কাগজগুলো গভর্নরের কাছে ফেরত দিয়ে এটা পরিত্যাগ করা যাবে না; কেউ উপাধি না পেতে পারেন কিন্তু উপাধি পরিত্যাগ করা কোন মতেই সম্ভব নয়।

সুতরাং তাঁদের উপাধি ত্যাগ করার এমন কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। প্রমাণের জন্য ইউসুফ ইসমাইল এবং কবি রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি পত্রের অংশ তুলে দেওয়া হোল

"Dear Dr. Rabindranath Tagore,

... I have received a reply from the Secretary sending back the Letters Patent to me and intimating that I cannot divest myself of my Knighthood by the mere return of the same. ... May I encroach upon your precious time and request you to let me know whether any special procedure was adopted by you in renouncing the title and to let me know what steps were taken by you to divest your goodself effectively of the title. ...

Sincerely yours,

Sd/- Mohamad Yusuf Ismail "

এবার রবীন্দ্রনাথের পত্রটি :

"Dear friend,

In 1919 when I felt constrained to renounce my Knighthood as a protest against the Punjab atrocities, I was also informed like you that it was not possible to divest oneself of the said honour by merely returning the letters patent to the Governor General. One can be deprived of the honour by his Majesty the King Emperor but no resignation is possible. I do not myself use the title nor do I allow my friends to do the same. That was all, I was advised, I could do. With kind regards.

Yours sincerely,

Sd/- Rabindranath Tagore"

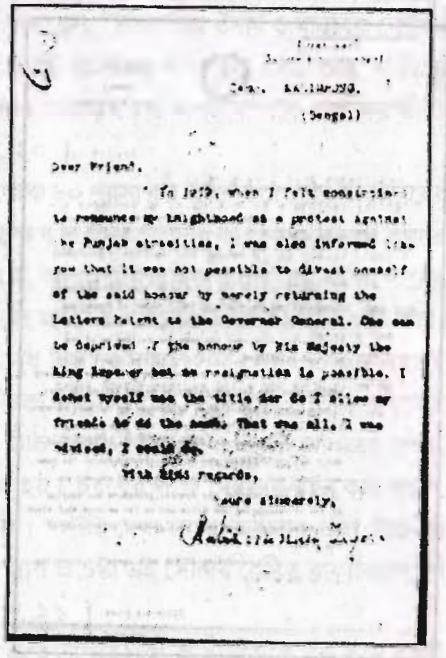

স্যার ইউসুফকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য কবি যদি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ 'নাইটহুড' ত্যাগ করতেন তাহলে ঐ তকমাটি তাঁর কাছে প্রতীয়মান হোত বিষাক্ত অগ্নিকন্টকের মতো। কিন্তু নানা চাপে পড়ে 'নাইটহুড' ত্যাগ করার পর কবি যা করেছিলেন তা এক বিস্ময়। কথাটি আকারে ছোট হলেও তা মারাত্মক ও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখলেন :

"এ মণিহার
আমায় নাহি সাজে।"

সুতরাং সেই সময়ের ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তাঁর 'নাইট' ত্যাগ করাকে কোন গুরুত্বই দিতে চাননি।

---

* স্যার ইউসুফ এবং স্যার রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব লেটারপ্যাডে টাইপ করা মূল চিঠিদুটির ফটোকপি তথ্যসহ 'দেশ', ৫ মে, ১৯৯০ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে অমৃতসরে সভা চলছিল কংগ্রেসের। বক্তারা সব বক্তব্য রাখলেন সরকারের বর্বরতার প্রতিবাদে। দেশের সেবায় কে কী করেছেন সে বিষয়ে জোরদার আলোচনা হোল একটা। সেখানে কবিগুরুর 'নাইট' ত্যাগের কোন উল্লেখই হোল না। তখন কংগ্রেস সভাপতি জহরলাল নেহরুর পিতা মতিলাল নেহরুর হাতে শ্রী অমল হোম কবিগুরুর 'নাইট' উপাধি ত্যাগের বিষয়ে একটা খসড়া করে তাঁর হাতে দিলেন। মতিলাল তা পড়ে তার উল্লেখ না করে কাগজটি একপাশে সরিয়ে দিলেন। তখন অমল হোম তাঁর পুত্র জহরলাল নেহরুকে সুপারিশ করলেন। তিনিও গুরুত্ব দিলেন না মোটেই। এক এক করে বহু নেতার কাছেই ফিস্‌ফিস্ করে বলতে গেলেন। আমল দিলেন না কেউই। দেশের ঐ গুরুত্বপূর্ণ সভার গুরুত্বপূর্ণ রেজলিউশনে রবীন্দ্রনাথের নাম কোন হিন্দু নেতাই ঢুকতে দিলেন না কোনমতে।

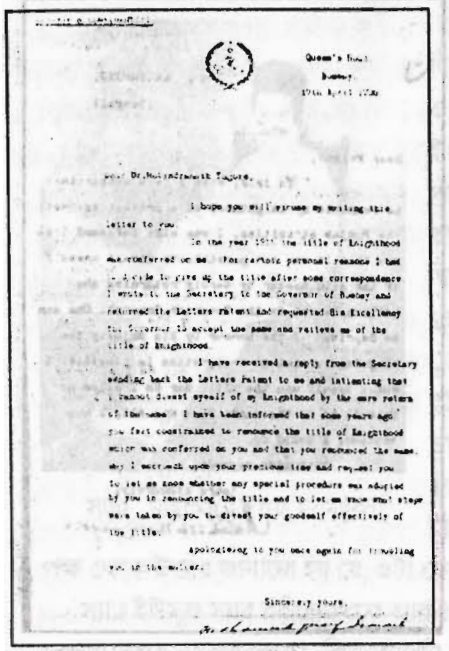

Queen's Road
Bombay.
17th April 1938

Dear Dr. Rabindranath Tagore,

I hope you will excuse my writing this letter to you.

In the year 1911 the title of Knighthood was conferred on me. For certain personal reasons I had to decide to give up the title after some correspondence I wrote to the Secretary to the Governor of Bombay and returned the Letters Patent and requested His Excellency the Governor to accept the same and relieve me of the title of Knighthood.

I have received a reply from the Secretary sending back the Letters Patent to me and intimating that I cannot divest myself of my Knighthood by the mere return of the same. I have been informed that some years ago you felt constrained to renounce the title of Knighthood which was conferred on you and that you renounced the same. May I encroach upon your precious time and request you to let me know whether any special procedure was adopted by you in renouncing the title and to let me know what steps were taken by you to divest yourself effectively of the title.

Apologising to you once again for troubling you in the matter.

Sincerely yours,
Mahomed Yusuf Ismail

রবীন্দ্রনাথকে লেখা স্যার ইউসুফের চিঠি

রেজলিউশন তৈরি হবার পর অমল হোম মহম্মদ আলি জিন্নাহ সাহেবকে জানালেন যে, এত নেতাকে রবীন্দ্রনাথের কথা বললাম, কেউই গুরুত্ব দিলেন না। জিন্নাহ সাহেব শুনে "আমাকে বলেছিলেন— তুমি আমাকে বললে না কেন?" পরের বছর ১৯২০-র ১৩ ই এপ্রিলে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রথম বাৎসরিক সভায় অধিনায়ক ছিলেন জিন্নাহ সাহেব। জিন্নাহ রবীন্দ্রনাথের বাণী চেয়ে পাঠালেন ঐ সভার জন্য। কবি বিস্ময়ে হতবাক হওয়ার পরেই সানন্দচিত্তে একটি দীর্ঘ ভাষণ লিখে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। [দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের কিশোর জীবনী : হায়াত মামুদ, পৃ. ৪৬]

জমিদারদের যে নীচ চরিত্র, শোষণের চরিত্র, কবি সেক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ভাল ছিলেন বলা যায় কারণ হিন্দু মুসলমানের বসার পৃথক ব্যবস্থা যে তুলতে চেয়েছিলেন সে আলোচনা করা হয়েছে আমার লেখা 'চেপে রাখা ইতিহাস' বইয়ে। তবুও জমিদারদের যে ঠাটবাট,

কথায় কথায় চাবুক ও জুতো চালানো, যাকে ইচ্ছা শাস্তি আর যাকে ইচ্ছা মুক্তি দেওয়া, যাকে ইচ্ছা ধ্বংস আর যাকে ইচ্ছা রক্ষা করার যে দাপট, রবীন্দ্রনাথও ছাড়তে পারেন নি তা। তাই অধ্যাপক অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন, "কিন্তু তাঁর ঔদার্য ও মানবিক বোধের ঐশ্বর্য সত্ত্বেও, জমিদার ও জমিদারির যে ঠাঁট যা সামন্ত সম্পর্কের একটি অঙ্গ, তা তিনি বর্জন করতে পারেন নি, জমিদারের ক্ষমতা আড়ম্বর ও দাপট সম্পর্কে প্রজাদের ভীতি থেকেই গেছে।" [ডক্টর পোদ্দার, পৃ. ২০]

কবিদের জমিদারিতেও টাকায় ৫০ থেকে ৬০ পয়সা কর বাড়িয়ে দেওয়ার অত্যাচারের ইতিহাসটিও বাস্তব সত্য। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ দার্শনিক হিসেবি কবি কি করে মনে করতে পারলেন যে, তাঁরা জমিদার হিসাবে মাথা, আর গরীব শ্রমিক ও চাষীদের মর্যাদা পায়ের মতো; আর পায়ের স্বাভাবিক কাজই হচ্ছে মাথাসহ শরীরের উপরের দিকটা বহন করা। কি করে তিনি লিখতে পারলেন যে, মানুষ হিসাবে সকলে সমান নয়। তাঁর ভাষাতেই তিনি লিখেছেন, "...সংসারে উচ্চ নীচতা যখন আছেই, সৃষ্টিলোপ ব্যতীত কখনোই যখন তাহা ধ্বংস হইবার নহে, তখন উচ্চ এবং নীচের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ থাকিলে উচ্চতার ভার বহন করা সহজ হয়। চরণের পক্ষে দেহভার বহন করা সহজ, বিচ্ছিন্ন বাহিরের বোঝাই বোঝা' ইত্যাদি। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, জমিদার-প্রজা, উচ্চনীচ সম্পর্কে নীচের পক্ষে সহনীয় করে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা এই সৌন্দর্য বেষ্টিত বাক্যবিন্যাসের মধ্যে রয়েছে।" [ডক্টর পোদ্দার, ঐ, পৃ. ২১]

কলকাতার কিছু বন্ধুবান্ধব যোগাড় করে তাঁদের সঙ্গে কবি নিজেকে যুক্ত করে একটি সুদের কারবার শুরু করেছিলেন— তার নাম দিয়েছিলেন 'কৃষিব্যাঙ্ক'। তাঁরা শতকরা সাত টাকা সুদ দিয়ে মুলধন যোগাড় করেছিলেন। আর কবি তাঁর জমিদারিতে গরীব প্রজাদের কাছ থেকে সুদ নিতেন শতকরা ১২ টাকা। [তথ্য ঐ, পৃ. ২২]

অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন : "আগেই বলেছি তিলকের লক্ষ্য ছিল হিন্দু স্বরাজ। প্রশ্ন উঠতে পারে রবীন্দ্রনাথ কী করে এই লক্ষ্যধারী রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।" [শ্রী চৌধুরীর পূর্বোক্ত বই, পৃ. ১২৪]

"প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনীতে লিখেছেন, 'পশ্চিম ভারতে যে রাজনৈতিক আন্দোলন তিলক কর্তৃক প্রবর্তিত হয়, রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে ভালরূপেই ওয়াকিবহাল ছিলেন'।"

রবীন্দ্রনাথ ও তিলকের মধ্যে এত সুগভীর সম্পর্ক ছিল যে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেই। শ্রী অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন, "তাতে দেখতে পাচ্ছি তাঁর দূত হিসেবে তিলক রবীন্দ্রনাথকে ইউরোপে পাঠাতে চেয়েছিলেন এবং সেই বাবদ ৫০ হাজার টাকা দিতেও চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শেষমুহূর্তে সেই প্রস্তাবে রাজি হননি।"

কবি স্বয়ং লিখেছেন, "তখন মহামান্য টিলক বেঁচে ছিলেন— তিনি তাঁর কোন দূতের যোগে আমাকে ৫০ হাজার টাকা দেবেন বলে পাঠিয়েছিলেন, আমাকে য়ুরোপ যেতে হবে। ... আমি বললুম, রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি য়ুরোপ যেতে পারব না। ... তারপরে বোম্বাই শহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ, সুতরাং দেশের কাজ করতে পারবেন, এর চেয়ে বড় আর কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশাই করিনি।"

"১৮৯৭ সালে তিলক গ্রেফতার হলে তাঁর মামলায় সাহায্যের জন্য টাকা জোগাড় করে পুণেতে পাঠানো হয়।" রবীন্দ্রনাথ ছিলেন টাকা সংগ্রহের প্রধান উদ্যোক্তা।

ভারতবর্ষের বাঙালী চরিত্র কেন এত অদ্ভুত এই আলোচনা করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এসে গেল। মুসলিমবিদ্বেষী বা হরিজন অনুন্নতদের বিরোধী নেতা অনেকেই তাঁদের কলুষ মানসিকতা নিয়েই মারা গেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য হোল, তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে সংশোধিত হয়েছিলেন নিজেই।

তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে তাঁর জমিদারির মুসলমান প্রজাদের শেষ দেখা করতে গিয়ে তিনি বললেন, "তোমরা আমার বড় আপনজন, তোমরা সুখে থাক। তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারিনি। ইচ্ছা ছিল মান সম্মান সম্ভ্রম সব ছেড়ে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে তোমাদের মতই সহজ হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেব। কী করে বাঁচতে হবে, তোমাদের সঙ্গে মিলেমিশে সেই সাধনা করব। কিন্তু আমার এই বয়সে তা আর হবার নয়। আমার সময় হয়ে এসেছে। এই নিয়ে দুঃখ করে কী করব? তোমাদের সবার উন্নতি হোক— এই কামনা নিয়ে আমি পরলোকে চলে যাব।" [দ্রঃ ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ : শ্রী অমিতাভ চৌধুরী, ১৪০০ সাল, পৃ. ৬]

হিন্দুদের গোরক্ষা সমিতি, গরুমার্কা রাজনীতি— তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ওটা ভুল পদক্ষেপ। তাই বললেন, "এ দেশে মহিষও দুধ দেয়, মহিষেও চাষ করে। কিন্তু তার কাটা মুণ্ডু মাথায় নিয়ে সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই, তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসে। কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল গরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম নয়, অন্ধ সংস্কার।" [ঐ, পৃ. ৭]

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, "ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি মুসলমানদের অস্বীকার করে একপাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গল প্রচেষ্টা সফল হবে, তাহলে বড়ই ভুল করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব,

আর বাকি তিনটে কড়িকে মানবই না, এটা বিরক্তির কথা হতে পারে কিন্তু ছাদ রক্ষার পক্ষে সুবুদ্ধির কথা নয়।"

কবি আরও লিখেছেন, "আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোরবানী নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল, তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্যে আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সঙ্গত মনে করিনি। কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা এমনভাবে যেন সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে, তারা তখনই তা মেনে নিলে। আমাদের এখানে এ পর্য্যন্ত কোনও উপদ্রব ঘটেনি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে মুসলমান প্রজার সম্পর্ক সহজ ও বাধাহীন।" [দ্রঃ ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ: অমিতাভ চৌধুরী, পৃ. ১০]

কবি বেদনা নিয়ে লিখেছেন, "আমরা নাকি ধর্মপ্রাণ জাতি। তাই তো আজ দেখছি ধর্মের নামে পশুত্ব দেশ জুড়ে বসেছে।"

দেশদরদী নেতাদের অনেকেরই ভণ্ডামি ধরতে পেরে তিনি বুঝেছিলেন যখন গরীব মুসলমান প্রজা ও অনুন্নতদের বলা হচ্ছিল বিলেতী নুন খাওয়া যাবে না, বিলেতী কাপড় পোড়াতে হবে ইত্যাদি, কৃষক ও অনুন্নতরা এটার কোন গুরুত্বই দেন নি; তাঁরা তখন অস্থির ছিলেন পেটের ভাতের জোগাড়ে। কবি বললেন, "দেশ বলতে তো মাটি নয়, এই সমস্ত মানুষই তো। তা, তোমরা কোনোদিন চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আর, আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কী নুন খাবে আর কী কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছ! এরা সইবে কেন, আর এদের সইতে দেব কেন?" [ডঃ পোদ্দার, ঐ, পৃ. ১২৮]

কবি মুসলমানদের জন্য হিন্দুদের বলেছেন, "জীবনের মহলে বরাবর তোমরা এক কোঠায়, ওরা আর এক কোঠায় কাটিয়ে এসেছে। আর, আজ তোমাদের দায় ওদের কাঁধের উপর চাপাতে চাও? তোমাদের রাগের ঝাল ওদের দিয়ে মিটিয়ে নেবে? আমি তো একে কাপুরুষতা মনে করি। ... কিন্তু ঐ গরীবদের স্বাধীনতা দলন করে তোমরা যখন স্বাধীনতার জয়পতাকা আস্ফালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব। তাতে যদি মরতে হয় সেও স্বীকার।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ১২৮-২৯]

হিন্দু নেতৃত্বের মূল্যায়ন করে কবি আবার বলতে পারলেন, "মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদেরকে জাতি রক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, সেই ম্লেচ্ছদের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ১২৫]

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে আরও লিখলেন, "আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ। আমরা বহু শত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলো ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ দুঃখে মানুষ, তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।" [ঐ, পৃষ্ঠা ১২৫]

মাটির দেশকে রক্তমাংসের মা বানিয়ে নেওয়া হোল, আবার দেবীর মতো মনে করে দেশ-মায়ের কাছে সাহায্যও চাওয়া শুরু হোল। কবির মতে ওটা একটা নেশা ছাড়া কিছু নয়। তিনি লেখেন, "কেননা, আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে দেশ ব'লেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না— চিৎকার করে মা ব'লে, দেবী ব'লে, মন্ত্র প'ড়ে যাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয়— তাদের সেই ভালবাসা দেশের প্রতি তেমন নয়, যেমন নেশার প্রতি।" [ঐ, পৃ. ১২৭]

কবি দেশকে 'মা' 'মা' বলে ডাকাকে প্রথমে সমর্থন করেছিলেন এবং সেইভাবে কবিতাও লিখেছিলেন। কিন্তু নিজের ভুল নিজেই শুধরে নিয়ে স্পষ্টভাবে দেশের লোককে জানিয়েছেন : (ক) "শুধু মা মা বলে দেশকে যারা ডাকাডাকি করে তারা চিরশিশু। দেশ বৃদ্ধ শিশুদের মা নয়, দেশ অর্ধ-নারীশ্বর— মেয়ে পুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি।" (চার অধ্যায়, ১৯৩৪) (খ) "বাংলাদেশের মেট্রিয়ার্কি বাইরে নেই, আছে নাড়ীতে। মা মা শব্দে হাম্বাধ্বনি তা আর কোন দেশের পুরুষ মহলে শুনেছ কি? (ল্যাবরেটরি, ১৯৪০ দ্রষ্টব্য) [সংগ্রহ : অধ্যাপক দীপন চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত পৃ. ১৯-২০]

অধ্যাপক দীপন চট্টোপাধ্যায় কবির জন্য আরও লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ ভাবাদর্শের দিক থেকে এই নগ্ন শক্তির উপাসনার বিরুদ্ধে ছিলেন। ভারতের শক্তি উপাসনা হয়ে আসছে ভয়ঙ্করী মা কালীর মূর্তিতে। ধার্মিক বিভ্রান্তি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ সাধ্যমত তা প্রত্যাখ্যান করেন।" [ঐ, পৃ. ২০]

শঙ্করীপ্রসাদ বসুও লিখেছেন, "ঠাকুর পরিবারের বোধহয় চরম কালীবিরোধীর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কালী সম্বন্ধে তীব্র বিতৃষ্ণা বোধ করে এসেছেন। তিনি তাঁর সাহিত্য জীবনের গোড়া থেকেই কালীপূজা বলতে নিম্নস্তরের হিংস্রতার উপাসনা বুঝে এসেছেন।"

ঠাকুরবাড়ির অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রসঙ্গেই বলেছেন, "লাট সাহেবদের মেম, সেনার সাহেব-সুবো ও বড় বড় মান্যগণ্য" লোকেদের নিমন্ত্রণ করে এনে ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মিকী প্রতিভা'র অভিনয় হয়েছিল। তাতে কিভাবে কালীপূজা দেখানো হয়েছিল তার বর্ণনা : "তারপর চলল আমাদের মদ খাওয়া। ... কালীমূর্তি দেখলেই রবীন্দ্রনাথ খেপে যেতেন। ... ক্রোধ ও বিতৃষ্ণায় কাঁপতে কাঁপতে রবীন্দ্রনাথ (রোমারোল্যাঁকে) বললেন, এ ধরণের রক্তমাখা নিম্নস্তর থেকেই চিরকাল মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে খুনীর হিংস্রতা, যুদ্ধ ও হত্যাকারী দেবতার উপাসনা, রক্তপানের রুচি।"

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র জীবনী'র চতুর্থ খণ্ডে উল্লিখিত আছে : "জওহরলাল নেহেরুকে একটি পত্রের মাধ্যমে : বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকার সময়ই রবীন্দ্রনাথ 'বন্দেমাতরম' গানটির প্রথম স্তবক সুর দিয়েছিলেন। কলকাতা অধিবেশনে তিনি প্রথম গান গাইবেন।"

'বন্দেমাতরম' গোটা গানটি পড়ে তার অর্থ তলিয়ে দেখে কবি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন— "ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুকে একটি পত্র দেন। তাতে লেখা ছিল : 'ভারতবর্ষে ন্যাশানাল গান এমন কোন গান হওয়া উচিত যাতে এটা হিন্দু নয় কিন্তু মুসলমান খৃষ্টান— এমনকি ব্রাহ্ম শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে যোগ দিতে পারে। 'ত্বাং হি দুর্গা কমলা কমল দল বিহারিণী' ইত্যাদি হিন্দু দেবদেবী— নামধারিনীদের স্তব, যাদের 'প্রতিমা পূজি মন্দিরে মন্দিরে' সার্বজাতিক গান মুসলমানদের গলধঃকরণ করাতেই হবে। হিন্দুর পক্ষে ওকালতি হচ্ছে এগুলি আইডিয়া মাত্র। কিন্তু যাদের ধর্মে প্রতিমা পূজা নিষিদ্ধ, তাদের কাছে আইডিয়ার দোহাই দেবার কোন অর্থই হয়না। (২৮শে ডিসেম্বর ৩য় খণ্ড) এই প্রসঙ্গে ডক্টর নেপাল মজুমদার মন্তব্য করেন, "বন্দেমাতরম গানের কেন্দ্রস্থলে আছে দুর্গার স্তব, এ কথা এতই সুস্পষ্ট যে, এ নিয়ে তর্ক করা চলে না। 'আনন্দমঠ' উপন্যাস সাহিত্যের বই। তার মধ্যে এই গানের সুসঙ্গতি আছে। কিন্তু যে রাষ্ট্রসভায় ভারতবর্ষের সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মিলন ক্ষেত্র, সেখানে এ গান সার্বজনীনভাবে সঙ্গত হতেই পারে না।" (ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, ৪র্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য) [সংগ্রহ : দীপন চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮]

অনেক আধুনিক পর্যালোচকদের সঙ্গে আমরাও একমত যে, পূর্ব বর্ণিত ম্যাক্সমুলারের ঐ সব ষড়যন্ত্র তিনি জানতেন, বুঝতেন অথবা সংযুক্তও ছিলেন। আর্য এবং আর্যতত্ত্ব ভালভাবেই বুঝে ফেলেছিলেন তিনি। তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে তাঁর কবিতায় যা জানিয়েছেন তাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি শুধরে নিতে পেরেছিলেন নিজেকে। তাই কবি লিখতে পেরেছেন : "খুদে খুদে 'আর্য' গুলো ঘাসের মত গজিয়ে ওঠে, ছুঁচালো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।" [ভঃ গোপাল, ঐ, পৃ. ৩০ দ্রষ্টব্য]

ম্যাক্সমূলার, যিনি নিজের নাম সংস্কৃতে করেছিলেন মোক্ষমূলার— সে ভণ্ডামিও ধরতে পেরেছিলেন তিনি। কবি তাই লিখেছেন :

"মোক্ষমূলার বলেছে 'আর্য', / সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য, / মোরা বড়ো করেছি ধার্য, / আরামে পড়েছি শুয়ে।" [ঐ, পৃ. ৩০ দ্রষ্টব্য]

সারা জীবন ধরে বৃটিশ ভজনা করলেও, তাদের তোষণে অনেক কিছু লিখলেও মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল তাঁর। তাই লিখেছিলেন : "আজ আমি বলিতেছি, ভারতবর্ষের দীনতম মলিনতম কৃষককে আমি ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব, আর ঐ যে রাঙ্গাসাহেব টম্‌টম্ হাঁকাইয়া আমার সর্বাঙ্গে কাদা ছিটাইয়া চলিয়া যাইতেছে উহার সহিত আমার কানাকড়ির সম্পর্ক নাই।" [দ্রঃ রবীন্দ্র বচনাবলী ১২শ খণ্ড ; ঐ, পৃ. ৫৬]

রবীন্দ্রনাথ মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা বিষয়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। অন্যদিকে ইসলামধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল তেমন কিছু লেখবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। যা সত্যিই দুর্লভ। কিন্তু বার্ধক্য ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যখন পৌঁছে গেলেন তখন ঐ মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটলো তাঁর। ১৯৩৩-এর ২৬শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে উদযাপিত হয়েছিল মুসলমানদের পয়গম্বর দিবস। কবি হজরত মুহম্মদের (স) পক্ষে একটি বাণী পাঠালেন যেটা সেই সময়ের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেত্রী সরোজিনী নাইডু পাঠ করে শোনান। ভারত তথা পৃথিবীর অসংখ্য আগাছার মত ধর্মগুলোকে তিনি গুরুত্ব দিতেন না মোটেই; মাত্র কয়েকটি ছাড়া। তাই তিনি তাঁর লেখার মধ্যে পয়গম্বরের প্রশংসা করে মুসলমান জাতির ইসলাম সম্বন্ধে লিখলেন : "জগতে যে সামান্য কয়েকটি মহান ধর্ম আছে, ইসলাম ধর্ম তাদেরই অন্যতম। ... সত্য ও শাশ্বতকে যাঁরা জেনেছেন ও জানিয়েছেন, তাঁরা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র এবং মানুষকেও তাঁরা চিরকাল ভালবেসে এসেছেন।"

স্যার আব্দুল্লাহ সোরাবর্দীর কাছ থেকে অনুরোধ পেয়ে ১৯৩৪-এর ২৫শে জুন হজরত মহাম্মদের (স) জন্মদিন উপলক্ষে কবি যে বাণী পাঠিয়েছিলেন সেটি আকাশবাণী বেতারে প্রচারিত হয়েছিল। সেই বাণীর শেষ বাক্যটি হোল : "...আজকের এই পুণ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে মুসলিম ভাইদের সঙ্গে একযোগে ইসলামের মহাঋষির [হজরত মুহাম্মদ স.] উদ্দেশ্যে আমার ভক্তি উপহার অর্পণ করে উৎপীড়িত ভারতবর্ষের জন্য তাঁর আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা কামনা করি।" স্যার আব্দুল্লাহ ঐ বক্তব্যটি ছেপে জনগণের মধ্যে পরিবেশন করেছিলেন। [দ্রঃ অমিতাভ চৌধুরী : ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ ২-৩]

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্বে অনুভব করতে পারলেন যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি থেকে শুরু করে তখন পর্যন্ত মানী ও ধনী মুসলমান জাতিকে যে ভাবে ধ্বংস করা হয়েছে এখন

শুধু 'হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই' বললে তা হবে প্রতারণারই নামান্তর। বরং মুসলমানদের যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থায় তাদের ফিরিয়ে এনে হিন্দু সমাজের সমকক্ষ করার প্রয়োজন আছে। তাই তিনি তাঁর ভাষায় বললেন, 'হিন্দু মুসলমানে 'মিলন' অপেক্ষা 'সমকক্ষতা' প্রয়োজন আগে।"

রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের মূল্যায়ন করতে পারলেন তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে। তিনি লিখলেন, "বাংলাদেশের পূর্বভাগে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ধর্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশি। সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাহাদের মধ্যে নিহিত হইয়া আছে।" [দ্রঃ রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম ও ১৪শ খণ্ড]

আমরা যাঁরা কবির স্বপক্ষে অথবা যাঁরা নিরপেক্ষ তাঁদের কথা ছেড়ে দিলেও বিপক্ষ দল কবির মূল্যায়ন করতে চাইলে এইসব তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের পক্ষে সঠিকভাবে বলা কঠিন হবে যে কবি ব্রাহ্ম, নাকি হিন্দু, নাকি বৈষ্ণব, নাকি বাউল, নাকি সুবিধেবাদী? প্রসঙ্গ শেষ করতে আমরা বলতে পারি যে, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সমগ্র ঠাকুর বাড়ি, সেইসঙ্গে পূর্ণ বঙ্গের জমিদার বাবু রাজা মহারাজা রায়বাহাদুর প্রভৃতি মিলে যে 'এলিট' শ্রেণী তাঁদের কারণেই সমগ্র মুসলমান জাতি ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াইয়ে পরাজিত, শিক্ষা ক্ষেত্রে বঞ্চিত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রিক্ত হয়েছেন। সেইসঙ্গে অনুন্নত, অস্পৃশ্য হরিজন, আদিবাসীরাও এঁদের প্রভাব অতিক্রম করে পারেন নি মাথা উঁচু করে প্রতিষ্ঠিত হতে। বলাবাহুল্য, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বেশির ভাগ নেতাই তাঁদের বৈরী মনোভাব নিয়েই মারা গেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শুধরে নিয়েছেন নিজেকে, অনুভব করেছেন এবং স্বীকারও করে গেছেন যে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, দেশ বিদেশে প্রিয় হওয়ার জন্য সারা জীবন ধরে যা করা হয়েছে তা অসত্য ও প্রতারণার নামান্তর। তাই তিনি লিখেছেন, "আমার পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।" [দ্রঃ রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ৫৯]

বাঙালী চরিত্রের সঠিক চিত্র অঙ্কন করা বড় জটিল। রবীন্দ্রনাথের অনেক শত্রু ছিল একথা ধরে নিয়েই স্বীকার করতে হয়, তুলনামূলক হিসাবে তাঁর মিত্র বন্ধুবান্ধব বা ভক্তের সংখ্যা অনেক বেশি। কবি মৃত্যুর পূর্বে একটার পর একটা শোকাঘাত পেয়ে আত্মিক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন অনেক। যেমন ঠাকুরবাড়িতে একটির পর একটি রত্ন পাগল হয়ে গেলে তাঁদের বেঁধে রাখতে হোত, পাঠাতে হোত পাগলা গারদে। তিলে তিলে তাঁরা নানা যন্ত্রণায় মিশে গেছেন মৃত্যুর সঙ্গে। অকালে তাঁর পুত্রের মৃত্যু, তাঁর মেয়েদের করুণ দাম্পত্য জীবন এবং তাঁদের তখনকার দুরারোগ্য ব্যাধি যক্ষায় মৃত্যু—

সবশেষে শুরু হোল তাঁর দেহের উপর যন্ত্রণা, মৃত্যুর পূর্বাহ্নে। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরামর্শে প্রস্রাবের সময় অসহ্য যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেতে অপারেশানে সম্মত হতে হয় কবির ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। কলকাতার জোড়াসাঁকোয় তাঁকে নিয়ে আসা হোল। অপারেশানের পূর্বে যন্ত্রণাকাতর কবিকে পূর্ণভাবে অজ্ঞান না করেই অপারেশান করা হোল। কবি অনেক কষ্টে চোখ বুজে যন্ত্রণা সহ্য করলেন। কিন্তু কবি বাঁচতে পারলেন না, মৃত্যুই হয়ে গেল তাঁর।

ভক্ত, অভক্ত না অতিভক্ত— নির্ধারণ করা মুশকিল। প্রচুর বাঙালী দর্শক এসে প্রতীক্ষা করছেন তাঁর মরদেহ দেখার। জয়ধ্বনি হচ্ছিল জোরে জোরে। ভক্তির প্রাবল্যে ঠাকুরবাড়ির কোলাপসিবল গেট ভেঙ্গে ফেললো জনতা। ভক্তরা কবির মরদেহ সাজানো খাট থেকে তুলে নিয়ে চলে গেলেন জনস্রোতের মাঝখানে। কবি নিষেধ করে গিয়েছিলেন তবুও 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি জয়' 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিত হতে লাগলো বারে বারে। বাঙালী রবি ভক্তদের এতই ভক্তির আধিক্য যে, কবির স্মৃতি বাড়িতে রাখার জন্য প্রায় সারা জীবন ধরে তাঁর সংরক্ষিত মাথা ভর্তি শুভ্র কেশ, চিত্তাকর্ষক দাড়ি অনেকে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। শেষে দেখা গেল, শ্মশানে যাওয়ার পূর্বেই কবির চেহারাই বদলে দিয়েছেন অতি ভক্তের দল।

অধ্যাপক অমিতাভ চৌধুরী বেদনা নিয়েই লিখেছেন, "যখন মুখাগ্নি করা হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল বিকৃত। জনতার এতই রবি অনুরাগ যে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তাঁর মাথার চুল ও মুখের দাড়ি সব উপড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই হল গিয়ে কবি প্রয়াণের শেষ দৃশ্য। সারা জীবন সুন্দরের সাধক রবীন্দ্রনাথকে চির বিদায় নিতে হোল অসুন্দরের হাতে।" [তথ্য ও উদ্ধৃতি : ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ১৩৬-৩৭]

ছবি : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, 'দেশ', বিশ্বভারতী এবং বাংলা একাডেমির সৌজন্যে

বিচিত্র ব্যক্তি গান্ধীজী

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বে তিনি স্বাধীন ভারতের শ্রেষ্ঠতম নেতা বলে পরিচিত। শুধু কি তাই? তিনিই জাতির জনক। কোটি কোটি মানুষের কাছে তিনি 'মহাত্মা'। অসংখ্য মানুষের কাছে তিনি 'বাপুজী'। আমাদের অনেকের কাছে তিনি এক মহান ঋষি। অহিংস সাধনার তিনি প্রচারক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ব্রহ্মচর্য সাধনার তিনি ছিলেন জীবন্ত প্রতিমূর্তি। আর ছিলেন গরীব ও হরিজন দরদী। আশ্রয় নিয়েছিলেন পর্ণকুটীরে। কত বড় প্রখরবুদ্ধি ঝানু রাজনীতিবিদ তিনি ছিলেন যে, তাঁকে শ্রেষ্ঠতর না বলে শ্রেষ্ঠতমই বলতে হয়। কারণ তখনকার কংগ্রেসকর্মীরা তাঁর আঙুলের ইশারায় উঠতেন বসতেন। মতভেদ, মতানৈক্যের মাঝখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর কথাই ছিল চরম ও চূড়ান্ত। লাঠির প্রহার খেয়েছেন মাথায়, পড়ে গেছেন লুটিয়ে অথচ ক্ষমা করেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কিন্তু পরিতাপের কথা এটাই যে, ভারতবাসীর হাতেই তিনি নিহত হলেন, লুটিয়ে পড়লো তাঁর মৃতদেহ, শেষ রক্তবিন্দু শুষে নিল তৃষিত ভারতের শুষ্ক মৃত্তিকা।

গান্ধীজী

বারবার বলা হয়েছে যে, প্রচলিত সাধারণ ইতিহাস লেখার নিয়মের গতবাঁধা ছকে লেখা হয়নি এই বই। গান্ধীজী সম্পর্কে যা কিছু বলা হোল তার সবই সাধারণ ভক্ত এবং অসাধারণ ভক্তদের বিশ্বাসের বিষয়। এসবই আলো দিক। এগুলো প্রমাণ করতে বিরাট পরিশ্রম বা গ্রন্থ-গ্রন্থালয়ে গভীর অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু গান্ধীবিরোধী যাঁরা, অথবা যাঁরা নিরপেক্ষ, তাঁরা খুঁজতে চাইবেন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য, চরিতার্থ করতে চাইবেন তাঁদের অনুসন্ধিৎসা। এইটুকু করতে গেলে চরম অধ্যাবসায়, প্রচণ্ড পরিশ্রম, অসংখ্য পুস্তক সংগ্রহ ও গভীর মনোযোগ সহকারে তা পড়ে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক সুলভ একটি আলেখ্য তৈরি করা নিঃসন্দেহে সুকঠিন। আমার অযোগ্যতা স্বীকার করেও, এই দুঃসাধ্য কাজটি করতে গিয়ে আলোর পাশে কালো দিকটিও তুলে ধরতে হয়েছে।

অনেকের মনে আসতে পারে যে, আলোকপ্রাপ্ত শুভ্রোজ্জ্বল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের কালোদিক খুঁজে তাঁর ইতিহাসে মসিসিঞ্চন বা কালি ছিটানোর প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা কতটুকু ? এ প্রশ্ন যাঁরা করেন, তাঁরা উচ্চস্তরের পাঠকশ্রেণীর মধ্যে গণ্য নন। বরং তাঁরা সরল ও সহজপ্রাণ সাধারণ পাঠক। এ বইটি কিন্তু সাধারণ অসাধারণ উভয় শ্রেণীর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বৃটিশ সরকারের সি. আই. ই. উপাধিপ্রাপ্ত মানেই প্রথম শ্রেণীর বৃটিশ ভক্ত। বহু পুরস্কার ও উন্নতিপ্রাপ্ত এত বড় ব্যক্তিত্ব যে সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট, এ অভিমত হিন্দু-মুসলমান অনেকেরই। তাঁর সময়ে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক হিসাবে তাঁকে স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য দেখাতে পারবেন না কোন সংস্থা বা ব্যক্তি। কিন্তু শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমের সমকক্ষ বা তাঁর চেয়ে বড় না হলেও, তিনিও সমসাময়িক প্রতিষ্ঠালব্ধ ঔপন্যাসিক, কথাসাহিত্যিক। ইংরেজের কাছ থেকে কোন উপাধি বা সুযোগ সুবিধা পাবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য না হলেও তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাসে তিনি যা করেছেন, তাতে তাঁর দুটি গুণ চন্দ্র ও সূর্যের মতো আজও সাহিত্যের আকাশে জ্বলজ্বল করছে। সেটা হোল, লেখার মধ্যে সরলতা ও সহজবোধ্যতা। আর দ্বিতীয়টি হোল, সমাজ সংস্কারে তাঁর লেখা সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত অভিশাপ থেকে মুক্ত। তাঁর ইতিহাসের আলো দিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে কালো দিক আলোচনারও প্রয়োজন আছে।

দেশবরেণ্য কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মদ্যপান ও বেশ্যাভোগের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে জড়িত ছিলেন বলে যাঁরা অভিযোগ করেছেন তাঁদের কথা অপ্রমাণিত সত্য বলা কঠিন। এখানে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন : ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র "মজফফরপুরের এক বড়ো জমিদার পরিবারের ছেলে মহাদেব সাহুর খুব ঘনিষ্ঠ হন। শরৎ-এর সঙ্গে মিশে মহাদেবও ধীরে ধীরে বাংলা লিখতে পড়তে শিখে নিলেন। এই মহাদেবের সঙ্গে মিশেই শরৎচন্দ্র মদ এবং পতিতাদের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ... শিখরনাথবাবু শরৎ-এর এই উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার পছন্দ করতেন না। শরৎচন্দ্র শিখরনাথের বাড়ী ছাড়লেন। এরপর বহু পতিতার সঙ্গে শরৎ-এর সম্পর্ক হয়। দুই বন্ধু মিলে রাতের পর রাত পতিতালয়ে পড়ে থাকতেন। ঐ সময় মজফফরপুরে পুটিবাঈ নামে একজন অসাধারণ সুন্দরী বেশ্যা ছিল। শরৎ নাকি তাকে ভালবাসতেন। এখানে রাজবালা নামে একজন তরুণীর সঙ্গেও শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক হয়েছিল। রাজবালার বাবা বিধুভূষণবাবু উকিল ছিলেন। শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কিছু অংশ, 'ব্রহ্মদৈত্য' রচনাটি এখানে বসেই লেখা।" [বিকাশকুমার ঝা : মুজফফরপুরের বাঙালী জমিদাররা, আলোকপাত, জানুয়ারি, ১৯৯০ সংখ্যা]

বিখ্যাত কথাশিল্পীর চরিত্রের এই সমালোচনায় লাভের দিক কতটুকু? আমাদের বিশাল জনসমাজের বিশেষতঃ কিশোর ও তরুণদের পদস্খলন হওয়া অস্বাভাবিক নয় মোটেই। যখন সে মনে করে যে সে চরিত্রহীন, সে সমাজের ক্ষয়িষ্ণু শেষ বিন্দু, সত্যিই তখন সে নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই ঘটনা তার জানা থাকলে সে পাবে নতুন উদ্দীপনা ও জীবন্ত চেতনা। তার মনে হবে শরৎচন্দ্র এই অবস্থায় জিরো থেকে যদি হিরো হতে পেরে থাকেন, তাহলে তারও গুণের বিকাশ ঘটাতে বিন্দু থেকে সিন্ধু হওয়া নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। এটাই হোল অন্যতম লাভের দিক।

শৈশবে গান্ধীজী

পূর্বোক্ত গুণে গুণান্বিত বিরাট ব্যক্তিত্ব গান্ধীজী যেদিন নিষ্ঠুরভাবে আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন, সেদিন ভারতের বহু স্থানে আনন্দে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছিল। বঙ্গের বিখ্যাত সাহিত্যিক, প্রাক্তন জেলাশাসক ও বিচারপতি অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, "শেষকালে মৌনতা ভঙ্গ করে শ্যামাপদবাবু [শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি] আমাকে বলেন, 'শুনেছেন? রাত্রে এখানকার কয়েকটি বাড়িতে মিষ্টান্ন বিতরণ হয়ে গেছে।' আমি তো থ। গান্ধী নিধনের সংবাদে মিষ্টান্ন বিতরণ? এটা কি ভারতবর্ষ? ভেবেছিলুম এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিন্তু জেলার নানা জায়গা থেকে খবর আসতে লাগলো যে সেই রাত্রে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়েছে! আশ্চর্য্যের ব্যাপার! সংবাদপত্রে পড়া গেল, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একই সময়ে মিষ্টান্ন বিতরণ হয়েছে।" [দ্রষ্টব্য 'পশ্চিমবঙ্গ', তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে প্রকাশিত, গান্ধী সংখ্যা, পৃ. ৫৬, ১৯৯৫]

এত বড় ঘটনা যখন ঘটলো, নিশ্চয়ই তার পিছনে কারণ থাকবেই। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, অর্থাৎ আর. এস. এস. পার্টিকে গান্ধীর মৃত্যুর পরেই নিষিদ্ধ করা হোল। কারণ ঐ দলেরই সমর্থক নাথুরাম গডসে তাঁকে যে গুলি করলেন এটা আকস্মিক বা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বহুদিন ধরে পুঞ্জীভূত নানা অভিযোগে [তাঁদের মতে] মৃত্যুর শিকার হতে হোল তাঁকে।

অবিভক্ত ভারতবর্ষ যখন ভাগ হয় ভারত ও পাকিস্তান নামে, তখন উভয় দেশের মধ্যে যেসব শর্ত নির্ধারিত হয়েছিল, তার মধ্যে একটা ছিল এই যে, পাকিস্তানকে ভারত

৫৫ কোটি টাকা ধার হিসেবে দেবে। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে ঝামেলার সৃষ্টি হয়। হানাহানি ও দাঙ্গায় জড়িয়ে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তখন দুদেশই ছিল স্পর্শকাতর অবস্থায়। পাকিস্তান কাশ্মীরে ঝামেলা সৃষ্টি করেছে— এ কথার উপর বিশ্বাস করে ভারতের নেতা জওহরলাল নেহরু ও তাঁর দলবল পূর্ব প্রতিশ্রুতির টাকা দিতে অস্বীকার করেন। তাতে উচ্ছ্বাসপ্রবণ তরুণ ও নবীনেরা খুশি হয়ে এটা সমর্থন করেন। তারা মনে করেন, পৃথক যখন হয়ে গেছি, তাদের উপকার হয় এমন কোন কাজ আমাদের না করাই উচিত। সেই সময় গান্ধীজী দাবি করলেন, ঐ ৫৫ কোটি টাকা যদি পাকিস্তানকে না দেওয়া হয় তাহলে তিনি আত্মহত্যা করবেন অনশন করে। বারুদের স্তূপ তৈরি হয়েই ছিল— তাঁর অনশনে যেন হোল অগ্নিসংযোগ। গান্ধীর বিরুদ্ধবাদীদের ধারণা হোল, তিনি পাকিস্তান বা মুসলমানদের দালাল। ধারণা হওয়ার কারণ শুধু এটাই নয়, আরো আছে। তারমধ্যে অন্যতম হোল, গান্ধীর দুই পুত্রের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ। এটাও ভুল বোঝাবুঝি। হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে তাঁর পুত্রের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে গান্ধীর সমর্থন ছিল না। [দ্রষ্টব্য গান্ধী-রচনা সম্ভার, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.১২৭]

এবার পঞ্চান্ন কোটি টাকার কথা। একটি বিখ্যাত বই থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। বইটি একজন জেলখাটা স্বনামধন্য নেতার লেখা। যাতে 'যুগান্তর', 'বসুমতী', 'প্রভাত', প্রভৃতি সংবাদপত্রের প্রশংসা ছাপা আছে। লেখক সুনীল কুমার গুহ। 'স্বাধীনতার আবোল তাবোল'। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত এই বইটির নম্বর ৮৭২০৮ / ৯৪. ৬০২ সু গু।

শ্রী গুহ লিখেছেন, "তাই ভারতের সাথে একটা বন্দোবস্ত হয়েছিল যে, আপাততঃ এই খরচ চালাবার জন্য ভারত পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা ধার দেবে। এই ধার দেওয়া দেই-ইর ব্যাপারে লেখাপড়ার কাজও হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু পাকিস্তান হঠাৎ কাশ্মীরে হাঙ্গামা বাধিয়ে বসায় পাকিস্তানকে জব্দ করবার জন্য ভরত সরকার ঐ টাকাটা দিতে নারাজ হলেন। ... পাকিস্তান যখন ধমক দিলে যে, টাকাটা না দিলে তারা করাচি এবং লাহোর ব্যাঙ্ক থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সব টাকা জোর করে কেড়ে নেবে তখন তাঁদের টনক নড়লো। ... গান্ধীজীকে আবার উপোস করতে হল শিষ্যদের বদন রক্ষা করবার জন্যই : যাতে সেসময়েই টাকাটা পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া যায়। ... হতভাগা নাথুরাম গডসে বুঝতে ভুল করলো যে গান্ধীজী শুধু তাঁর অবোধ পুত্র এবং শিষ্যদের বদনরক্ষা করবার জন্যই অনশনের ঢং করেছিলেন— পাকিস্তানকে সাহায্য করবার জন্য নয়।" [দ্রষ্টব্য সুনীল গুহ'র লেখা ঐ বই, পৃ. ৭১]

শ্রী সুনীল গুহ'র এই লেখা যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার গান্ধী সংখ্যা থেকে তুলে দিচ্ছি কয়েকটা লাইন—"মহাত্মাজি জানান যে, পাকিস্তানের যে ৫৫ কোটি টাকা ভারত সরকার আটকে রেখেছে সেটা পাকিস্তানকে মিটিয়ে দেওয়াটাই তাঁর ইচ্ছা। (গান্ধী) অনশন শুরু করার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ভারত সরকারের ক্যাবিনেট মিলিত হল পাকিস্তানের প্রাপ্য টাকা প্রদানের বিষয় আলোচনা করার জন্য। সেদিন রাত্রে বিড়লা ভবনের বাইরে এক জনতা আওয়াজ তুলল, 'খুন কা বদলা খুন', 'বদলা চাহিয়ে বদলা', 'গান্ধী মুর্দাবাদ' ইত্যাদি।"

কৈশোরে গান্ধীজী

তাঁকে অহিংস মতবাদের স্রষ্টা যে বলা হয় এ কথার সত্যতাতেও সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট। একদল বিচক্ষণ পণ্ডিতদের মতে এটা মিঃ তলস্তয়ের সৃষ্টি করা তত্ত্ব , যা বৃটিশের পক্ষ থেকে গান্ধীকে শেখানো হয়েছিল ভারতে পরিবেশনের জন্য। তলস্তয়ের শিষ্য গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় এই অহিংসবাদের প্রশিক্ষণটি পেয়েছিলেন।

"পুস্তকাগার সমবায় সমিতি ইত্যাদি যা গড়ে তুলেছিলেন তা তিনি গুরু টলস্টয়ের নামেই করেছিলেন। গুরু টলস্টয় বেঁচে ছিলেন এবং গান্ধীজীর সাথে যে তাঁর পত্রবিনিময়ও হোত তারও অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু যে মুহূর্তে গান্ধীজী নেতৃত্ব করবার জন্য এই মূর্খ ভারতভূমিতে পদার্পণ করলেন সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি ঋষি টলস্টয়কে ভুলে গেলেন। এ ব্যাপারটা কি করে সম্ভব হোল, কি করে সম্ভব হোল তাঁর প্রচারকার্য যে তাঁর ঐ 'অহিংসাবাদ' তাঁর নিজেরই আবিষ্কার? ভারতে এসেও তিনি গঠনমূলক অনেক কিছুই করেছিলেন, কিন্তু কারও সঙ্গে ঐ টলস্টয়ের নাম জড়িত করতে দেখা যায়নি।" [দ্রষ্টব্য সুনীল গুহ, ঐ, পৃ. ২৩]

রানী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং যে উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন সেই উপাধি একজন ভারতীয়কে দিতে হলে তাঁকে বৃটিশের কতটা বিশ্বাসভাজন সেবক হতে হবে সেটুকু গান্ধীজীর মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল বলেই রানী গান্ধীজীকে 'কাইজার-ই-হিন্দ' উপাধিটি দিতে পেরেছিলেন।

শ্রী অমিতাভ মৈত্র, জওহরলাল নেহরু এবং ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনা করে লিখেছেন, "উনি (নেহরু) তাঁর কন্যার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে, রানী ভিক্টোরিয়া সিপাহী

বিদ্রোহের পর 'কাইজার-ই-হিন্দ' নিয়ে রাজসিংহাসনে আরোহন করেছেন। কিন্তু তাঁর গুরুদেব স্বয়ং গান্ধীজী ১৯১৪-১৮ সালে অহিংসার অবতার হয়ে গ্রামে গ্রামে সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করেছেন সৈন্য সংগ্রহ করে এবং সেই কাজের উপহার স্বরূপ তিনিও একই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন রানী ভিক্টোরিয়ার মতন।" [দ্রঃ বর্তমান দিনকাল, ১-১৫ জুলাই, ১৯৮২, পৃ. ২৫]

যাঁরা গান্ধীজীকে ইংরেজের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিজেদের দলের বাছাই করা প্রতিনিধি বলে মনে করেন, শ্রী গুহও এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন তাঁদের সঙ্গে। জেলখাটা বিপ্লবী হিসেবে ইংরেজের জেলের যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লেখকের ছিল। গান্ধীর প্রতি তাঁর সন্দেহ হয়েছিল এইজন্য যে, গান্ধীজী অনেক সময় জেলে এতো জামাই আদরে থাকতেন এবং স্বাধীনতা ভোগ করতেন যে তা জানলে বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন। তিনি লিখেছেন, "কোনও অসুবিধা যাতে না হয় সেজন্য গান্ধীজীকে তাঁর স্ত্রী আর সেক্রেটারী সুদ্ধই এক রাজপ্রাসাদে থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ৫৪]

ভারতের বিখ্যাত অন্যতম ধনকুবের স্যার আগা খানের যে রাজপ্রাসাদ, সেখানেও গান্ধীজীকে বন্দী করে রাখা হোত। সেখানেই তাঁর সঙ্গে ভক্তবৃন্দ এবং সাক্ষাৎপ্রার্থীরা দেখা করতে পারতেন। [তথ্য : সুশীল কুমার ধাড়া : ভারতছাড়ো আন্দোলন ও গান্ধীজী, 'পশ্চিমবঙ্গ' গান্ধী সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃ. ৭১]

লেখকদ্বয়কে যদি গান্ধীর শত্রুই ধরে নেওয়া যায় তাহলে গান্ধীজী স্বয়ং যে বই লিখিয়েছেন, যেটা 'গান্ধী-রচনা সম্ভার' বলে পরিচিত, সেটা পড়লেও মনে না হওয়ার কারণ নেই যে, গান্ধীর সঙ্গে ইংরেজের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর— যা অত্যন্ত রহস্যময়ও বটে।

গান্ধী স্বয়ং বলেছেন, "আমার জেলে আসার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আলাদা ধরন ছিল; জেল ত নয় যেন কোন উৎসবে যাইতে প্রস্তুত হইতেছি। পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ হিলি সজ্জন, আশ্রমে না আসিয়া অনুসূয়া বেনকে দিয়া খবর পাঠাইলেন যে, তিনি আমাকে গ্রেফতার করিবার জন্য ওয়ারেন্ট লইয়া আশ্রমের দরজায় মোটরে অপেক্ষা করিতেছেন। আমার তৈরী হওয়ার জন্য যত সময় লাগে তাহা আমার ইচ্ছামত লইতে বলিয়া দিয়াছিলেন।" [গান্ধী-রচনা সম্ভার, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪৫]

তিনি আরো লিখেছেন, "আর কিছু হোক না হোক কয়েক সপ্তাহ সবরমতী জেলে একান্তে কাটাইতে পারিব এমন আশা করিয়াছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, সরকার আমাকে দীর্ঘ দিন কোন এক জায়গায় রাখিবেন না। কিন্তু টানিয়া লইয়া যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ২০শে তারিখে আমাকে এক

স্পেশাল ট্রেনে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। যে কর্মচারীদের প্রতি আমাকে স্থানান্তরিত করার ভার পড়িয়াছিল তাঁহাদের ভদ্রতার সীমা ছিল না। সারা রাস্তায় তাঁহারা আমার কোন অসুবিধা হইতে দেন নাই।" [ঐ, পৃ. ১৪৮]

"আমি যে সাধারণ খাদ্য খাই, তাহা না খাইয়া বিশেষ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত বলিয়া [জেল সুপারের] মনে অত্যন্ত চিন্তা জাগিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, আমি যেন মাখন খাই। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, আমি কেবল ছাগলের দুধের মাখনই খাইতে পারি। তিনি অমনি বিশেষ হুকুম করিলেন যে, ছাগলের দুধের মাখন তাড়াতাড়ি আনা চাই। মাখন আসিল। এখন কী দিয়া মাখন খাওয়া যায় সে প্রশ্ন উঠিল। আমি বলিলাম কিছু আটা যেন দেন। তাহা দেওয়া হইল। কিন্তু এত মোটা আটা যে উহা আমার হজম করিতে কষ্ট হইত। কিছু মিহি আটা আনা হইল ও আমাকে ২০ তোলা করিয়া দেওয়া হইল। এত আটা দিয়া আমি কী করিব?" [ঐ, পৃ. ১৪৯]

বিদেশে ছাত্রাবস্থায় গান্ধীজী

তাহলে কি তাঁদের কথাই সত্য, যাঁরা মনে করেন গান্ধীজী বৃটিশেরই শিক্ষণপ্রাপ্ত বাছাই করা রেডিমেড নেতা? তাহলে কি তাঁদের এ কথাটাও সত্য যে আজ যাঁদের নেতা বলে পরিচিতি, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বৃটিশের অনুগত হিতাকাঙ্খী ও স্তাবক? সেই জন্যই কি আমাদের দেশের ঐ সমস্ত নেতাদের বৃটিশের সঙ্গে আঁতাতের পত্র আদান প্রদানের সমস্ত ফাইল, ভারতত্যাগের পূর্বেই পুড়িয়ে দিতে হয়েছিল? যে কাগজপত্রের ওজন ছিল চার টনের মতো।

শ্রী সুনীল গুহও লিখেছেন, "গান্ধীজী যে, ইংরাজ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করবার জন্য নেতৃত্ব দান করতে এসেছিলেন না। এসেছিলেন বিপ্লবী ভারতকে ধ্বংস করতে; ধ্বংস করতে এসেছিলেন ভারতের নবসঞ্চারিত শক্তিকে, এ একটা মহাসত্য।" [দ্রঃ গুহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬]

"রাজনৈতিক নেতাদের ফাইল নষ্ট করে যাওয়াই ইংরেজের পক্ষে স্বাভাবিক। স্বাভাবিক এই কারণে যে তথাকথিত অনেক রাজনৈতিক নেতাই তো বাইরে যে সব কাজকর্ম করেন আর তলে তলে গভর্নমেন্টের সঙ্গে তার উল্টোটাও করেন। এই সব রেকর্ডের

ফাইল দেশের জনসাধারণের হাতে না পড়াই উচিত।... তাই গোপন ফাইল কারুরই ছিল না। সব নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর মতো অহিংস অবতার নেতার ফাইলও নষ্ট থেকে বাদ পড়েনি।... নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বা অন্য কোন বিপ্লবীর ফাইল তো নষ্ট করা হয়নি, নষ্ট করা হয়েছিল মহাত্মা গান্ধী, জিন্না সাহেব আর ঐ ধরণের অন্য বড় বড় নেতার ফাইল। নেতাজীর মৃত্যু প্রমাণ করবার জন্য যে ইনকোয়ারি কমিশন বসানো হয়েছিল তারই রিপোর্টে পাওয়া যাবে যে, সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে বিরাট ফাইলটি ভালভাবেই আছে, এমনকি পোকায়ও বিশেষ কাটবার সুযোগ পায়নি।" [দ্রঃ গুহ, ঐ, পৃ. ১৭]

তিনি আরও লিখেছেন, "বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত '১৭ই আগষ্ট সংখ্যায় ঐ বিখ্যাত দেশ সাপ্তাহিকেই ভি.এস.চাওজী নামক বোম্বায়ের জনৈক পুলিশ অফিসারের লিখিত 'সেবাগ্রামে পুলিশ' শীর্ষক একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ঐ লেখাটিতে লেখক চাওজী— যিনি বহুদিন ওয়ার্দা থানাতে দারোগা ছিলেন এবং যাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর বিশেষ জানাশোনাও ছিল,... গান্ধীজীর বিষয়ে দুটি অতি গোপন খবর প্রকাশ করে দিয়েছেন। খবর দুটির প্রথমটি হচ্ছে গান্ধীজী কিভাবে একজন বিপ্লবী কর্মীকে গ্রেফতার করতে পুলিশকে সাহায্য করেছিলেন। এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে, সদাশয় ইংরেজ সরকার মহানুভব গান্ধীজীর প্রাণ রক্ষার্থে কিভাবে একজন গোয়েন্দা পুলিশকে গান্ধীজীর কুটীরের নিকট সবসময়ের জন্য মোতায়েন করেছিলেন।" [দ্রঃ গুহ, পৃ. ১৮]

শ্রী সুনীল গুহ লিখেছেন, "দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি নাকি টাকা রোজগার বাদেও অনেক কিছু করেছিলেন। আর তাঁর ঐ অহিংসা মতবাদ এও তিনি ঐখানে থাকতেই আয়ত্ত করেছিলেন। ভারতের রঙ্গমঞ্চে তাঁকে প্রথম দেখা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের আমলে, এবং একজন সৈন্য সংগ্রহকারী হিসাবেই। ইংরেজ-জার্মান যুদ্ধে ইংরেজই যে ন্যায়পক্ষ, তাতে তাঁর কোন ভুল ছিল না;... ইংরেজ-জার্মানদের এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যেরা গিয়ে অংশগ্রহণ করলেও তাঁর অহিংসাতেও সেদিন কোন দ্বিধা দেখা যায়নি।" [ঐ, পৃ. ১৯]

শ্রীগুহ আরও লিখেছেন, "তবে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম জীবনে বুয়োর যুদ্ধে গান্ধীজী যে ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে এম্বুলেন্স ভলান্টিয়ারের কাজ করেছিলেন এবং ঐ বাবদ ইংরেজদের কাছ থেকে অনেক প্রশংসা এবং পুরস্কারও পেয়েছিলেন।"

সুনীলবাবুর মতো যে কোন গান্ধীবিরোধী ব্যক্তি যা লিখবেন, তাই চোখবুজে মেনে নেওয়া অসম্ভব। কিন্তু গান্ধীর নিজের লেখাতেও যদি তা প্রমাণিত হয়, তাহলে তা খণ্ডন করা মুশকিল। অহিংসবাদী গান্ধীজী বৃটিশের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করে কি করে দলগঠন

করলেন? ঐ কাজটি অহিংস না সহিংস, তা বিবেচনা করলেন না মোটেই। তিনি স্বয়ং বলেছেন, "আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের কার্যের কথা জেনারেল বুলার তাঁহার সরকারিপত্রে (ডেসপ্যাচে) উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের ৩৭ জন নেতাকে মেডেলও দেওয়া হইয়াছিল।" [রচনা সম্ভার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮০]

গান্ধীজী আরো বলেছেন, "সংখ্যায় আমি ২০/২৫ জনের একটি ছোট দল সংগঠিত করিয়া ফৌজের সহিত যুদ্ধে গেলাম। এই ছোট দলের ভিতরও সকল প্রদেশের ভারতবাসীই ছিলেন। একমাস এই দলকে সেবা করিতে হয়। আমাদের এই কার্য পড়াটা ঈশ্বরের কৃপা বলিয়া সর্বদা মানিয়া থাকি।... একমাসের মধ্যেই আমাদের কাজ শেষ হইয়া গেল। সরকারি ডেসপ্যাচে আমাদের কাজের উল্লেখ করা হয়। আমাদের দলের প্রত্যেককে এই উপলক্ষে বিশেষভাবে তৈয়ারি পদক দেওয়া হয়। লাটসাহেব একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র দেন।" [গান্ধী রচনাসম্ভার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯৯-১০০]

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী

গান্ধীজী বলেন, "সেইজন্য আমরা সাউথ আফ্রিকা বৃটিশ ইন্ডিয়া কমিটি গঠন করিবার সাহস করিলাম।" [ঐ, পৃ. ১২১]

প্রকাশ থাকে যে ঐ দলটির সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছিলেন ইংল্যান্ডের মিঃ রিচ। তিনি হলেন একজন বৃটিশ নেতা। গান্ধীজী বললেন, "নব প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হওয়ার সমস্ত গুণই তাঁহার ছিল। তিনি ইংল্যান্ডেই ছিলেন আর এই কাজ করার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল।"

গান্ধীজী স্বয়ং যে বক্তব্য লিখেছেন, তা কোনমতেই গ্রাহ্য নয় বলা যাবে না। আফ্রিকায় ভারত থেকে যাওয়া ভারতবাসীদের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল যে, তিনি সাহেবদের কাছ থেকে ১৫ হাজার পাউন্ড ঘুষ নিয়েছেন। সত্য মিথ্যা যা-ই হোক, গান্ধীজী একথার উল্লেখ করেছেন। গান্ধীজীর ব্যবহারে বা তাদের মতে, বিশ্বাসঘাতকতা মনে হওয়ায় মীর আলম তাঁর মাথায় লাঠি চালিয়েছিল। গান্ধীজী তাঁর জীবনীতে তাদের জন্য লিখেছেন যে, তারা বলেছিল, "আমরা শুনিয়াছি যে আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জেনারেল স্মার্টের নিকট হইতে পনেরো হাজার পাউন্ড লইয়া

সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিক্রয় করিয়াছেন। আমরা কখনো দশ আঙ্গুলের ছাপ দিব না এবং কাহাকেও দিতে দিব না। ... শুনিলাম মীর আলম ও তাহার সঙ্গীরা আমাকে আরও লাঠিপেটা করে এবং লাথি মারে। ইউসুফ মিঞা ও থাম্বি নাইডু কিছু মার আটকান। তাহাদের দুজনের উপরও সেইজন্য কিছু মার পড়ে।" গ্রেফতার হওয়া মীর আলম ও সঙ্গীদের জন্য গান্ধী বলেছিলেন, "উহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।" কিন্তু গান্ধীজীই বলেছেন, মীর আলমদের "তিনমাস করিয়া কারাদণ্ড হয়"।

লাঠির চোট খাওয়া গান্ধীজীকে সাধারণ হাসপাতালে না দিয়ে বৃটিশ সরকারের শ্রদ্ধেয় বিশ্বাসভাজন মিঃ ডোকের বাড়িতে তাঁর চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা হয়। গান্ধীজী বলেছেন, "আত্মীয়প্রতীম শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী ডোকের তত্ত্বাবধানে আমি ভালই আছি। শীঘ্রই আমি আবার কর্তব্যে হাত দিতে পারিব আশা করিতেছি"— এই বর্ণনা সংবাদপত্রে ছাপাবার জন্য দিয়েছিলেন।

গরীবদরদী গান্ধীজী খেটে খাওয়া ভাঙ্গী বা মেথরদের বাড়িতে আশ্রয় নিতেন— এইসব ইতিহাসের নিচে এ কথাটাও লুকিয়ে আছে যে, বৃটিশের একান্ত অনুগত সহযোগী ও সাহায্যকারী রতন টাটার মতো বড় ধনীদেরও তিনি ছিলেন একান্ত রক্ষাকর্তা ও পরামর্শদাতা। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত থেকে যাওয়া কুলি শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি যে 'সত্যাগ্রহ' শুরু করেছিলেন, সেই সত্যাগ্রহের অর্থভাণ্ডারে সে বাজারের পঁচিশ হাজার টাকা সাহায্য করেছিলেন স্যার রতন টাটা। গান্ধীজী লিখেছেন, "কেপটাউনে নামিতেই বিলাত হইতে তার পাইলাম যে, শ্রীযুক্ত [পরবর্তীকালে স্যার] রতন টাটা সত্যাগ্রহের অর্থভাণ্ডারে ২৫,০০০ টাকা দিয়াছেন। আমাদের তৎকালীক প্রয়োজনের পক্ষে ইহা যথেষ্ট ছিল এবং আমরা আগাইয়া চলিলাম।" [পৃ. ২২৯]

আফ্রিকাতেই গান্ধীজীকে ভারতে নেতৃত্ব দেবার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল তাতে আর্থিক ও সার্বিক সহযোগিতা করা বা করানো হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকেই। এই অভিযোগ সত্য মিথ্যা যা-ই হোক, গান্ধীজী স্বয়ং তা স্বীকার করলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না মোটেই। সত্যাগ্রহী দলের থাকার জন্য যে বাসস্থান ও খামারবাড়ির জন্য যে বিরাট জায়গার প্রয়োজন, সে ব্যবস্থাও সাহেবরা করে দিয়েছিলেন। গান্ধীজী তা স্বীকারও করেছেন— "শ্রীযুক্ত কলেনবেকের সহিত ইতিপূর্বেই পাঠকের পরিচয় হইয়াছে। তিনি ৩৩০০ বিঘার খামারবাড়ি কিনিয়া বিনামূল্যে ও বিনা খাজনায় সত্যাগ্রহীদিগকে ব্যবহারের জন্য দিলেন [৩০শে মে, ১৯১০]।" [ঐ, পৃ. ২৩৩]

ইংরেজ জাতি যেখানেই রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, সেখানেই তারা তৈরি করে নিয়েছে তাদের বাছাই করা প্রতিনিধি। ভারতের ঐ রকমের একজন 'কিং মেকার' প্রতিনিধি বাছাই করেছিল বৃটিশ, যাঁর নাম গোপালকৃষ্ণ গোখলে। ১৮৬৬-তে তাঁর জন্ম আর

১৯১৫-তে হয়েছিল তাঁর মৃত্যু। আর ১৯১৫-র পরেই গান্ধীজীর ভারতে রাজনৈতিক বিকাশের উন্নতি। গোখলে ছিলেন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ্ ও লেখক। জন্মস্থান কোলাপুর। 'সুধাকর' পত্রিকার সম্পাদক। ১৮৯৫-এ কাশীতে কংগ্রেস অধিবেশনে গোখলে ছিলেন সম্পাদক। ১৮৯৭-এ ওয়েলবি কমিশনে সাক্ষ্য দিয়ে পর্যাপ্ত খ্যাতি লাভ করেছিলেন তিনি। বৃটিশ সরকারের বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও নির্বাচিত হন। তাছাড়া ১৯০৫-এ বেনারসে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিও হন। ঐ বছর ব্রিটিশের স্বার্থ ও সেবায় 'ভারত সেবাসমিতি' তৈরি হয়েছিল; যার ইংরেজি নাম ছিল 'সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি'— ঐ উদ্যোগের তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১১-তে যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়েছিল, তারও তিনি ছিলেন প্রাণপুরুষ।

শ্রী সুনীল গুহ লিখেছেন, "ইংরেজ তাদের কূটবুদ্ধির বলেই অতি সহজেই বুঝতে পেরেছিল যে বহুশত বৎসরের পরাধীন ভগ্নমেরুদণ্ড এই জাতির সম্মুখে, আধা ধর্ম আধা রাজনীতি মার্কা এই অহিংসাবাদের মতো একটি চীজ যদি ছাড়া যায়, তাহলে তারা এটিকে লুফে নেবে। এবং আপাততঃ তাদের উদ্দেশ্যও খানিকটা হাসিল হবে। হাসিল হয়েছেও।" [প্রাগুক্ত, পৃ. ২০]

মিঃ গোখলে বিলেত যেতেন-আসতেন, আর গান্ধীর সঙ্গে পত্রালাপ ও তার বিনিময় করতেন। কোন কোন সময় ইংলন্ডে ডেকে নিতেন গান্ধীকে। কখনো দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী এবং বৃটিশ আমলাদের নিয়ে বৈঠক করে শলাপরামর্শ চলতো তাঁদের মধ্যে। এসব কথা যদি অস্বীকার করাও হয়, গান্ধীর সাক্ষ্য ও স্বীকৃতি থেকে কিন্তু এসব প্রমাণ করা যাবে সহজেই। যেমন গান্ধীজী গোখলে সম্বন্ধে লিখেছেন, "১৯১১ সালে গোখলে বিলেতে ছিলেন। ... তাঁহার সহিত বরাবর আমার পত্রব্যবহার চলিতেছিল।" [রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫৬]

মিঃ গোখলে যখন গান্ধীর কাছে আফ্রিকায় গিয়ে পৌঁছলেন তার পূর্বেই বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে সেখানকার রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের জানিয়ে দেওয়া হোল যে, গোখলেকে যেন পর্যাপ্তভাবে সম্মান ও সম্বর্ধনা জানানো হয়। ফলে গোখলে কেপটাউনে নামার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে হুলস্থূল কাণ্ড। মিলিটারি সৈন্য আর রক্ষীবাহিনীতে সুসজ্জিত। স্টেশন এবং শহরকে আলোয় আলোকিত করা হয়েছিল। যেখানে যেখানে গোখলের বক্তৃতা করার ব্যবস্থা হয়েছিল, প্রত্যেকটিতে সভাপতি হয়েছিলেন বৃটিশের বড় বড় কর্মচারি বা আমলারা। খুব বড় মাপের বৃটিশ নেতা জেনারেল বোথার সঙ্গে গোখলের অনেক গোপন কথাবার্তা হয়েছিল। বেশিরভাগ স্থানে গোখলের বক্তৃতার তরজমা করেছিলেন গান্ধীজী। গান্ধীজী স্বয়ং তা স্বীকার করে লিখেছেন, "১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর

গোখলে কেপটাউন বন্দরে নামিলেন। ... গোখলে বলিলেন, আমি যাহা বলিলাম, উহা হইবেই। জেনারেল বোথা আমাকে কথা দিয়াছেন যে, কালাকানুন রদ করা হইবে এবং তিন পাউন্ড কর উঠাইয়া দেওয়া হইবে। তোমাকে বারোমাসের মধ্যেই ভারতবর্ষে ফিরিতে হইবে। আমি তোমার কোন অজুহাতে কান দিব না।" [ঐ, পৃ. ২৬৫]

"স্টীমারে মন খুলিয়া কথাবার্তা বলার মতো যথেষ্ট অবকাশ হইয়াছিল। এইসকল কথাবার্তার মধ্যে গোখলে আমাকে ভারতবর্ষের কার্যের জন্য তৈয়ারি করিয়া লইলেন। ভারতবর্ষের প্রত্যেক নেতার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সেই বিশ্লেষণ এত নিখুঁত ছিল যে, ঐ সকল নেতাদের সহিত পরিচয়ের পরে তাঁহার বিশ্লেষণের সহিত আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোন তফাত দেখিতে পাই নাই।" [ঐ, পৃ. ২৬৫-৬৬]

গোখলে যে বৃটিশের প্রথম শ্রেণীর অনুগত, যাচাই ও বাছাই করা এক নম্বরের সাহায্যপুষ্ট ভক্ত ছিলেন, সে বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করেন না। লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ছিলেন ভারতের শাসনকর্তা। তিনি গোপালকৃষ্ণ গোখলেকে প্রশ্ন করেছিলেন, "বৃটিশরা তল্পি গুটিয়ে বৃটেনে চলে গেলে আপনারা কী কর্তব্য করবেন?" তখন তুখোড় রাজনীতিবিদ তদানীন্তন সর্বভারতীয় নেতা কল্পনাই করতে পারেননি যে বৃটিশবিহীন ভারত হতে পারে। তাই আবেগঘন গম্ভীর কণ্ঠে যা উত্তর দিয়েছিলেন, তা আজকের ভারতবাসীর বিচারে বড়ই সাঙ্ঘাতিক ও ক্ষতিকর। "সেই কথার উত্তরে গোখলে বলেন যে, আপনারা এডেন বন্দরে পৌঁছবার আগেই টেলিগ্রাম করে ফিরিয়ে আনবো।" [অমিতাভ মৈত্র : বর্তমান দিনকাল পত্রিকা, ১-১৫ই জুলাই, ১৯৮২, পৃ. ২৬]

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, এন্ড্রুজ সাহেব, পিয়ারসন সাহেব এবং আরো রাজনৈতিক সরকারি নেতানেত্রীদের পরস্পরের সঙ্গে গভীর বা নিবিড় সংযোগ ছিল— এই ইঙ্গিত পূর্বেও দেওয়া হয়েছে। গান্ধীজীকে যখন ভারতে আনানো হোল, ভারতেও সত্যাগ্রহ চালু করতে এবং সারা ভারতে ঘুরে বেড়িয়ে নেতানেত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে বহু অর্থের প্রয়োজন ছিল। সে সব অর্থের মোটা অংশের যোগান দিয়েছিল ইংরেজ সরকার। সরকারের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের ছায়ার মতো সঙ্গী বিখ্যাত এন্ড্রুজ ও পিয়ারসন সাহেবদের গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকা কালে পাঠানো হয়েছিল, আর তাঁদের সঙ্গে ছিল মিঃ গোখলের লেখা পরিচয়পত্র। গান্ধী ভারতে আন্দোলন শুরু করার পর এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "পরে যখন আন্দোলন আবার তীব্রভাবে আরম্ভ হইল, তখন ভারতবর্ষ হইতে সত্যাগ্রহ ভাণ্ডারে প্রভূত অর্থ দেওয়া হয়েছিল এবং লর্ড হার্ডিঞ্জও [

১৯১৩ সনের ডিসেম্বর মাসে] সত্যাগ্রহীদের প্রতি গভীর ও উদগ্র সহানুভূতি জানাইয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে শ্রীযুক্ত এন্ড্রুজ ও শ্রীযুক্ত পিয়ারসন দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়াছিলেন। গোখলে না আসিলে এ সমস্ত ঘটিত না।" [পৃ. ২৬৭]

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ থাকলেও বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতার অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা একমত ছিলেন। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে উপাধি দিয়েছিলেন 'গুরুদেব'।

সাহেব চার্লি এন্ড্রুজের জন্য গান্ধী লিখেছেন, "এটা ঠিক যে তিনি গুরুদেবের বন্ধু ছিলেন। কিন্তু গুরুদেবকে দেখতেন ভয়-ভক্তি-বিস্ময়ের চোখে। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড়তম বন্ধুত্ব। বহু বছর আগে গোখলের কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। পিয়ারসন এবং তিনি মানুষ ইংরেজের প্রথম সারির নিদর্শন।"

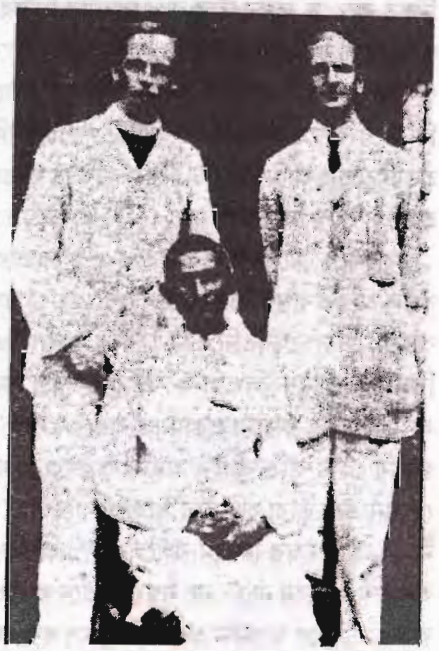

এন্ড্রুজ ও পিয়ারসনের সঙ্গে গান্ধীজী

অনেকে মনে করেন, গান্ধীজীকে এটাই শেখানো হয়েছিল যে, তিনি যেন ভারতবিরোধী বিপ্লবীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মিশে গিয়ে এমন ভূমিকা গ্রহণ করেন যাতে ভারতবাসীর মনে হয় গান্ধীও একজন বৃটিশবিরোধী বিপ্লবী নেতা। শুধু একটা বিষয়ে তাঁদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেবেন যে, ভারতীয়রা যেন ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ কর্মচারিদের গায়ে হাত না তোলেন, বৃটিশের সহযোগী জমিদারদেরও যেন আঘাত না করেন এবং বৃটিশ যাঁকে বা যাঁদেরকে সন্দেহ করে গ্রেফতার করতে চাইবে, তাঁরা যেন বিনা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সহজে ধরা দেন।

এই 'মনে হয়' বলে যা লেখা হোল, এ অনুমান সত্য-মিথ্যা বিচারের দায়িত্ব তো পাঠকের। গান্ধী চেয়েছিলেন যে ভারতবাসী যেন বৃটিশ সরকারকে পিতা মনে করে নিজেদেরকে পুত্র মনে করেন। গান্ধীর ভাষায়— "বাবার কোন আচরণের বিরোধিতা

করার সময় ছেলে কী করে? প্রথমে সে বাবাকে আপত্তিকর পথ পরিহার করার জন্য অনুনয় করে অর্থাৎ সবিনয় আবেদন জানায়। পুনঃ পুনঃ আবেদন সত্ত্বেও পিতা যদি কর্ণপাত না করেন, তাহলে পুত্র এমনকি পিতৃগৃহ ত্যাগ করেও তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা করে। ... রাজা-প্রজার মধ্যও এরকম অসহযোগিতা সম্ভবপর। ... দ্বিতীয় পাঠ হল সহিষ্ণুতার। অসুবিধাজনক হলেও আমাদের রাষ্ট্রের বহু আইন বরদাস্ত করা উচিত। ছেলের কাছে বাবার সব আদেশ যুক্তিযুক্ত না হলেও সে তা পালন করে থাকে।" [দ্রঃ রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭০-৭১]

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হোল, ইংরেজ সরকার ভারতবাসীকে যখন আহত ও নিহত করেছে, তখন তাঁর ব্যথাবেদনার মিটার ওঠেনি। কিন্তু অত্যাচারিত নিপীড়িত ভারতবাসী যখন ক্ষোভে দুঃখে ফেটে পড়ে প্রতিরোধে কিছু মারধোর, খুনজখম করেছেন, তখনই তাঁর অহিংসার ব্যথাবেদনার মিটার পৌঁছে গেছে শেষ সীমায়। তা না হলে তিনি কি করে বলতে পারলেন— "ইতিপূর্বেই আমি বলেছি যে, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের আমি ততোটা নিন্দা করি না যতোটা করি ইংরেজদের হত্যা ও আমাদের হাতে সম্পত্তি বিনষ্টিসাধনকে।" [ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৯৩]

বৃটিশকে মেরো না, শুধু মার খাও, ইংরেজকে নিহত কোর না, শুধু নিহত হও— এই অচল আর অবান্তর নীতিকে চালু করতে এবং ভারতবাসী ইংরেজের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে, সে সম্বন্ধে তিনি ন'টি আদেশ সম্বলিত একটি কানুন তৈরি করলেন। তারমধ্যে তিন নম্বর কানুনে লিখলেন, "এরকম করার সময় তিনি বিরুদ্ধবাদীদের প্রহারও বরদাস্ত করবেন, কিন্তু কখনো প্রত্যাঘাত করবেন না।" চার নম্বর কানুনে বললেন, "কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কোন ব্যক্তি আইন অমান্যকারীকে গ্রেফতার করতে চাইলে তিনি স্বেচ্ছায় ধরা দেবেন এবং তাঁরা যদি তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে চান, তাহলে তাতে বাধা দেবেন না।" আট নম্বর নিয়মে বললেন, "...অথবা দেশি কিংবা ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অপমান করবেন না।" নয় নম্বর আইনে বললেন, "আন্দোলন চলাকালীন কেউ কোন রাজকর্মচারীকে অপমান অথবা আক্রমণ করলে আইন অমান্যকারী নিজের জীবন বিপন্ন করেও ঐ জাতীয় কর্মচারীকে অপমান ও আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবেন। ... সত্যাগ্রহী সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্র থাকবেন এবং অপমান, পদাঘাত, এমনকি তার চেয়েও বেশি দুর্ব্যবহার হলেও নীরবে নিজের স্থানে অটল থেকে গ্রেফতার হবার সময় আসামাত্র তিলমাত্র প্রতিবাদ বিনা গ্রেফতার বরণ করবেন।" [দ্রঃ ঐ, পৃ. ৩৭৩, ৩৭৮]

তিনি আরও বললেন, "প্রয়োজন হলে আমি লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিসর্জন দেবার ঝুঁকি নেব যতক্ষণ অবশ্য তাঁরা স্বেচ্ছায় নিগ্রহবরণ করবেন।" [পৃ. ৪০৯]

বৃটিশের পদলেহী সহযোগী জমিদারদের জন্য তাঁকে প্রশ্ন করা হোল যে, বৃটিশের ছত্রছায়ায় তারা যদি আমাদের জমি জোর করে কেড়ে নেয়, তাহলে আমরা সত্যাগ্রহীরা কী করব— জমি ছেড়ে দোব না প্রতিরোধ করব? "উত্তর : হ্যাঁ, অত্যাচারীর (জমিদারকে) জমি ছেড়ে দেবার জন্য আমি নিঃসঙ্কোচে পরামর্শ দিব।" [পৃ. ৫০১]

গান্ধীর আমেরিকার এক বন্ধু গান্ধীকে প্রশ্ন করেন, ভারত যদি স্বাধীন হয় আর অন্য কোন রাষ্ট্র যদি ভারতকে আক্রমণ করে, তাহলে প্রতিআক্রমণ করা হবে নাকি, দেশটা তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধী জানালেন, "প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি একথা বলব যে, বর্তমানে আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রনীতি হিসাবে অহিংসা গৃহীত হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। ... তবে এই শোচনীয় ব্যাপার যদি ঘটেই, তাহলে অহিংসার সামনে দুটি পথ খোলা আছে। আক্রমণকারীকে দেশ দখল করতে দেওয়া হবে কিন্তু তার সঙ্গে অসহযোগ করা হবে।" [পৃ. ৫১১; ১৩.৪.১৯১১-র 'হরিজন' পত্রিকাতেও এটি ছাপা হয়েছিল]

তাই কি ডক্টর অধ্যাপক নরহরি কবিরাজের মতো তাথ্যিক লেখকও গান্ধীজীর প্রতি সন্দিহান হয়ে স্পষ্ট করে লিখেছেন, "কিন্তু এবারেও যখন সংগ্রাম তুঙ্গে উঠলো, কৃষক আরম্ভ করল জমিদারের বিরুদ্ধে জঙ্গি সংগ্রাম [যেমন উত্তরপ্রদেশ], শ্রমিক আরম্ভ করল দুর্জয় প্রতিরোধ [যেমন শোলাপুর], এমনকি সৈনিকদের কোন কোন অংশ সাম্রাজ্যবাদী শিবির ত্যাগ করে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিতে আরম্ভ করল [যেমন গাড়োয়ালি সৈন্যদের বিদ্রোহ], তখন গান্ধীজী আন্দোলনের রশি টেনে ধরলেন। গাড়োয়ালি সৈন্যদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে অভিনন্দন জানানো দূরের কথা, গান্ধীজী তার নিন্দা করলেন। ... এই জঙ্গি মনোভাবের চরম প্রকাশ ঘটল ঐতিহাসিক নৌবিদ্রোহের (১৯৪৬) মধ্যে দিয়ে। গান্ধীজী এই জঙ্গি আন্দোলনকে সমর্থন করা দূরে থাকুক, এর বিরোধিতা করতে থাকলেন। নৌবিদ্রোহীদের তিরস্কার করে তিনি বল্লেন— তারা এক খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ... সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে এই সংগ্রাম যাতে অধিকতর জঙ্গি রূপ না নিতে পারে, যাতে এই সংগ্রাম কৃষকের শ্রেণীসংগ্রামে পরিণত না হয়, যাতে সংগ্রামের রশি জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতের নাগালের বাইরে চলে না যায়, সেই উদ্দেশ্যে অহিংস মন্ত্রকে একটি বাধ্যতামূলক নীতি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।" [দ্রঃ নরহরি কবিরাজ :'পশ্চিমবঙ্গ' গান্ধী সংখ্যা.পৃ. ৮৫]

লর্ড কার্জনের সময় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ হয়। তখন বঙ্গের হিন্দু নেতানেত্রীগণ প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা চাইলেন যাতে বঙ্গভঙ্গ রদ না হয়। গান্ধীজীর সঙ্গে বৃটিশের এতই নিবিড় যোগাযোগ ছিল যে, তিনি আগেই টের পেয়েছিলেন, হিন্দু নেতানেত্রীদের কথামতো বঙ্গভঙ্গ রদ হবেই। গান্ধী লিখলেন, "আগুন জ্বলিয়া

উঠিল। সে আগুন নিভিবার নয়। বঙ্গভঙ্গ তো রদ হইবেই— বাংলা আবার এক তো হইবেই।" [রচনাসম্ভার, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭]

"তিন বৎসর পরে এই কথা যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হয়। বাংলা আবার জোড়া লাগে।"

গান্ধীজী বৃটিশের লোক ছিলেন— বিরুদ্ধবাদীদের এই যুক্তি তথ্যকে যদি অস্বীকার করাও যায়, গান্ধীর নিজস্ব স্বীকারোক্তিকে অস্বীকার করার উপায় খুঁজে পাওয়া দায়। তিনি বলেছেন, "একটানা ২৯ বছর ধরে আমি যেভাবে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি, অন্য কোন ভারতীয় তা করেননি। ... (বৃটিশ) সাম্রাজ্যের উপকারার্থে কাজ করতে গিয়ে চারবার আমার জীবন বিপন্ন হয়েছিল। বুয়োর যুদ্ধের সময় আমি এম্বুলেন্সবাহিনীর অধিকর্তা ছিলাম। জেনারেল বুলারের চিঠিপত্রে ঐ বাহিনীর কাজের উল্লেখ আছে। নাটালে জুলু বিদ্রোহের সময়েও আমি এম্বুলেন্সবাহিনী গড়ে তুলি। ঐ সময় কষ্টকর শিক্ষানবিশীর ফলে আমি প্লুরিসিতে আক্রান্ত হই। শেষবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার কনফারেন্সে' লর্ড চেমসফোর্ডকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের জন্য আমি কয়রা জেলায় বাহিনী গঠনের অভিযানে আত্মনিয়োগ করি।" [দ্রঃ রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৮০]

গান্ধীজীর ভাষায়, "আজীবন বৃটিশ জনগণের নিঃস্বার্থ বন্ধু বলে আমি নিজেকে দাবি করি। একসময় আমি আপনাদের সাম্রাজ্যের প্রতিও প্রীতি পোষণ করেছি। আমি ভেবেছিলাম ঐ সাম্রাজ্য ভারতের মঙ্গল করছে। কিন্তু যখন দেখলাম যে তা অবস্থার গতিকে ভারতের কোন মঙ্গল করতে পারে না, তখন থেকেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য অহিংসার পদ্ধতি গ্রহণ করেছি এবং এখনো ঐ পদ্ধতিকেই আশ্রয় করে আছি। আমার দেশের ভাগ্যে যাই থাকুক না কেন, আপনাদের প্রতি প্রীতি অক্ষয় রয়েছে, অক্ষয়ই থাকবে।" [ঐ, পৃ. ৪৪২]

অখ্যাত আর কুখ্যাত ব্যক্তিরা গান্ধী সম্পর্কে উদ্ভট নতুন কিছু বললে তা উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে 'বাজে কথা' বলে, কিন্তু যাঁরা বঙ্গ, ভারত তথা বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি, তাঁদের গান্ধীবিরোধী মন্তব্যকে সব ক্ষেত্রে উড়িয়ে দেওয়া অন্যায় এবং তা অন্ধতা ছাড়া কিছু নয়। যেমন ১৯২৮ সালের জুলাই-এর তিন তারিখে বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি রোমাঁ রোলাঁ গান্ধীজীকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যাতে গান্ধীজীর নীতিবিরোধী কর্ম অর্থাৎ যুদ্ধে বা হত্যাকাণ্ডে সহযোগী হওয়ার বিরোধিতা করেছেন তিনি। তিনি লিখেছেন, "আমার ভগিনী ১৬ই ফেব্রুয়ারির 'ইয়ং ইন্ডিয়া'র (পত্রিকা) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আপনার সহযোগিতা সম্বন্ধে আপনার নিবন্ধ আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন।... কিন্তু আপনার মতো একজন অদম্য সাহসী এবং গভীর বিশ্বাসপরায়ণ ব্যক্তি যিনি আপোসহীনভাবে পাইকারি

নরহত্যার নিন্দা করেন— নিন্দা করেন জাতির সঙ্গে জাতির রণোন্মাদনার, তিনি যখন স্বেচ্ছায় এবং অন্যের বিনা প্ররোচনায় এইরূপ নরমেধে অংশগ্রহণ করতে পারেন, তখন পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমাকে দিয়ে আপনার এই কাজ সমর্থন করাতে পারে।" [স্বাধীনতার ফাঁকি : বিমলানন্দ শাসমল, পৃ. ১৫]

ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার গান্ধীর পরিকল্পনা পদ্ধতি ও অহিংস সংগ্রাম ইত্যাদি সম্বন্ধে বলেছেন, গান্ধীজী ছিলেন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। তাঁর ভাষায় Gandhi "was history's magnificent failure."

বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু বলেছেন, "গান্ধী বড়ই সংকীর্ণ, তিনি শিল্পবিজ্ঞানের প্রতি বড়ই উদাসীন বা খড়্গহস্ত। মনের এই স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় ঐশ্বর্যের তাঁর বড়ই অভাব।"

গান্ধীর প্রচারের কাণ্ডকারখানা দেখে তাঁর প্রতি অনাস্থা এসেছিল
বিজ্ঞানী স্যার মেঘনাদ সাহারও। তিনি বলেছেন, "আমরা এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করিনা যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র চরকা, কটিবস্ত্র আর গরুর গাড়ি সম্বল করে জীবনযাত্রাকে স্বচ্ছল বা সুখী করা যায়। বরং বৈজ্ঞানিক অবিষ্কারের যথাযথ প্রয়োগ থেকেই আমাদের জটিল আর্থিক, সামাজিক, এমনকি রাজনৈতিক সমস্যারও সমাধান সম্ভব।" [দ্রঃ পশ্চিমবঙ্গ : গান্ধী সংখ্যা, ১৯৯৫; দেশ : ৯ই অক্টোবর, ১৯৯৩]

ডক্টর আম্বেদকর যিনি কয়েক কোটি অনুন্নত মানুষের নেতা, তিনি স্পষ্ট ভাষায় ছোট্ট করে গান্ধী সম্পর্কে বলেছেন, গান্ধী ছিলেন একজন 'সফল প্রতারক'। ইংরেজিতে তিনি গান্ধীকে বলেছেন—"successful humbug" [দ্রঃ Gandhi : Saint or Sinner? by Barrister Fazlul Huq, p. 2]

ডক্টর আম্বেদকর অনুন্নত শ্রেণী, 'ছোটলোক' বলে যাঁরা চিহ্নিত, গান্ধীজী কর্তৃক 'হরিজন' উপাধিপ্রাপ্ত মানুষদের সার্বিক উন্নতির কথা ভেবে অর্থাৎ তাঁরা যেন তথাকথিত ভদ্রলোকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারেন, তাঁদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি করলেন। তখন সকলেই জানতেন যে, গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা দূর করতে চান। তিনি তাঁদের ভালবাসেন আর সেই সঙ্গে কামনা করেন তাঁদের সার্বিক উন্নতি। কিন্তু হয়ে গেল বিপরীত। ডঃ আম্বেদকরের সৎ উদ্দেশ্য অনুভব করে তখনকার বৃটিশের প্রতিনিধি স্যার স্যামুয়েল হোর সেটা মেনে নেওয়া সঠিক মনে করলেন। মুসলিগ লীগের মুসলমান সদস্যদেরও তাতে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি ছিল। কিন্তু গান্ধীজী তা হতে দিলেন না। তিনি অনশন করে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। গান্ধীজী বললেন, "আমি স্যার স্যামুয়েল হোরকে জানাইয়াছি যে, আমাকে অনশনব্রত চালাইতে হইবে কারণ আমি এক্ষণে অপর কোনও উপায়ে বৃটিশ গভর্নমেন্টের সিদ্ধান্তকে বাধা প্রদান

করিবার আশা করিতে পারি না। অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন তাহাদের কিংবা হিন্দুধর্মের পক্ষে অনিষ্টকর। ইহা মনে করা আমার পক্ষে ভুল হইতে পারে। তাহা হইলে আমার জীবনযাত্রা পদ্ধতির অন্যান্য অংশও সম্ভবত নির্ভুল নহে। এমতাবস্থায় অনশনে প্রাণত্যাগ আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। (ইতি) আপনার একান্ত বশংবদ (স্বাক্ষর) এম. কে. গান্ধী। [বঙ্গবাণী, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২]

গান্ধীজীর অনশনের মূল উদ্দেশ্য একটাই। সেটা অনুন্নত সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচনের অধিকার বন্ধ করা, যাতে ভবিষ্যত অনুন্নত সম্প্রদায় রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করে উচ্চবর্ণের দাসত্ব থেকে নিজেরা মুক্ত হতে পারে তার সর্বপ্রকার পথ অবরোধ করা। এ ব্যাপারে সকল প্রকার আদর্শ ও নীতি বিসর্জন দিয়ে বিজ্ঞানী, লেখক, কবি থেকে শুরু করে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সকলে এসে গান্ধীর পাশে দাঁড়ালেন। শুধু একটাই উদ্দেশ্য, কিছুতেই ডঃ আম্বেদকরের দাবি মানা হবে না। একে বাধা দিতেই হবে।" [রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী ও আম্বেদকর : শ্রী জগদীশচন্দ্র মন্ডল, ২৪-২৫ পৃষ্ঠা, ছাপা ১৯৮২]

যাঁরা গান্ধীর সমর্থক হয়ে তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন সেইসব মনীষীদের মধ্যে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জী, রামানন্দ চ্যাটার্জী, নলিনীরঞ্জন সরকার, কিরণশঙ্কর রায়, তারকনাথ মুখার্জী, নেলী সেনগুপ্তা, সত্যদেব বিদ্যালংকার, ভি.পি. খৈতান, সুশীল রায়চৌধুরী, কামিনী রায়, স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, স্যার চুনীলাল মেটা, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব, স্যার ডঃ নীলরতন সরকার, রায়বাহাদুর হরিধন দত্ত, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ অনেকেই উল্লেখযোগ্য।

"কংগ্রেসসহ গান্ধীজীর নুন আন্দোলন, ভারতের পূর্ণ স্বরাজলাভ কর্পূরের মত উবে গিয়ে অস্পৃশ্যদের পূর্ণ অধিকারসহ সামাজিক মুক্তিলাভের অধিকারকে খর্ব করতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন আর সেই কাজে তাঁকে সাহায্য করতে এলেন ভারতের জ্ঞানীগুণীজন। তাঁরা ধুয়ো তোলেন অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচন মেনে নিলে হিন্দু ধর্ম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবে। তাই হিন্দু ধর্ম রক্ষার নাম করে অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচনের পরিবর্তে তাদের মন্দির প্রবেশের অধিকার লাভের আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই উপবাসব্রতউপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'জয় হোক তপস্বী, তোমার তপস্যা সার্থক হোক'।" [ঐ, পৃ. ৪৮-৪৯]

"অপরদল বিশেষ করে রাজা গোপালাচারী, মদনমোহন মালব্য, জি. ডি. বিড়লাসহ কতিপয় নেতা ডঃ আম্বেদকরকে অনুরোধ জানান গান্ধীজীর সহিত আপোস চুক্তিতে আবদ্ধ হতে। চতুর্দিক হতে ডঃ আম্বেদকরের উপর প্রবল চাপ আসায় তাঁকে বাধ্য হয়ে আন্দোলনের ধারা পরিবর্তন করতে হয়। দীর্ঘদিনের পৃথক নির্বাচন আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটলো।" [ঐ, পৃ. ৭২-৭৩]

এইসব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যগুলি বহুল প্রচারিত না হলেও বেঁচে আছে ইতিহাসের পাতায় আজও। অনেকের মতে তাই মাঝে মাঝে সমাজে আগ্নেয়গিরির মতো উদ্গীরিত হয় পুঞ্জীভূত ক্রোধ-ক্ষোভ-দুঃখ-অভিমান ও প্রতিবাদ। সেইজন্য নকশাল নেতা চারু মজুমদারদের সময়ে আমাদের দেশের নামী দামী নেতাদের মার্বেল পাথরের যত মূর্তি ছিল তার মাথাগুলো কাটা শুরু হয়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ একটি উদ্ধৃতি দেওয়ারও প্রয়োজন আছে— "বিপ্লবী যুবসমাজ এখন মূর্তিভাঙার উল্লাসে মত্ত। বিদ্যাসাগর ছাড়াও রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও অন্যান্য জাতীয় নেতাদের মূর্তি ভাঙা হয়েছে অন্যান্য জায়গায়, দেওয়াল থেকে তাঁদের ছবি নামিয়ে এনে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে আগুনে। বিদ্যাসাগরের উপর রাগটাই যেন বেশি, বিদ্যাসাগরের শুধু মুন্ডুই কাটা হয়নি তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিও ছড়িয়ে পড়েছে প্রচন্ড ঘৃণা। দিকে দিকে স্কুল কলেজে ভাঙচুর-তছনছ হচ্ছে। এমনকি স্কুলের ছাত্ররাও পুড়িয়ে দিচ্ছে তাদের ইস্কুল। প্রতিবাদ করার সাহস কারুর নেই। বিপ্লবী ছাত্রদের কাছে এখন প্রচুর হাতবোমা সেগুলি যথেষ্ট কার্যকর। তাতে শুধু ভয় ধরানো প্রচন্ড শব্দই হয় না, মানুষও মরে। এরা মূর্তি ভাঙছে নতুন মূর্তি গড়বে বলে। গান্ধীকে সরিয়ে এরা ঝাঁসির রাণীর মূর্তি বসাবে, ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাট হবে মঙ্গলপান্ডে ঘাট। এইসব নবীনেরা শোধনবাদী অতীতের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। চারু মজুমদারও সমর্থন জানালেন এই তারুণ্যের উদ্দীপনাকে। তিনি লিখলেন, 'ঔপনিবেশ শিক্ষাব্যবস্থা আর ধনতন্ত্রের দালালদের প্রতিষ্ঠিত মূর্তিগুলো না ভাঙলে নতুন বিপ্লবী শিক্ষা ও সংস্কৃতির পত্তন করা যাবে না'।" [সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা : দেশ, মার্চ, ১৯৮৮]

গান্ধীজীর পিতা করমচাঁদ

যাঁরা গান্ধীকে বহু প্রচারিত 'অহিংস গান্ধী, সহজ ও সরল প্রাণের দয়ালু মানুষ' বলে বিশ্বাস করেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁরা তাঁকে তার বিপরীত মনে করেন, তাঁদের পক্ষ থেকে বলা হয়, তিনি ছিলেন একজন উৎকট চরমপন্থী ডিক্টেটর। শ্রী সত্যেন সেন যিনি স্বয়ং দেশের জন্য ১৯৩০ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত জেলে কাটিয়েছেন, তিনি তাঁর 'পনেরোই আগস্ট' বইতে লিখেছেন, "কিন্তু ইহার পর হইতেই কংগ্রেস নেতৃত্ব ক্ষমতা বণ্টনের ব্যাপারে আদর্শের পরিবর্তে ব্যক্তিগত আনুগত্যকে প্রাধান্য দিতে থাকে। এবং

যাঁহারা ইহার প্রতিবাদ করেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে থাকে। এই সম্পর্কে গান্ধীজীর বক্তব্য— 'Those, who are inside the congress, must remain silent and those who will not must go out.' অর্থাৎ যাঁহারা কংগ্রেসের ভিতরে আছেন— তাঁহারা নীরব থাকিবেন এবং যাঁহারা ইহা পারিবেন না, তাঁহারা বাহিরেই থাকিবেন।" [দ্রঃ পৃ. ১০৯]

যে গান্ধীজী অহিংসা প্রচার করলেন, খোলা কথায় জানালেন নিজেদের আহত, নিহত হওয়া চলবে, অপরকে আহত নিহত করা যাবে না কোনক্রমেই, অন্যভাবে বললে এই দাঁড়ায় যে, অস্ত্রধারণের পরিবর্তে ধরে রাখতে হবে শাস্ত্রকে এবং সেই শাস্ত্রটি এমন হবে যেখানে অস্ত্রের সংস্রব থাকবে না মোটেই, সেই গান্ধীজীই ১৯১৮-র ২৭শে এপ্রিল ভাইসরয়ের অনুরোধে বৃটিশের রক্তাক্ত যুদ্ধে সমর্থন জানিয়ে সই দিলেন। কি করে তিনি বলতে পারলেন, "With a full sense of my responsibility, I beg to support the resolution." অর্থাৎ আমি পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞান সহকারে এই (যুদ্ধের) রেজলিউশন সমর্থন করছি।

ঐ ১৯১৮-র ২৩শে জুন অহিংস গান্ধীজী জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন, "If we want to learn the use of arms with the greatest possible despatch, it is our duty to enlist ourselves in the army. There can be no friendship between the brave and the effeminate. We are regarded as a cowardly people. If we want to become free from that reproach, we should learn the use of arms." [দ্রঃ Tendulkar : Mahatma Gandhi, vol. 1, p. 277, 280]

তাহলে কি করে গান্ধীজী বলতে পারলেন এই মারাত্মক কথাটি যে, অস্ত্র ব্যবহার ঠিকঠাক শেখার জন্য যুদ্ধবাহিনীতে নাম লেখানো কর্তব্য। সাহস আর মেয়েলিপনার মধ্যে কোন মিল হতে পারে না। ভারতীয়দেরকে লোকে কাপুরুষ বলে মনে করে— তাই এই বদনাম থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের অস্ত্রের ব্যবহার শেখা উচিত। যদি বন্দুক ও কামান চালানোর শিক্ষা নেওয়া হয়, তাহলে যখন তা প্রয়োগ করা হবে তখন শতসহস্র মানুষের রক্ত ঝরতে পারে ও মৃত্যু হতে পারে এটা তিনি ভুলে গেলেন বি করে?

শ্রী সত্যেন সেন লিখেছেন, "গান্ধীজী ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে নেতৃত্বের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শান্তির বাণী প্রচার করিতেছিলেন।" [ঐ, পৃ. ৩০] লেখক আরও লিখেছেন, "কেননা আমরা দেখিয়াছি যে, শুধু অহিংস নীতির জন্যই গান্ধীজীকে কংগ্রেসের নেতৃত্বের পদ হইতে একাধিকবার অপসারিত করা

হইয়াছে। শুধু এই ব্যাপারে হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন কংগ্রেসে ছিল না। কংগ্রেস হিংসা ও অহিংসাকে বরাবরই সুবিধা অনুযায়ী গ্রহণ ও বর্জন করিয়া আসিয়াছে।" [পৃ. ৪১]

গঙ্গানারায়ণ চন্দ্রও লিখেছেন, "শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু ইওরোপ থেকে ফিরলেন। তিনি দেখলেন যে কংগ্রেসের সমস্ত কিছুর পিছনে গান্ধীজীর অদৃশ্য হাত কাজ করছে। তিনি সভ্য না হয়েও কংগ্রেসের একনায়ক ডিক্‌টেটর। কংগ্রেস বলতে গান্ধীজী ছাড়া আর কিছু না।" [দ্রষ্টব্য : অবিস্মরণীয়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫]

গান্ধীজীর এই চরম ও প্রচণ্ড একনায়কতন্ত্রের ধাক্কায় সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশেষে ভারতের বাইরেই তাঁকে চলে যেতে হোল। ভারত আর ফিরে পেল না তাঁর নেতৃত্ব, এমনকি জীবন্ত অথবা মৃত দেহটুকুও।

গান্ধীজীর নিজের লেখা এবং ভারতীয় লেখকদের লেখা থেকেই শুধু তাঁর চরিত্রের আচ্ছাদিত দিকগুলো প্রমাণিত হয় না। বরং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখকদের লেখা হতেও যা পাওয়া যায়, তা বহুক্ষেত্রে গান্ধীভক্তদের কাছে বেদনা ও লজ্জা ছাড়া কিছু নয়। যেমন দৈনিক পত্রিকা 'প্রতিদিনে' ১৯৯৮-এর ১২ই অক্টোবর 'গান্ধী অস্থিরমতি, জিন্না ধর্মনিরপেক্ষ : বৃটিশ লেখক' এই শিরোনামে ছাপা হয় যে, "মহাত্মা গান্ধীকে 'অস্থিরমতি, আবেগপ্রবণ' বলে চিহ্নিত করেছেন এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৃটিশ লেখক। নাম প্যাট্রিক ফ্রেঞ্চ। জিন্না সম্পর্কে তাঁর মতামত, 'ভদ্রলোককে দেশভাগের জন্য অনেকে দায়ী করলেও শেষ অবধি তিনি ধর্মনিরপেক্ষই ছিলেন।' প্যাট্রিক তাঁর বই 'লিবার্টি এন্ড ডেথ— ইন্ডিয়ান জার্নি ফর ইনডিপেন্ডেন্স এন্ড ডিভিশন'-এর গোড়াতেই বলে দিয়েছেন, 'গান্ধীকে হিরো বানানো হয় ঠিকই, কিন্তু প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে তিনি যে আচরণ করেছেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা লক্ষ্য করলে প্রচারের বেলুন চুপসে যেতে বাধ্য।' ... দীর্ঘ গবেষণার পর প্যাট্রিকের সিদ্ধান্ত, জিন্নাকে পাকিস্তানের দাবিতে অনড় মনোভাব দেখাতে বাধ্য করেছিলেন কংগ্রেস নেতারাই। গান্ধী এবং জিন্নার চরিত্রে বিশাল পার্থক্য দেখাতে গিয়ে প্যাট্রিক মন্তব্য করেছেন, দুজনেই গুজরাটের লোক। মাত্র ৩০ মাইল দূরত্বে দুজনের বাড়ি ছিল। একই জায়গার লোক হলেও দুজনের মধ্যে প্রায় কিছুই মিল ছিল না। গান্ধীর জীবন ও তাঁর বাণী সম্পর্কে দীর্ঘদিন পড়াশোনা করে প্যাট্রিক বলেছেন, ভদ্রলোক সত্যের পূজারী ছিলেন, কিন্তু সত্যটা কী, তাই অনেক সময় বুঝে উঠতে পারতেন না। তাঁর লেখাপত্র পড়ে বোঝাই যায় না, ঠিক কি বলতে চাইছেন। ধর্ম, রাজনীতি, দর্শন, নিজের স্বাস্থ্য, যৌনতা, সবকিছু একসঙ্গে মিশিয়েছেন। নাতনি মানুর সঙ্গে বিছানায় শোয়ার কথা জানাজানি হতে প্রার্থনাসভায় সবার সামনে গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি চাইনা আমার সবচেয়ে নির্দোষ ব্যবহারকে কেউ ভুল বুঝুক।' ভদ্রলোক আসলে ব্যক্তিজীবন আর রাজনৈতিক জীবনের পার্থক্য করতেন না। গান্ধীর

বিখ্যাত আত্মজীবনী 'মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ' সম্পর্কে প্যাট্রিক মন্তব্য করেছেন, 'আসলে সারা জীবন নিজের বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভদ্রলোকের যা অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সে কথাই তিনি বইতে লিখেছিলেন।'

বিদেশী লেখক মিঃ প্যাট্রিকের কথাগুলো খুব একটা অবাস্তব মনে হবে না যদি গান্ধীজীর সারা জীবনের লেখা, ভাষণ, উপদেশ ও কর্মধারা খুব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করা যায়। তিনি নিজেকে একজন চিকিৎসক বলেই দাবি করতেন। শুধু দাবি আর তা বিশ্বাসই করতেন না, অনেকের চিকিৎসা করে তাদের সুস্থ করে দিয়েছেন বলে তিনি লিখেছেন। তাছাড়া নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া, ব্রহ্মচর্য পালন করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা আর খাওয়াদাওয়ার প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল তাঁর। এইজন্যই তিনি জনসমাজে বলেছিলেন, তিনি ১২৫ বছর বাঁচবেন। বলেছেন, "অন্তরাত্মা ঢালিয়া রামনাম করিলে যে কোন অসুখ সারে, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই, ভগবানের অনন্ত নাম। যে নামে যাহার রুচি, সেই নামে সে তাঁহাকে ডাকিতে পারে।" [রচনা, ৪র্থ, পৃ. ৩২০] তিনি আরও লিখেছেন, 'রামনাম মামুলি হিতোপদেশ নহে। ইহা এমন এক বস্তু যাহা অনুভবে উপলব্ধি করিতে হয়। এই সাক্ষাৎ উপলব্ধি যাহার হইয়াছে, সে-ই কেবল রামনামের ব্যবস্থা দিতে পারে। অন্য কাহারও সে অধিকার নাই।... একথাই বুঝিতে হইবে যে তাঁর নাম লইলে যে সকল দুর্গতি দূর হয়, এ উপলব্ধি আমাদের নাই। এই উপলব্ধি আসিবেই বা কি করিয়া? ডাক্তার-বৈদ্য-হাকিম বা অন্য চিকিৎসকেরা এই মহৌষধের শরণ লইতে বলে না, ইহাতে তাহাদের বিশ্বাস নাই। গঙ্গার পাবনধারা যে গৃহে গৃহে বওয়ানো যায়, একথা স্বীকার করিলে যে তাহারা বেকার হইবে, মানে তাহাদের রোজগারের পথ বন্ধ হইবে। অতএব ঠেকিয়াই অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া পাউডার বা মিক্সচার তাহাদের চালাইতে হয়। ইহাতে ডাক্তারদের পেট তো ভরে বটেই, আর অন্যদিকে ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় যে রোগীরাও যেন হাতে হাতে ফল পায়।" [পৃ. ৩২১-২২]

তিনি আরও লিখেছেন, "আধ্যাত্মিক ব্যাধিতে মানুষ অনাদিকাল হইতে রামনামের আশ্রয় লইয়া আসিয়াছে। ক্ষুদ্র তো বৃহৎ-এরই অংশ। তাই তো আমি বলি যে, শারীরিক ব্যাধিতেও রামনাম অব্যর্থ মহৌষধ।" তিনি অন্যত্র বলেছেন, "রামই আমার ঈশ্বর। আমার রাম— অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি অজ স্বয়ম্ভু। অতএব আপনারা বিভিন্ন ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করুন।" আবার সেই মুখেই গান্ধীজী বললেন, "পূজায় আমার আস্থা নাই।" তাহলে তিনি মূর্তিপূজার বিরোধী হয়ে গেলেন। অথচ তারপরেই বললেন, "তথাপি তথাকথিত পৌত্তলিকতাকে আমি শ্রদ্ধা করি।" [দ্রঃ ঐ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৯]

তাহলে কি পণ্ডিত প্যাট্রিকের উপরোক্ত কথাই মেনে নিতে হবে যে, গান্ধীজী যা বলতেন তা আসলে কি, তা নিজেই বুঝতেন না তিনি। যে রামনামের তিনি এতো গুণগান গাইলেন, সেই রামনামের জন্য আবার কি করে লিখলেন, "কিন্তু তাই বলিয়া ইহাও নহে যে, রামনাম সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রে অব্যর্থ। ... অতিভোজনের ভোগ না ভুগিয়া পুনরায় অতিভোজনের বাসনা হইতে সে যদি রামনাম করিয়া অজীর্ণ হইতে অব্যাহতি পাইতে চায়, তবে বলিব রামনাম তাহার জন্য নয় : রামনাম সেখানে বেকার।" [ঐ, পৃ. ৩২৪]

গান্ধীজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিলাল

গোঁড়া হিন্দুর মতো গোরক্ষা বা গোহত্যার ব্যাপার নিয়ে তিনি স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন, "গোরক্ষায় অবিশ্বাসী কোন কারও পক্ষে বোধহয় হিন্দু হওয়া অসম্ভব। ... গো-সেবা বিশ্বসংস্কৃতিতে হিন্দু ধর্মের অবদান। আর যতদিন গোরক্ষায় নিরত হিন্দুদের অস্তিত্ব থাকবে, ততোদিন হিন্দু ধর্মও টিকে থাকবে।" [রচনা, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯৫-৪৯৭]

গরু সম্পর্কে এই মন্তব্য যিনি করেন, তিনিই আবার তাঁর সঙ্গীসাথীদের অর্থাৎ সত্যাগ্রহীদের গোমাংস খেতে অনুমতি বা অর্থ দিতে পারেন কি করে? তিনি তাঁর জীবনীতে লিখেছেন, "এই (আশ্রমের) পরিবারদিগকে যখন ভরণপোষণের জন্য অর্থ দিয়াছি, তখনই তো মাংস এমনকি গোমাংসাহারে সহায়তা করিয়াছি।... খৃষ্টান ও মুসলমান ভাইয়েরা গোমাংস চাহিলেও তাঁহাদের তা না দিয়া উপায় নাই।... সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের এই প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, তাঁহারা গোমাংস চাহিলে তাহাও পাইবেন।" [ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৩]

গোঁড়া হিন্দুর মতো গোরক্ষার পক্ষে বলে আবার সেই মুখে বিপক্ষেও বলতে পারলেন যে, "তাহা হইলে আমি কি গরুকে বাঁচাইবার জন্য মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করিব, মুসলমানকে মারিব? এমন করিলে তো আমি মুসলমান ও গরু উভয়েরই শত্রু হইব। এইজন্য আমার নিজের বুদ্ধিমত বলিতে পারি যে, গরুকে বাঁচাইবার একটি উপায়— মুসলিম ভাইদের বোঝানো যে, গরুর দ্বারা সকলেরই লাভ হয়, অতএব গোরক্ষা করা দরকার। যদি তাহারা ইহা না বুঝেন, তাহা হইলে গরুকে মারিতে দেওয়াই আমার উচিত; সহজ কারণ হইল তাহাকে বাঁচানো আমার হাতের বশ নহে। আমার যদি গরুর

জন্য করুণায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইত, তাহা হইলে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আমার নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া উচিত, ভাই-এর জীবন নেওয়া কখনোই প্রার্থিত নয়। ... হিন্দুরা যখন জেদ করে, তখনই গোহত্যা বাড়ে। আমার মতে গোরক্ষা প্রচারণী সমিতিগুলিকে গোহত্যা সমিতি বলা উচিত।" [ঐ, ৩য়, পৃ. ২৬]

গরু রক্ষাকারীর মুখোশ খুলে উদারপন্থী (?) হয়ে আবার লিখে ফেললেন, "মুসলমানেরা গোমাংসের জন্য গরু কাটে বলিয়া যে হিন্দু তাহাদের সহিত কলহ করে, সেই হিন্দুই কিন্তু ইংরেজের দাসত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত নয়। অথচ ইংরাজেরা যে পরিমাণ গোমাংসভোজী, মুসলমানেরা তো সেই তুলনায় কিছুই নয়। গরু খায় বলিয়াই তো আর ইংরাজের সহিত আমার কোন কলহ নাই, এবং সেই কারণে মুসলমানদের সহিত আমার কোন বিবাদ নাই। হিন্দুদের ব্যবহারের অসঙ্গতিটি দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। টাকার লোভে তাহারা অনায়াসে ইংরাজ প্রভুর সেবা করে, কিন্তু মুসলমানদের বেলায় তাহাদের সঙ্গে বিবাদ করে। তাহা ছাড়া আপনারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, অনেক হিন্দুও পরিতৃপ্তির সহিত গোমাংস আহার করে। আমি এমন অনেক গোঁড়া বৈষ্ণবকে জানি যাঁহারা অসুখের সময় চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী গোমাংসের নির্যাস গ্রহণ করেন।" [ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

বৃটিশের কোটি কোটি টাকার গোমাংস খাওয়ায় কোন প্রতিবাদ না ওঠায় তিনি লিখলেন, "এঁড়ে বাছুরগুলিকে হত্যা করা হইত, কারণ তাহাদের সবগুলিকে চাষের গাড়িটানা বলদে পরিণত করা যাইত না। এইসকল গোশালা শত শত একর বা তাহারও অধিক পরিমাণ জমি জুড়িয়া ছিল। ইহাদের সকলগুলিই প্রধানত ইওরোপীয় সৈন্যদের সুবিধার জন্য পরিচালিত হইত। এইগুলিতে বহু কোটি টাকা ব্যয় হয়।" [ঐ, পৃ. ২৯৫]

হয়তো তিনি অনুভব করেছিলেন যে, বৃদ্ধা গাভি আর বৃদ্ধ বলদ ও ষাঁড়গুলো খাদ্যের অভাবে ও অযত্নে তিলে তিলে যখন মৃত্যুতে পৌঁছায়, তখন ওগুলোকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করাই উচিত। তা না হলে একথা স্পষ্ট করে গান্ধীজী কি করে বলতে পারলেন যে, "গোহত্যার জন্য মুসলমানদের দোষী করা মূর্খতা। হিন্দুরাই অত্যাচার করিয়া তিলেতিলে গোহত্যা করিতেছে। একেবারে মারিয়া ফেলা অপেক্ষা কষ্ট দিয়া আস্তে আস্তে মারা আরও ভয়ঙ্কর।"

স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলতে গেলে মনে পড়ে যায়, বহু স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তি প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সেও যুবকের মতো সুদর্শন ও কর্মঠ হয়ে মাথা সোজা করে জীবনসংগ্রামে নিজেকে যুক্ত রেখে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রমাণিত করে থাকেন তাঁদের স্পষ্ট সত্তাকে। আবার অল্প বয়সেই বার্ধক্যের আক্রমনে ন্যুব্জ হয়ে পড়েন কেউ কেউ। ছবিতে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে গান্ধীজী তাঁর শরীর, স্বাস্থ্যকে ধরে রাখতে পেরেছিলেন কতটুকু।

শ্রী ননীগোপাল দাস একটি ইংরেজি পুস্তক লিখেছেন যেটার নাম Was Gandhiji a Mahatma? গান্ধীজীর দর্শন শ্রুতিমধুর হলেও তা নিয়ে থেকে যায় আরও ভাবনাচিন্তার অবকাশ। তাঁর সময়ে একজন ভারতীয়ের দৈনিক গড় আয় ছিল ছ'পয়সা। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, একজন সাধারণ ভারতবাসীর মতো তিনিও প্রতিদিন মাত্র ৬ পয়সাই বেঁচে থাকার জন্য খরচ করবেন। শ্রী দাসও লিখেছেন, "The average daily income of an Indian was only six pice. So, Gandhiji would take his daily food worth six pice."

গান্ধীজীর দ্বিতীয় পুত্র মণিলাল

কিন্তু ১৯৫৪-র ডিসেম্বরে কলকাতায় যখন তিনি এসেছিলেন, তখন তাঁর খাবারের একটি তালিকা ঐ পুস্তকে দেওয়া আছে। সেটা হোল:

ভোর ৫টায় : মুসুম্বি অথবা কমলালেবুর রস ১৬ আউন্স, সকাল ৭টায় : ছাগলের খাঁটি দুধ আর ফলের রস ২৪ আউন্স, বেলা ১২টায় : ১৬ আউন্স ছাগলের দুধকে ফুটিয়ে করা হবে ৪ আউন্স। তার সঙ্গে ৮ আউন্স সেদ্ধকরা টাটকা সব্জি (যেমন গাজর, মুলো, টমেটো ইত্যাদি), ২ আউন্স কাঁচা সবজি পাতা (যেমন ধনেপাতা, শাক ইত্যাদি)। বেলা ২.৩০ : ডাবের জল, সন্ধ্যা ৫ টায় : ১৬ আউন্স ছাগলের দুধকে ফুটিয়ে ৪ আউন্স করে তারপরে ১০ আউন্স দুধে ফোটানো খেজুর, কিছু পরিমাণ ফল আর সেইসঙ্গে নারকেল। এরপর গান্ধীজী যখন শয্যাগ্রহণ করতেন, তখন তাঁর দুই পায়ে বেশ খানিকটা খাঁটি ঘি মালিশ করে শুষিয়ে দিতে হোত। তিনি প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি মধু খেতেন। গান্ধীজী একরকমের রুটি খেতেন, তার নাম ছিল (Khakrah) খাকড়া। এক একটি রুটিতে থাকতো ৫ আউন্স আটা, ৫ গ্রেন সোডিয়াম বাই-কার্বনেট, অল্প লবণ আর অল্প জল। আর বেশি পরিমাণে ছাগলের দুধের ঘি। তারপরে সেটা সেঁকা হোত। সেসব খাবার তৈরি করতে এবং তাঁর সেবায় দক্ষ রাঁধুনি ও সেবক সেবিকা মোতায়েন থাকতো সবসময়। তিনি কোন খাবারে কখনো তেল খেতেন না, খাঁটি ছাগলের দুধের ঘি-ই ছিল তাঁর একমাত্র পছন্দ।

আন্তর্জাতিক লেখক শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাত্মাজীর নিরামিষ ও শাকান্ন খাওয়ার কথা স্বীকার করেই লিখেছেন, "কিন্তু মহাত্মাজীর যে সেক্রেটারির উপর তাঁহার

থাকা-খাওয়ার ভার অর্পিত ছিল, তিনি বেলা এগারোটার আগে অর্থাৎ তাঁহার মধ্যাহ্নভোজনের একঘণ্টা মাত্র থাকিতে, তিনি সেদিন কি শাক খাইবেন, তাহার নির্দেশ দিতেন। গান্ধীজী প্রত্যহ এক শাক খাইতেন না অরুচি হইতে পারে বলিয়া।"

ছাগলের দুধের কথা একটু আগেই উল্লেখ করা হোল। শ্রী চৌধুরী লিখেছেন, 'ইহার পর দুধের ব্যবস্থা। কামজ উত্তেজনা হয় বলিয়া মহাত্মাজী গাই-এর দুধ খাইতেন না। ছাগীর দুধের সঙ্গে রসুনের রস মিশাইয়া খাইতেন। ... তবু ছাগীর সন্ধান বিপুল উদ্যমে আরম্ভ হইল। একদিন সকাল সাতটার সময়ে উডবার্ন পার্কে আসিয়া দেখি, বাড়ির বাহিরের উঠানে প্রায় কুড়িটা ছাগী পাতা চর্বন করিতে করিতে মে-হে মে-হে করিতেছে। ছাগীপালকেরা বলিল, কোন্ ছাগী মহাত্মাজীর দুধ-মা হইবে, তাহা নির্বাচন করিবার জন্য স্বয়ং মহাদেব দেশাই (গান্ধীজীর সেক্রেটারি) আসিবেন। আমি ব্যাপারটা দেখিবার জন্য একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মহাদেব দেশাই আসিয়া গম্ভীর মুখে একটি একটি করিয়া ছাগীর দিকে কঠিন দৃষ্টিপাত করিলেন এবং যে ছাগী তাঁহার সেই দৃষ্টিতে চক্ষু নত করিল, তাহাকে অসতী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। একটিমাত্র ছাগী তাহা না করিয়া কটমট করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সেটিই নির্বাচিত হইল।"

এই পনেরো-কুড়িটি ছাগীর অভিভাবকদের কাছ থেকে ছাগীগুলোকে আনা এবং আনার খরচ বহন করা ইত্যাদি ক্ষুদ্র বিষয়ে মহাদেব দেশাই-এর মতো বিরাট নেতাকে তদারকি করতে হোত, ব্যয় করতে হোত অর্থ আর মূল্যবান সময়। তাছাড়া তাঁর উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা, তাঁর যাত্রাপথের সঙ্গীদের সেবা দেওয়া-নেওয়ার পিছনে যে খরচা হোত, তা চিন্তা করলেই অনুমিত হবে ঐ ছ'পয়সার খরচের হিসাব।

ভারতবর্ষে ব্রহ্মচর্যের পূর্ণতার জীবন্ত প্রতীক বলে মনে করা হয় গান্ধীজীকে। ব্রহ্মচর্যের জন্য গান্ধীজীর যতো প্রশংসাই করা হোক, বিশাল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠতম নেতার পক্ষে ব্রহ্মচর্য নিয়ে এত সাধনা, অনুশীলন ও প্রচারের প্রয়োজন ছিল কিনা, এ প্রশ্ন ভক্তদের কাছে না হলেও নিরপেক্ষ এবং বিপক্ষদের কাছে বিতর্কিত বলে চিহ্নিত।

ব্রহ্মচর্যের বাস্তবতা ও সার্বজনীন সুফলের কথা যদি মেনেই নেওয়া হয়, তাহলে চরিত্র ও মনুষ্যত্ব তৈরি করতে ঐ ওষুধটি সাধারণ মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য কিনা, এও এক প্রশ্ন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হোল, গান্ধীজী একজন সাধারণ মানুষ নন বরং অসাধারণ ব্যক্তি। তিনিও কি ঐ ব্রহ্মচর্য পালনে সার্থক হয়েছিলেন বা তিনি কি তাতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন? এ যে বিরাট বিস্ময়কর বিতর্কিত ব্যাপার। এর মীমাংসা ও সমাধানে স্বয়ং গান্ধী কি বলেছেন, নজর দিয়ে দেখা যাক সে দিকেই।

তিনি বলেছেন, "এই ব্রহ্মচর্য পালন অত্যন্ত কঠিন। প্রায় অসম্ভবও বলা যাইতে পারে।"

এই ব্রহ্মচর্যের তত্ত্ব গান্ধী পেলেন কোথা থেকে? এই তত্ত্ব তিনি পেয়েছিলেন গীতা থেকে। ধর্ম নিয়ে যাঁদের মাথা ঘামাবার সময় নেই তাঁরা অনুমানে ধরে নেন যে, বাইবেল, কোরআন, গ্রন্থসাহিব ও জেন্দআবেস্তার মতো গীতাও একটি ঈশ্বর প্রেরিত ধর্মগ্রন্থই হবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় তো বটেই, আধাশিক্ষিত মানুষেরা অনেকে বিশ্বাস করেন যে রামায়ণ মহাভারত মানুষের তৈরি বা সৃষ্টি করা মহাকাব্য উপন্যাস মাত্র। কিন্তু গীতা যে মহাভারতেরই একটি ছোট অংশ এটুকু জানা আছে ক' জনের? গীতাভক্ত গান্ধীজী স্বয়ং বলেছেন, "গীতা মহাভারতের মধ্যে একটি ছোট অংশ।

গান্ধীজীর তৃতীয় পুত্র রামদাস

মহাভারতকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া ধরা হয় কিন্তু আমার কাছে মহাভারত ও রামায়ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয়, ইহারা ধর্মগ্রন্থ। ... গীতার নিকট হইতে আমার জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া লইব। এমনি করিয়া যদি প্রতিদিন গীতা মনন করি তবে তাহা হইতে নিত্য নূতন আনন্দ পাওয়া যাইবে, নিত্য নতুন অর্থ পাওয়া যাইবে। ধর্ম ও জীবন সম্বন্ধে এমন কোন জটিল প্রশ্ন নাই, যাহার সমাধান গীতা করিতে পারে না।" [দ্রঃ রচনা, চতুর্থ, পৃ. ৬৪]

পূর্বেই গান্ধীপ্রদত্ত রামনামের কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ঠিকমতো ব্রহ্মচর্য পালনকারী কুচিন্তা হতে মুক্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কোন রোগই হতে পারে না। কারও কাছে একথাটি মূল্যবান হলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও আধুনিক চিকিৎসা প্রেমীদের হয়তো তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। পক্ষ-বিপক্ষ-নিরপেক্ষ সকলকে একটা কথা স্বীকার করতে হবে যে গান্ধীজী যেটা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করতেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা স্পষ্ট করে বলার সাহস অর্জন করেছিলেন তিনি। কিন্তু কিছু কিছু মূল বিষয় আদৌ প্রকাশ করে যাননি, আর যেটুকু প্রকাশ করেছেন তা সাধারণের বোধগম্য নয়।

ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেছেন, "বিষয়ভোগ মাত্রই নিরোধ করার নাম ব্রহ্মচর্য। যে ব্যক্তি অন্য সকল ইন্দ্রিয়কে যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিতে দিয়া একটা মাত্র ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করার চেষ্টা করে সে যে নিষ্ফল প্রযত্ন করে এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? কান

দ্বারা বিকারযুক্ত কথা শুনিবে, চক্ষুদ্বারা বিকার উৎপাদনকারী বস্তু দেখিবে, জিহ্বা দ্বারা বিকারোত্তেজক বস্তুর স্বাদ লইবে, হস্তদ্বারা বিকারোত্তেজক বস্তু স্পর্শ করিবে, আবার জননেন্দ্রিয়কেও বশে রাখার আশা করিবে এ যেন ঠিক আগুনে হাতটা ঢুকাইয়া দিয়া তারপর না পোড়াইবার চেষ্টা করা। যদি আমরা সমস্ত ইন্দ্রিয় একসঙ্গে বশ করার অভ্যাস করি ... তাহা হইলেই জননেন্দ্রিয় বশে আনার চেষ্টা শীঘ্র সফল হইতে পারে, সফল হইয়া থাকে।" [দ্রষ্টব্য রচনা, চতুর্থ, পৃ. ১০]

গান্ধীজী ব্রহ্মচর্যে সফল হয়েছিলেন বা তিনি নিজের ইন্দ্রিয়কে দমন করতে পেরেছিলেন— আমরা ভক্তিতে একথা মেনে নিলেও তিনি নিজে কিন্তু স্বীকার করেন নি তা। তাঁর ভিতরে অবৈধ কুচিন্তা যে বেঁচে ছিল সেই সত্য স্বীকার করে তিনি বলেছেন, "কুচিন্তা আমার আহত হইয়াছে, নিহত হয় নাই। গত দশ বছরে আমি প্লুরেসি, আমাশয়, এপেণ্ডিসাইটিস ইত্যাদি রোগে ভুগিয়াছি। চিন্তা যদি আমার পূর্ববশে থাকিত তবে এসব রোগ আমার হইত না।" [ঐ, পৃ. ৩০৮]

ঐ পৃষ্ঠার টীকায় লেখা হয়েছে, "পূর্ণতার আমি সাধক। পূর্ণতালাভের পথ যে কী তাও আমি জানি। কিন্তু পথ জানা ও গন্তব্যে পৌঁছানো এক নয়। যদি পাপরহিত হইতাম, মনের ব্যাপারেও যদি রিপু সমূহ আমার পূর্ণ বশে থাকিত তবে আমার শরীর একেবারে নীরোগ হইত। ... আমার মনে হয় চিন্তার তথা মনের দুর্বলতার কারণে আমার এপেণ্ডিসাইটিস হইয়াছিল। অস্ত্রোপচারে আমি রাজী হই।"

গান্ধীজীর কথা সত্য বলে মেনে নিলে নিবিড় নারীসঙ্গ থেকে গান্ধীজীরও দূরে থাকা অবশ্যই দরকার। কিন্তু তাঁর জীবনী পড়ে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শুরু করে ভারতে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নারীসঙ্গ গান্ধীজীর জীবনে জড়িয়ে গিয়েছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কুমারী ওয়েস্ট মেমসাহেবের সঙ্গে মেলামেশার কথা উল্লেখ করে তিনি নিজেই তাঁর কথা লিখেছেন— "কুমারী ওয়েস্টের বয়স ৩৫ বৎসর, এখনো বিবাহ করেন নাই এবং অতিশয় পবিত্র জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার দ্বারাও কম সেবা হয় নাই।" [দ্রঃ রচনা দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭৫]

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তিনি ছিলেন আফ্রিকার ট্রান্সভালের কোন এক সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। তাছাড়া তিনি কেপ ইউনিভার্সিটির এক উল্লেখযোগ্য ছাত্রী ছিলেন। ঐ ইউনিভার্সিটির ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় দ্রুতলিখনে তিনি ফার্স্টক্লাস পেয়েছিলেন। [দ্রষ্টব্য রচনা, ২য়, পৃ. ১৭৭-১৭৯]

এইরকম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিদেশি কুমারীদের সঙ্গ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ কিছু না ভাবলেও আধুনিক গবেষকদের অনেকের মতে এঁরা হতে পারেন বৃটিশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিয়োগ করা গুপ্তচর।

আর এক কুমারী মেমসাহেবের নাম বলা যায়, তিনি হচ্ছেন সোঞ্জা শ্লেসিন। তাঁর প্রশংসা করেত গিয়ে তিনি তাঁর রাজনৈতিক গুরু গোখলের মন্তব্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন ভদ্রমহিলার গুণশীলতার কথা।

গান্ধীজীর কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাস

গোখলে গান্ধীজীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "কুমারী শ্লেসিনের ন্যায় এমন পবিত্র, কার্যের প্রতি এমন একনিষ্ঠ, অনুরক্ত এবং এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আমি কদাচিৎ দেখিয়াছি। তিনি কোনও পুরস্কারের প্রত্যাশা না করিয়া ভারতীয়দের স্বার্থে তাঁহার সর্বস্ব যেভাবে অর্পণ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইয়াছি। এতদুপরি তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ও কার্যকুশলতার কথা ভাবিলে তাঁহাকে তোমাদের এই আন্দোলনের এক অমূল্য সম্পদ বলিয়া ধরিতে হয়। আমার একথা বলাই বাহুল্য, তবুও বলিতেছি যে তুমি তাঁহার পালন পোষণ করিবে।" গান্ধীজী তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, "তাহার পর শ্রীযুক্ত কলেনবেক কুমারী শ্লেসিনকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তিনি বলেন, এই বালিকার মা ইহাকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। এ খুব বুদ্ধিমতী ও সৎ, কিন্তু বড় দুষ্টু ও উদ্দাম প্রকৃতির— হয়তো বা কিছুটা উদ্ধতও হইবে। দেখুন যদি ইহাকে দিয়া আপনার কাজ চলে। কেবল বেতনের জন্য আমি ইহাকে আপনার কাছে দিতেছি না। একজন ভাল টাইপিস্টকে আমি মসিক কুড়ি পাউণ্ড করিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু কুমারী শ্লেসিনের কর্মকুশলতা সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। শ্রীযুক্ত কলেনবেক বলিলেন যে, তাঁহাকে প্রথম প্রথম মাসিক ছয় পাউণ্ড করিয়া দিতে হইবে। আমি ইহাতে স্বীকৃত হইলাম। কুমারী শ্লেসিনের ভিতরে যে দুষ্টামি ছিল শীঘ্র তাহার পরিচয় তিনি দিলেন। কিন্তু একমাসের মধ্যেই তিনি আমার হৃদয় জয় করিয়া ফেলিলেন। দিন রাত্রে সকল সময়েই তিনি কাজের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার পক্ষে কোনও কাজই শক্ত ও অসম্ভব ছিলনা। তাঁহার বয়স তখন মোটে ষোল বছর। ... শীঘ্রই এই বালিকা কেবল আমার দফতরের ভিতরই নহে, সমগ্র সত্যাগ্রহ সংগ্রামেরও নৈতিকতার রক্ষয়িত্রী ও প্রতিপালিকা হইয়া পড়িলেন। ... আমরা সকলে জেলে গেলে শ্রীযুক্ত ডোক 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'-এর (সংবাদপত্র) ভার লইলেন। কিন্তু তাঁহার মতো শুভ্র কেশ ও বহুদর্শী ব্যক্তিও 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে'র জন্য যাহা লিখিতেন তাহা এই

বালিকাকে দেখাইয়া অনুমোদন করাইয়া লইতেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'কুমারী শ্লেসিন না থাকিলে তিনি নিজেকেই নিজের কার্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না। তিনি যে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহার মূল্যায়ন করা দুরূহ। অনেক সময়েই আমার রচনায় তিনি যে সকল পরিবর্তন ও সংযোজন করিয়াছেন উপযুক্ত বিবেচনায় সেগুলি আমি গ্রহণ করিয়াছি'।"

গান্ধীজী ঐ বালিকার (?) জন্য আরও লিখেছেন, "তাঁহার কতকগুলি অভাবের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আমি মাসিক দশ পাউণ্ড করিয়া দিতে আরম্ভ করি। দ্বিধার সহিত তিনি ইহা গ্রহণ করিলেও ইহার অতিরিক্ত লইতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।" ঐ বালিকা বলেছিলেন, "ইহার অতিরিক্ত আমার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু লইলে, যে আদর্শের টানে আপনার নিকট আসিয়াছি তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।" গান্ধীজী এই পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, "এই জবাব পাইয়া আমি চুপ করিয়া গেলাম।"

আর এক বিলেতি কুমারী মেমসাহেব, যাঁর বাড়ি ছিল স্কটল্যাণ্ড, তাঁর নাম মিস ডিক। গান্ধীজী স্বয়ং এই বলে বর্ণনা দিয়েছেন যে, "কুমারী ডিক নাম্নী এক স্কচদেশীয় বালিকা আমার টাইপিস্টের কাজ করিত। তিনি বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। আমার জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছি, কিন্তু তেমনি অনেক উদার চরিত্র ইওরোপীয় ও ভারতবাসীকে সঙ্গীরূপে পাওয়ার সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছি। কুমারী ডিকের বিবাহ হওয়ায় তিনি আমার কাজ ছাড়িয়া দিয়া যান।" [রচনা, ২য়, পৃ. ১৭৭] এখানে ভুলে যাওয়া চলবেনা যে, ইউরোপীয়দের মধ্যে তখন বালিকা বিবাহের প্রচলন ছিল না। সুতরাং গান্ধীজীর সান্নিধ্য সময়ে তিনি বালিকা বা কিশোরী নন বরং যুবতীই ছিলেন বলা যায়।

গান্ধীজী লিখেছেন, "এমন অনেক গোরার নাম আমি দিতে পারি। তবে এক্ষণে আমি মাত্র তিন জন মহিলার কথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। ইঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন লর্ড হব হাউসের কন্যা কুমারী হব হাউস।... অপর মহিলার নাম কুমারী অলিভ্ শ্রাইনার। তাঁহার কথা পূর্বেই এক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত শ্রাইনার পরিবারের বিদুষী কন্যা।... তৃতীয় মহিলা কুমারী মোলটিনো। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার পুরাতন মোলটিনো বংশোদ্ভবা বয়স্থা নারী ছিলেন। তিনিও যথাশক্তি ভারতীয়দের সাহায্য করেন। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, শ্বেতাঙ্গদের এতসব সাহায্যের ফল কি হইয়াছিল?"

গান্ধীজী এই প্রশ্নের উত্তরটি বিশেষ কারণে এড়িয়ে যেতে লিখেছেন—" তাঁহাদের সহানুভূতির প্রত্যক্ষ বর্ণনা করিবার জন্য এই অধ্যায় লিখিত হয় নাই। [দ্রঃ ঐ, পৃ. ১৮০-৮১]

পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে এসে বলা যায় যে, ভারতবর্ষে নেতৃত্ব দেওয়ার সময়েও গান্ধী নারীসঙ্গ হতে দূরে থাকতে পারেন নি বা চান নি। যেখানে সারা ভারতবাসী এবং পৃথিবীর মানুষ তাকিয়ে আছেন গান্ধীজী তথা কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রত্যেকটি পদক্ষেপের প্রতি, যেখানে ঝানু রাজনীতিবিদ্ বিশ্বের অন্যতম এক সেরা ব্যারিস্টার জিন্না পাকিস্তান সৃষ্টিতে চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর চরম সাধনা, ঠিক সেই সময় গান্ধীজী যদি নারী নিয়ে ব্রহ্মচর্যের পরীক্ষা শুরু করেন, আর তার ফাঁকে ফাঁকে কংগ্রেসকে নেতৃত্ব ও পরামর্শ দিতে থাকেন, তাহলে তা অত্যন্ত পরিতাপের।

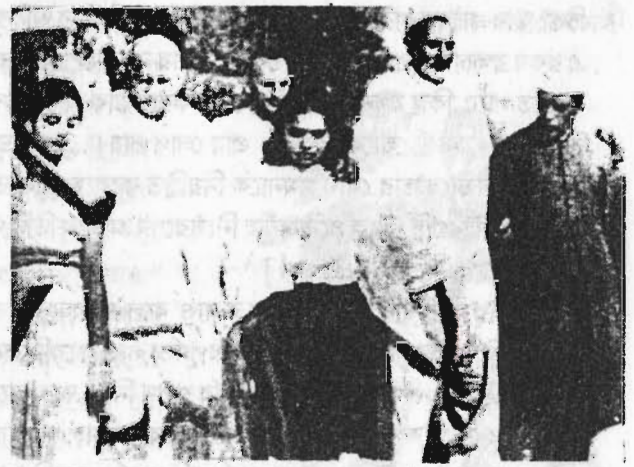

মহাত্মা গান্ধী ও নেতৃবৃন্দ

নারীসঙ্গ, নারী সাধনা বা ব্রহ্মচর্যের পরীক্ষার কথায় মানুষ যাতে চমকে না ওঠেন সেজন্য হয়তো বা ধর্মের মোড়কে মুড়িয়ে যে কথাগুলো তিনি লিখেছেন তাও বিস্ময়কর। তিনি লিখেছেন, "ভাগবতে আমরা পড়িয়াছি যে, শুকদেব যখন নগ্ন অবস্থায় স্নান নিরতা স্ত্রীলোকদিগের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র চঞ্চলতার সৃষ্টি হয় নাই এবং সেই স্ত্রী লোকেরাও বিচলিত হয় নাই অথবা লজ্জাবোধ করে নাই।" [রচনা, দ্বিতীয়, পৃ. ১৪]

গান্ধীজী স্বয়ং শুকদেবের ভূমিকা নিতে চেয়েছিলেন কি না আর সেই সঙ্গে তাঁর পরীক্ষাগারের কিশোরী ও যুবতীদেরকে 'চঞ্চলতা', 'লজ্জাবোধ' এবং 'বিচলিত' না হওয়ার প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন কি না তাও খানিকটা ভাববার বিষয়। তিনি লিখেছেন, "কিন্তু ব্রহ্মচর্য বলতে সাধারণতঃ বোঝায় যৌন অঙ্গগুলির সংযম এবং যৌনকামনা ও যৌনাঙ্গ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বীর্যপাত প্রতিরোধ। যে সব দিক দিয়ে আত্মসংযম করে তার পক্ষেই এটা স্বাভাবিক।... কিন্তু যতদিন যৌনকামনা থাকবে ততোদিন ব্রহ্মচর্য লাভ হয়েছে বলা যায়না।... ব্রহ্মচর্যের সরাসরি পরিণতি বীর্যস্খলন বন্ধ। কিন্তু এই সব নয়।

পুরোপুরি ব্রহ্মচারী যে তারমধ্যে বেশকিছু লক্ষ্যনীয়ও রয়েছে। তার কথাবার্তা, তার চিন্তা, তার কাজের ধারা সবকিছুই, সে যে জীবন্ত সর্বশক্তির অধিকারী তা প্রকাশ করেছে। এ রকম ব্রহ্মচারী স্ত্রীলোকের কাছ থেকে পালায় না, স্ত্রীলোকের সঙ্গর জন্য সে লালায়িত না হতে পারে, কিন্তু যখন প্রয়োজনীয় সেবা করার ডাক আসে, সে তা এড়িয়েও যায় না। তার কাছে পুরুষ-স্ত্রীলোকের পার্থক্য প্রায় লোপ পায়। ... অন্য ভাষায় বলা যায়, এরকম লোক এমনভাবে তার যৌনকামনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন যে, তার যৌনাঙ্গ ঋজু হয়ে ওঠে না। যৌনগ্রন্থি থেকে প্রয়োজনীয় নিঃসরণের অভাবে তিনি পুরুষত্বহীন হয়ে পড়েন না।" [দ্রঃ রচনা, তৃতীয়, পৃ. ৮৭]

এই সব কথা যদি তিনি নিজের জন্যও বলে থাকেন তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে গান্ধীজী কি স্বয়ং ব্রহ্মচর্যের সাধনায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলেন? তার উত্তর তিনিই দিয়েছেন, "১৯০৬ সালে আমি ব্রহ্মচর্যের শপথ নিই। অন্যভাবে বলতে গেলে, পুরো ব্রহ্মচারী হওয়ার জন্য আমার প্রয়াস ৩৬ বছর আগে শুরু হয়েছে। ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে আমার যে সংজ্ঞা সেইমত পূর্ণ ব্রহ্মচর্য আমি অর্জন করেছি তা বলতে পারিনা; তবে আমার মতে সেদিকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে গিয়েছি। ভগবান যদি ইচ্ছা করেন এই জীবনেই এমনকি পূর্ণতাও লাভ করতে পারি।" [দ্রঃ পূর্বোক্ত]

এ সম্পর্কে তিনি আরও লিখেছেন, "এই সব দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য আমাকে যৌনজীবনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে এবং স্বদেশবাসী হোক অথবা ইউরোপীয়, সবার সঙ্গে সম্বন্ধের ক্ষেত্রে আমাকে অহিংসা ও সত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ আচরণ করতে হয়েছে। নিজেকে আমি গড়পড়তা (সাধারণ) মানুষ চেয়ে বড় বলে মনে করি না।" [ঐ, ২য়, পৃ. ৫০৪]

অহিংসা ব্রহ্মচর্য দুটোই ওতপ্রোতভাবে জড়ানো। বাস্তব সত্য যেটা সেটা হোল, দুটোতেই যে তিনি সম্পূর্ণভাবে সফল হন নি তাঁর লেখাতেই তা প্রমাণিত। এ বিষয়ে তিনি পূর্ণতা লাভ করেছিলেন কিনা সে প্রশ্ন করলে, উত্তরে তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, "প্রশ্নগুলি নিঃসন্দেহে তাত্ত্বিক। তাছাড়া প্রশ্নগুলি করাও হয়েছে অসময়ে।" কিন্তু সত্য স্বীকার করেই বলে ফেললেন, "কারণ অহিংসার সমস্ত কলাকৌশল আমি এখনো আয়ত্ত করতে পারিনি। এর পরীক্ষা নিরীক্ষা এখনো চলছে।" [দ্রঃ রচনা, দ্বিতীয়, পৃ. ৫১০]

গান্ধীজী নিজের যৌনজীবন নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। গান্ধীজীর সেক্রেটারী পিয়ারীলাল তাঁর স্মৃতিকথায় এ সম্পর্কে বিশদ উল্লেখ করেছেন। পণ্ডিত নেহরুর সেক্রেটারী এম.ও. মাথাইও নিজের স্মৃতিকথা Reminiscenees of the Nehru Age-এ এই বিষয়টি বিবৃত করেছেন এইভাবে : 'Freedom at Midnight' গ্রন্থে নোয়াখালিতে মনুর সঙ্গে গান্ধীজীর সম্পর্কের ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে। এটা স্পষ্ট,

সত্যের সঙ্গে গান্ধীর পরীক্ষা নিরীক্ষার এই ব্যাপারটি যে তারও অনেক আগে শুরু হয়েছিল— লেখকদ্বয় তা জানতেন না। তাঁর স্ত্রী কস্তুরবার জীবদ্দশাতেই এর শুরু। গান্ধীজীর সঙ্গী সমস্ত মহিলারাই (অর্থাৎ যাঁরা সহকর্মিনী হিসাবে তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন) এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রাজকুমারী অমৃত কাউরও ছিলেন এদের মধ্যে একজন। তিনি পরে আমার সঙ্গে ব্যাপারটি সম্বন্ধে অবাধ ও খোলাখুলি আলোচনা করেন। গান্ধীজী রাজকুমারী অমৃত কাউরের নিকট স্বীকার করেছিলেন যে, পরীক্ষারত অবস্থায় একাধিকবার তাঁর মনে খারাপ চিন্তার উদয় হয়েছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গ্রন্থে [Colonialism, Tradition and Reform : An Analysis of Gandhi's Political Discourse, Sage Publications, New Delhi - 110048] গান্ধীজীর যৌন পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন শ্রী ভিখু পারেখ। শ্রী পারেখ Hull University -র পলিটিক্যাল থিওরীর অধ্যাপক। তিনি ব্রিটেনের Commission for Racial Equality-র ডেপুটি চেয়ারম্যান। শ্রী ভিখু পারেখ বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদও অলংকৃত করেছিলেন। তিনি দর্শনের উপর বেশ কয়েকটি উচ্চ প্রশংসিত বই-এরও লেখক।

গান্ধীজী এবং রাজকুমারী অমৃত কাউর

গান্ধীজী যৌনতা ও ব্রহ্মচর্যের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে নারীদের সঙ্গে নগ্ন অবস্থায় শুতে আরম্ভ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর আত্মীয়া ঊনিশ বছরের মনু ও আভা, তাঁর চিকিৎসক সুশীলা নায়ার এবং লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের স্ত্রী প্রভাবতী নারায়ণ প্রমুখ মহিলা সমাজকর্মী। শ্রী ভিখু পারেখের পুস্তক থেকে একটি অংশ নিচে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

"গান্ধীজী ১৯০১ সালে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন যে, তিনি সমস্ত প্রকার যৌনাচার থেকে বিরত থাকবেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর স্ত্রীর মতামত নেওয়া কিংবা পরামর্শ করার

প্রয়োজন বোধ করেন নি।... এ সময় গান্ধীজীর বয়স ছিল ৩৭ বৎসর এবং তিনি তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর প্রথম সত্যাগ্রহ শুরু করতে যাচ্ছেন। ব্রহ্মচর্য পালনে নেমে গান্ধীজী উপলব্ধি করলেন কাজটি তাঁর জন্য মোটেই সহজ নয়। ... ব্রহ্মচর্যের শপথ নিলেও গান্ধীজী তাঁর স্ত্রীর পাশেই শয়ন করতেন।... পরীক্ষার পর তাঁর বিশ্বাস জন্মে যে, খাদ্যাভ্যাস ও যৌনতার মধ্যে এক প্রত্যক্ষ ও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।... যেহেতু গান্ধী তাঁর দৈহিক আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, তিনি তাঁর নারী সহযোগিনীদের সাথে নিবিড় দৈহিক স্পর্শ বজায় রাখেন। অনেক ভারতীয়ই এটা অপছন্দ করতেন— বিশেষ করে তাঁর মহিলাদের কাঁধে হাত রাখার অভ্যাসটি। বেশ কয়েকজন লোক ব্যক্তিগত আলোচনায় এবং প্রকাশ্যেও ব্যাপারটি তাঁর নিকট তুলেছিলেন। এই সব সমালোচনার প্রত্যুত্তরে ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বরে গান্ধীজী 'জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য' তাঁর ঐ অভ্যাস পরিত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পর সেবাগাঁওতে তিনি তা ভঙ্গ করেন। গান্ধীজী যুক্তি দেখান যে, নারীস্পর্শ পরিহার করে চলার প্রতিজ্ঞার মধ্যে তাঁর স্ত্রী, সুশীলা নায়ার, মনু এবং অন্য কিছু মেয়ে যাঁরা তাঁর কাছে কন্যার মতো— তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। ... রোগমুক্ত হবার জন্য যখন বোম্বেতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তিনি তখন প্রবল এক যৌনবাসনা অনুভব করেন। ... ১৯৩৮ সালের ১৪ই এপ্রিল তিনি এক 'বদস্বপ্ন' দেখেন যাতে ছিল এক নারীর সঙ্গে দেখা করার আকাঙ্খা এবং স্বপ্নেই তাঁর শুক্রপাত ঘটে যায়। স্পষ্টতই তিনি এতে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না তাঁর কোন্ ভুলে এসব হচ্ছে ? তিনি তাঁর আত্মবিশ্বাস পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেন, তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্মের ক্ষতি হতে আরম্ভ করে। দুরূহ ও দীর্ঘ দর কষাকষিমূলক আলোচনায় জিন্নার সঙ্গে তাঁর মিলিত হওয়ার কথা, কিন্তু তিনি কোন উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। অবশ্য যদিও তিনি জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় বসলেন এবং বিভিন্ন প্রস্তাবাবলী পেশ করলেন, তিনি কিন্তু মোটেই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না। পুরো আলোচনায় অগ্রণী ভূমিকা নেবার দায়িত্ব তিনি নেহরুর উপরই ছেড়ে দিলেন।... মীরা বেন এবং অমৃত কাউর— উভয়েই মেয়েদের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করার জন্য গান্ধীজীকে পরামর্শ দিলেন। কেবলমাত্র মহিলাদের স্পর্শ করা নয়, বরং সেইসঙ্গে সকল ধরণের সান্নিধ্য, কথাবার্তা, দৃষ্টি বিনিময় ও চিঠিপত্র পরিহার করার জন্য তাঁরা জোর দেন।... মীরা বেন তাঁকে বলেন যে, 'এপ্রিলের ঘটনাটি' কোন একবিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, কারণ তিনি ইতিপূর্বে একবার লক্ষ্য করেন যে, গান্ধীজী ঘুমের মধ্যে তাঁর এক মহিলা সহযোগীর গলা জড়িয়ে ধরে রয়েছেন।... তিনি সতর্ক হলেন এবং তাকে চিহ্নিত করে দমন করার জন্য নয়া পদ্ধতি বের করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। কিন্তু কয়েকমাস পরে তিনি আবার যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন এবং তাঁর নারী

সহকর্মিনীদের সাথে ঘনিষ্ঠ শারীরিক সংস্পর্শ বজায় রাখার পুরানো অভ্যাসটিকে পুনরায় চালু করলেন। মহিলা সহকর্মীদের বেশ কয়েকজন অনেক সময় তাঁর পাশেই শয়ন করতো। আর সুশীলা নায়ার তো গান্ধীজীর সঙ্গে 'এক বিছানায় শুতেন' তাঁকে উষ্ণতা দিয়ে গরম রাখার জন্য। সুশীলা তাঁকে ম্যাসাজ করতেন এবং ওষধিযুক্ত জলদ্বারা স্নান করিয়ে দিতেন। এই স্নান প্রায় দেড়ঘন্টা ধরে চলতো। ... গান্ধীজীর জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে প্রথম প্রকাশ্যে মন্তব্য করা হয় Bombay Chronical পত্রিকায় ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে। পত্রিকাটির এলাহাবাদ সংবাদদাতা গান্ধীর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে 'চমকপ্রদ জানকারী' প্রদান করেন। একটি প্রাদেশিক হিন্দু মৌলবাদী পত্রিকা আরও অনেক রসালো গল্প ছাপে। তারা সুশীলা নায়ারের নাম উল্লেখ করে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে 'অধর্ম' ও চরম ইন্দ্রিয়পরায়ণতার অভিযোগ উত্থাপন করে। কিছু আমেরিকান পত্র পত্রিকা যারা আগে Madeleine Slade নাম্নী মহিলার সঙ্গে ১৯৩১ সালে উভয়ের লণ্ডন সফরকালে গান্ধীজীর সঙ্গে 'অবৈধ' সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছিল— তারা আরও খোলাখুলি নানা কেচ্ছাকাহিনী প্রকাশে মেতে ওঠে। গান্ধীজী কিন্তু এসবের ফলে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। ... সমালোচনা অভিযানে মোটেই দমে না গিয়ে গান্ধীজী শুধু যে নারীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংসর্গ বজায় রাখলেন তা নয়, সেই সঙ্গে তিনি নতুন করে এক অস্বাভাবিক আচার শুরু করলেন। বিগত কয়েক বৎসর ধরে তিনি মেয়েদের সঙ্গে একই কামরায় শয়ন করতেন। কিন্তু সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে। সম্প্রতি তিনি তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে 'একসাথে শুতে' আরম্ভ করেছিলেন। এবার তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর এক নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পরবর্তী ধাপ হিসেবে তিনি উলঙ্গ হয়ে তাঁর মহিলা সহকর্মিনীদের সঙ্গে শোবেন। মনে হয় তিনি এটা শুরু করেছিলেন ১৯৪৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি

আভা ও মনুর সঙ্গে গান্ধীজী

তাঁর স্ত্রী মারা যাবার পর। ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে বিড়লাকে লেখা পত্রে তিনি উল্লেখ করেন, 'সেইসব মহিলা বা কিশোরীরা যারা আমার সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে শয়ন করেছিল'— এ থেকে বোঝা যায় বেশ কয়েকজন নারী এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুশীলা নায়ার ছাড়াও প্রভাবতী নারায়ণ (জয়প্রকাশ নারায়ণের স্ত্রী), আভা গান্ধী, মনু গান্ধী এই 'পরীক্ষা-নিরীক্ষায়' অংশ নিয়েছিলেন। লীলাবতী, রাজকুমারী অমৃত কাউর, আনতুসসালাম এবং আরও বেশ কয়েকজন মহিলাও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে মনে হয়।... এ সম্বন্ধে তিনি ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে মুন্নালাল শাহকে এক পত্র লেখেন : 'আমার পরিচয় হল, আমি যা-আমি তাই। সমাজের কল্যাণের কথা তুলে কোন লাভ নেই। আমি চিন্তা করা ছেড়ে দিতে পারিনা। আমি যতদূর সম্ভব একসাথে শোয়ার ব্যাপারটি স্থগিত রেখেছি। কিন্তু অমি এটা একেবারে ছেড়ে দিতে পারবো না। আমি যদি মেয়েদের সঙ্গে একসাথে শোয়ার ব্যপারটা সম্পুর্ণ ছেড়ে দেই, তাহলে আমার ব্রহ্মচর্যকে কলঙ্কিত করা হবে। তাই এ ধরণের বাধা নিষেধ আমার উপর আরোপ করা উচিত নয়।' ...গান্ধীজী ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে তাকে (মনুকে) ডেকে পাঠালেন। মনু ছিলেন গান্ধীজীর grand nice (নাতনি) এবং তিনি গান্ধীজীর স্ত্রীর মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় নিষ্ঠা সহকারে তাঁর ভরপুর সেবা করেছিলেন।... নিজের কাছে আসার জন্য লেখা এক পত্রে গান্ধী মনুকে লেখেন : 'তোমাকে ডেকে পাঠাচ্ছি কিন্তু এর উদ্দেশ্য তোমাকে অসুখী করা নয়। তুমি কি আমাকে ভয় পাও? তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে আমি তোমাকে কখনোই বাধ্য করবনা।' ১৯৪৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর ১৯ বছরের মনুর সঙ্গে গান্ধীর উলঙ্গ হয়ে শোয়ার পরীক্ষণ শুরু হয়। গান্ধীজী স্বয়ং মনুর পিতাকে এ সম্বন্ধে কিছু জানান নি। ... যাইহোক কথা ছড়িয়ে পড়লো এবং গান্ধীজী যাকে 'উড়ো আলাপ, কানাঘুষো, বক্রোক্তি' বলে অভিহিত করতেন। প্রথমে তার প্রবাহ আরম্ভ হোল। শেষ পর্যন্ত তা জনসাধারণের অসন্তোষ ও তীব্র গণ-প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হয়।... তাঁর অনেক অনুসারী বিশেষতঃ বেশ কিছু গুজরাটি সহকর্মী তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন; হরিজন পত্রিকার দুজন সম্পাদক প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করেন, অনেকে তাঁর সঙ্গে 'নন কো অপারেশন' করতে আরম্ভ করেন। সর্দার প্যাটেল খুবই ক্রোধান্বিত হন এবং গান্ধীজীর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দেন। বিনোবাভাবে তাঁকে অসন্তুষ্টি জানিয়ে এক পত্র লেখেন। গান্ধীজীর পুত্র দেবী দাস তাঁকে উত্তেজিত ও তীব্র সমালোচনা মূলক এক পত্র প্রেরণ করেন। তাঁর একান্ত অনুগত স্টেনোগ্রাফার পরশুরাম তাঁর কাছে চাকরি করা ছেড়ে দেন।... পন্ডিত নেহেরুও বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর অন্য বেশ কিছু সংখ্যক ভক্ত এ ব্যাপারে সন্তোষজনক কৈফিয়েত দাবী করে তাঁর সাক্ষাতপ্রার্থী হন।... এত কান্ড সত্ত্বেও গান্ধীজী কিন্তু অনুশোচনার ধারে কাছে গেলেন না। তিনি স্বীকার করেন যে, তাঁর আচরণের

দ্বারা তিনি তাঁর প্রিয় ও কাছের লোকজনদের হারিয়েছেন। কিন্তু তিনি জেদের সঙ্গে বলেন যে, 'যদি সারা দুনিয়াও আমাকে পরিত্যাগ করে তাহলেও আমি যা সত্য বলে মনে করি তা ছাড়তে পারবো না'। তাঁর আচরণ তাঁর অনুসারীদের হতাশ করে। তারা তাঁর সম্বন্ধে বাজে ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করে এবং সংশয়ে পড়ে যে তিনি যথার্থই মহাত্মা কিনা।... তিনি উলঙ্গ হয়ে আশ্রমে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর নিজের তেমন কোন সচেতনতা এ ব্যাপারে ছিলনা, তার মহিলা সহকর্মিনীরাও এতে কোনরকম বিব্রত বোধ করতেন না।"

চলার পথে গান্ধীজী

যাঁরা যাঁরা গান্ধীর বিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা হয়তো হিসেব করে দেখেছিলেন, বৃটিশ বা ইংরেজদের যে নেক নজর গান্ধীজীর উপর আছে এবং সারা বিশ্বে বড় বড় পত্রিকায় যেভাবে গান্ধীজী প্রচারিত হচ্ছেন তাতে গান্ধীজীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তাঁদের উন্নতির মইটাই ভেঙে যাবে। ফলে বেশির ভাগই ফিরে এসে গান্ধীজীর চিন্তাধারাকে সমর্থন করতে লাগলেন— "তাঁরা তাঁর সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে শুধু নয়, তাঁরা প্রকাশ্যেও স্বীকার করেন যে, গান্ধীজীর প্রতি তাঁরা চরম অবিচার করেছিলেন।... থাক্কর বাপা বিষয়টি একান্তে মনুকে বুঝিয়ে বলেন, মনু পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ থেকে বিরত হতে সম্মত হন, এবং গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলেন। গান্ধীজীও মনুর ইচ্ছাকে সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেন।... গান্ধীজী বিনোবাভাবেকে এক পত্রে লেখেন : 'এখন আর মনু আমার সঙ্গে বিছানায় শোয় না, এটা ঘটেছে তারই (মনুর) ইচ্ছা অনুযায়ী আর এর পিছনে কাজ করেছে বাপার এক মর্মন্তুদ চিঠি'। নিজের সমালোচকদের আগাম নোটিস দিয়ে ১৯৪৭ সালের মে মাসে গান্ধীজী তাঁর ঐ আচরণ পুনরায় শুরু করেন। জীবনের অন্তিম দিন আসা অবধি তা জারি ছিল।" [দ্রঃ পৃ. ১৯-২৪, 'কলম' পত্রিকা, ১৯৯২]

যুবতী ও কিশোরীদের কাঁধ ও গলায় হাত রেখে হেঁটে চলার ছবিগুলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে প্রকাশিত ১৯৯৫-এর 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার গান্ধী সংখ্যার ১৭ ও ১৫৭ পৃষ্ঠা এবং উক্ত 'কলম' পত্রিকার ২২ ও ২৩ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।

গান্ধীজীর জীবনের বিভিন্ন সময়ের ছবিগুলো ঐ 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার ৪৮, ১০৯, ১২৭, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৭ ও ১৩৯ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত।

আর একটা প্রশ্ন আসতেই পারে যে, বন্ধচর্য আর অহিংসার শ্রেষ্ঠতম নেতা বলে যদি তাঁকে ধরেই নেওয়া যায়, তাহলে তার অনুসরণকারী সত্যাগ্রহী ভক্তদের আধ্যাত্মিক বা চারিত্রিক উন্নতি হয়েছিল কতখানি? তখন এমন একটা সময় ছিল যে, তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। তাঁর বা তাঁদের জীবনের কালো রং দেখতে পেলেও স্পষ্টভাবে তা প্রকাশ করার স্পর্ধা ছিলনা অনেকেরই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগ্নী শ্রীমতী সরলা দেবী গান্ধীজীকে একটি পত্র লিখে অসাধ্য সাধন করেছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে না। তিনি মনে করেছিলেন যে, গান্ধীজীর সঙ্গীসাথীদের আত্মশুদ্ধি হয়নি মোটেই। সরলা দেবী লিখেছিলেন, "আপনি কি স্বীকার করেন না যে, অস্পৃশ্যতার ন্যায় নারীদের প্রতি আচরণও নিন্দনীয় ব্যাধি স্বরূপ? আমি যে সকল যুবক 'স্বদেশসেবীর' সঙ্গে মিশিয়াছি তাহাদের শতকরা নব্বই জনের মনোভাব পশুর তুল্য। ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলনকারীগণের কয়জন নারীগণকে ভোগের সামগ্রী বলিয়া মনে করে না? আন্দোলনে জয়লাভ করিতে হইলে আত্মশুদ্ধি সর্বাগ্রে প্রয়োজন; নারীদিগের প্রতি মনোভাব পরিবর্তিত না হইলে আত্মশুদ্ধি কি সম্ভবপর?" [দ্রঃ রচনা, ৩য় খন্ড পৃ. ৩২৫]

গান্ধীজী যখন বুঝতে পারলেন যে, ইংল্যান্ড তথা ইওরোপের পন্ডিতেরা বিশ্বজুড়ে প্রচার করতে শুরু করেছেন তাঁর জ্ঞান গুণ আর আধ্যাত্মিকতার কথা, তখন হয়ত তিনিও ভেবে ফেলেছিলেন যে, যীশু মুসা ও হজরত মুহাম্মদ (স.) প্রভৃতি নবী পয়গম্বরেরা নিরাকারের যেমন উপাসক ছিলেন আর তাঁদের উপর আল্লাহ বা গড্-এর বাণী যেমন অবতীর্ণ হোত, তিনিও সেরকম ভেবে বলে ফেললেন—"কারণ চিরকালই আমি নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এসেছি। আমি কেবল বহু দূরাগত অথচ সুস্পষ্ট এক কণ্ঠস্বরের মতো শ্রবণ করেছি। এসব আমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাক্যালাপে রত কোন মনুষ্যের কণ্ঠস্বরের মতোই অভ্রান্ত এবং অপ্রতিরোধ্য। ঐ স্বর শ্রবণকালে আমি স্বপ্নলোকে বিচরণ করছিলাম না। আর ঐ কণ্ঠস্বর শুনবার পূর্বে আমার মধ্যে একটা প্রচন্ড আলোড়ন হচ্ছিল। ... আমি কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে, সমগ্র বিশ্বও যদি একমত হয়ে আমার বিরুদ্ধে রায় দেয় তবুও আমি যে যথার্থই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনেছি, আমার এই বিশ্বাস শিথিল হবে না।" [ঐ, চতুর্থ খন্ড, পৃ. ৪২৩]

ঈশ্বরের 'ওহি' বা প্রত্যাদেশ তাঁর কাছে আসতো এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলে ফেললেন, "আমার পক্ষে সেই কণ্ঠস্বর আমার অস্তিত্বের চেয়েও বেশি বাস্তব। এ কণ্ঠ আমাকে অথবা কাউকে কোনদিন প্রতারিত করেনি।" [ঐ, পৃ. ৪২৪]

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে বেদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের জন্মকাহিনী আর সেগুলোর সারা বিশ্বজুড়ে প্রচার ভারতবাসীর উপর তার প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল। গান্ধীজী বিলেতে যখন পড়তে গিয়েছিলেন, সত্যি কথা বলতে কি, তিনি অত্যন্ত আধুনিক মানসিকতা নিয়েই গিয়েছিলেন। তা না হলে প্যান্ট শার্ট টাই পরে বেহালাবাদন এবং মেমসাহেবদের সঙ্গে বলডান্সে যোগ দেওয়া সম্ভব হোতনা তাঁর পক্ষে। তাহলে কি সাহেবদের বাছাইকরা ব্যক্তি গান্ধীজীকে সেখানেই দেওয়া হয়েছিল বেদ বেদান্ত গীতা আর রামায়ণের তালিম? তাঁর জীবনী থেকে যা পাওয়া যায় তাতে কী প্রমাণিত হয়? তাঁর জীবনীর চতুর্থ খন্ডে তিনি লিখেছিলেন, "বিলাতে ছাত্রজীবনের দ্বিতীয় বর্ষের শেষের দিকে আমার সঙ্গে দুজন থিয়সফিস্টের পরিচয় হয়। এঁরা ছিলেন দুই ভাই এবং উভয়েই অকৃতদার। তাঁরা আমাকে গীতার কথা বললেন। তাঁরা তখন স্যার এডুইন আর্নল্ডকৃত গীতার অনুবাদ 'দি সঙ সেলেসসিয়াল' পড়ছিলেন। আমাকে তাঁদের সঙ্গে এর মূল পড়ার জন্য তাঁরা আমন্ত্রণ জানালেন। ... আমি তাঁদের কাছে সসঙ্কোচে নিবেদন করলাম যে, যদিও আমি তখনো পর্যন্ত গীতা পড়িনি, তবু তাঁদের সঙ্গে গীতা পাঠ করতে সানন্দে সম্মত আছি এবং এও বললাম যে, সংস্কৃতে আমার জ্ঞান অগভীর হওয়া সত্ত্বেও অনুবাদে কোথাও যদি যথাযথভাবে ভাবপ্রকাশ না হয়ে থাকে তাহলে আমি চেষ্টা করে মূল থেকে সঠিক অর্থ বার করতে পারব। ... তখনই গীতাকে আমার অমূল্য সম্পদ বলে মনে হোল। আর এই ধারণা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে পেতে আজ আমার মনের অবস্থা এই যে, গীতাকে আমি সত্যোপলব্ধির শ্রেষ্টতম গ্রন্থরূপে বিবেচনা করি।" [পৃ. ৩৮৫-৮৬]

"পূর্বোক্ত ভদ্রলোকদ্বয় আমাকে স্যার এডুইন আর্নল্ডকৃত 'দি লাইট অফ এসিয়া' পড়ার পরামর্শ দিলেন। ... ওঁদেরই আগ্রহে আমি মাদাম ব্লাভটস্কির 'কি টু থিওসফি'ও পড়ি। এই পুস্তকটি পাঠ করার পর আমার মনে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে আরও অধ্যয়ন করার আকাঙ্খা জাগ্রত হয় ও আমার মন থেকে দেশের খৃষ্টান পাদ্রীদের দ্বারা সৃষ্ট সেই ধারণা অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, বিদূরিত হয়।" [দ্রষ্টব্য : রচনা, চতুর্থ খন্ড, পৃ. ৩৮৬]

ম্যাঞ্চেস্টার থেকে আগত একজন খৃষ্টান পন্ডিত গান্ধীজীর উপর প্রভাব ফেলেন। তিনি তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন, "আমার সঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে আগত জনৈক সৎ খৃষ্টানের পরিচয় হয়। তিনি আমার সঙ্গে খৃষ্টীয় ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। ... তিনি বললেন, 'আমি নিরামিষাশী এবং মদ্যপান করি না। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নাই যে

অনেক খৃষ্টানই মাংসাহারী ও মদ্যপ। কিন্তু তা বলে আমাদের ধর্মগ্রন্থ এর কোনটিরই সমর্থন করে না। আপনি বাইবেল পড়ে দেখুন।' আমি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলাম এবং তিনি আমাকে একখন্ড বাইবেল এনে দিলেন। বাইবেলের বুক অফ জেনেসিস আমি পড়ে ফেললাম। ... কিন্তু নিউ টেস্টামেন্ট পড়ার সময় এক ভিন্নপ্রকারের অভিজ্ঞতা লাভ করলাম এবং বিশেষ করে 'সারমন অন দি মাউন্ট' তো সোজা গিয়ে আমার হৃদয়ে গেঁথে গেল। আমি গীতার সঙ্গে এর তুলনা করলাম। সারমন অন দি মাউন্টে আছে, 'আমি তোমাকে বলছি যে, তুমি অন্যায়েরও প্রতিরোধ করবে না; যে তোমার দক্ষিণ গন্ডে চপেটাঘাত করবে, তার দিকে বাম গন্ড এগিয়ে দেবে। আর কেউ যদি তোমার জামাটি নিয়ে যায়, তাহলে তাকে কোটটিও দিয়ে দেবে'।" [ঐ, পৃ. ৩৮৭]

গান্ধীজী যাতে কমিউনিস্ট মতবাদে জড়িয়ে না পড়েন সে বিষয়েও প্রশিক্ষণ দিতে তাঁকে কিছু বই পড়ানো হয়েছিল। তিনি নাস্তিক্যবাদের জন্য লিখেছেন, "এ বিষয়ে আমি কয়েকটি বই পড়েছিলাম, কিন্তু সেগুলির নাম এখন ভুলে গেছি। তবে আমার মনে সে সবের কোন প্রভাব হয়নি। কারণ ইতিপূর্বেই আমি নাস্তিক্যবাদের সাহারা মরু অতিক্রম করে ফেলেছি।" [ঐ, পৃ. ৩৮৭]

মণিমুক্তো হীরা জহরতের বড় ব্যবসাদার ছিলেন রায়চাঁদ ভাই। তাঁকে দিয়ে গান্ধীজীকে আধ্যাত্মিকতার তালিম দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর জন্য লিখেছেন, "তখন আমি একজন পসারহীন ব্যারিস্টার; কিন্তু তবু যখনই দেখা হয়েছে তিনি আমার সঙ্গে গুরুতর আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা করার জন্য সময় দিয়েছেন।... তবু তাঁর কথাবার্তা আমার অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হোত। তারপর বহু ধর্মীয় পুরুষ ও সাধু সন্তের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে, অনেক ধর্মগুরুর সঙ্গেও দেখা করেছি। কিন্তু এরা কেউই আমার মনে রায়চাঁদ ভাইয়ের মত প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন নি। তাঁর কথা যেন একেবারে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করতো। ...আধুনিক জগতে তিনজন সমসাময়িক ব্যক্তি ও তাঁদের রচনা আমার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এঁরা হচ্ছেন রায়চাঁদ ভাইয়ের সাক্ষাত সংস্পর্শ, 'দি কিংডম অফ গড ইজ উইদিন ইউ' নামক পুস্তক দ্বারা টলস্টয়, এবং 'আনটু দিস লাস্ট'-এর রচয়িতা রাসকিন।" [ঐ, পৃ. ৩৮৮]

বিলেতে পাশ করা একজন ব্যারিস্টারের সাধারণতঃ উদ্দেশ্য থাকে ব্যারিস্টারি, লক্ষ্য থাকে আইন ব্যবসায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু গান্ধীজীর ব্যাপারটা মনে হচ্ছে যেন পুরো উল্টো। আসল ব্যবসা বাদ দিয়ে তাঁর এইসব প্রশিক্ষণের পিছনে সাহেব ও সাহেবদের পৃষ্ঠপোষক ব্যবসাদারদের অবদান চাপা দেওয়া মুশকিল।

গান্ধীজী প্রচন্ড বুদ্ধিমান অথবা প্রচন্ড অন্যকিছু ছিলেন কিনা এই বিতর্কে যেতে চাচ্ছি না। কিন্তু কোন জায়গায় তিনি বলেছেন, গোরক্ষা না করলে হিন্দু হওয়া যায় না। তিনিই

আবার তাঁর কথায় ও কাজে বললেন বা দেখালেন গোরক্ষা নিয়ে মাতামাতি করা, বাড়াবাড়ি করা তাঁর মতে ঠিক নয়। গান্ধী রচনা সম্ভারের চতুর্থ খন্ডের ৩৭৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, "যদিও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে হিন্দু ধর্মকে আমি অন্যান্য যাবতীয় ধর্মমতের তুলনায় সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান জ্ঞান করি।" এতে প্রমাণিত হয়, তিনি একনম্বরের সনাতনপন্থী একজন হিন্দু। আবার দেখা যাচ্ছে, ইতিহাসে রাম ও কৃষ্ণ বা পুরনো দেবদেবতার তিনি অনেক প্রশংসা করেছেন, লিখেছেন বা মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "হিন্দুদের দেবতা কৃষ্ণ পুরুষোত্তম। সমালোচকদের কটু সমালোচনার প্রতি তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই। ঈশ্বরকে এইসব নাথের মাধ্যমে ধ্যান করে রাম ও কৃষ্ণের লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাঁদের জীবনকে উন্নত করেছেন।" [রচনা, চতুর্থ খন্ড, পৃ. ৪৮১]

আবার তিনিই বলেছেন, "আমার কৃষ্ণের সঙ্গে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির সম্পর্ক নেই। আত্মাভিমানে আহত হবার জন্য যে কৃষ্ণ নরহত্যা করেন আমি তাঁর কাছে মস্তক নত করব না অথবা যে কৃষ্ণকে অহিন্দুরা একটি ইন্দ্রিয়পরায়ণ যুবক হিসাবে চিত্রিত করেন তিনি আমার আরাধ্য নন।" [ঐ, পৃ. ৪৮৪]

তাহলে তাঁর কৃষ্ণ ও তাঁর রাম কি অন্য পৃথিবীর? রামচন্দ্র তো শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, হয়েছে রক্তপাতও। হিন্দু ধর্মকে মানতে হলে দুর্গা, কালী, পশুবলি ইত্যাদিকে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে মানতে হবে; অন্ততঃ তার বিরুদ্ধে রূঢ় মন্তব্য করা ঠিক হবে না। কিন্তু গান্ধীজী যুগযুগান্তরের মন্দিরে দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে খুবই কড়া মন্তব্য করেছেন। তাঁর ভাষায় ঃ "মেয়েদের দিয়ে এরকম বেশ্যাবৃত্তি চালানো যে হিন্দু ধর্মের অঙ্গ— এ কথা ভাবতেও আমার লজ্জাবোধ হয়। তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে এই (দেবদাসী) প্রথা হিন্দুদের মধ্যে বিদ্যমান। কালীমায়ের সামনে ছাগবলী দেওয়া আমার মতে প্রত্যক্ষ অধর্মাচরণের নিদর্শন এবং পশুবলি দেওয়ার প্রথাকে আমি হিন্দু ধর্মের অঙ্গ স্বরূপ বিবেচনা করি না। হিন্দু ধর্ম বহু যুগ ধরে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়েছে। হিন্দু ধর্ম— এই নামটি বিদেশীদের দেওয়া। হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের ধর্মমতকে এই নামে অভিহিত করা হয়। একথা যথার্থ যে, একদা ধর্মের নামে পশুবলি দেওয়া হোত। কিন্তু এ ধর্মাচরণ নয়, হিন্দুধর্ম তো নয়ই।" [চতুর্থ খন্ড, পৃ. ৪৯৩]

পূর্বে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী Prophet পয়গম্বরদের মতো তাঁর উপর বাণী অবতীর্ন হয়, যা তিনি শুনতে পান। অন্য জায়গায় তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষ। তিনিই বলেছেন, "নিজেকে আমি গড়পড়তা (সাধারণ) মানুষ চেয়ে বড় বলে মনে করি না।"

গান্ধী এও বলেছেন, "আমার যে সব ধারণা হয়েছে ও যেসব সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি তার কোনটাই শেষ কথা নয়। কালই আমি সেসব বদলাতে পারি। জগতকে শেখাবার আমার নতুন কিছু নেই।" [দ্রঃ 'পশ্চিমবঙ্গ' গান্ধী সংখ্যায় প্রিয়রঞ্জন সেন, পৃ. ৩১]

রাজপুত জাতি হিন্দুদের মধ্যে গৌরবময় এক জাতি। তাঁদের যুদ্ধপটুতা আরও বৃদ্ধি করেছে তাঁদের গৌরবকে। কিন্তু গান্ধীজী রক্তারক্তি পছন্দ করতেন না বলে রাজপুতদেরকে ঘৃন্য মনে করে তিনি লিখেছেন, "আপনারা কি জানেন, রাজপুতরা কি করিত? যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের উৎসর্গ করিবার পূর্বে তাহারা নিজ স্ত্রীলোকদিগকে স্বহস্তে মারিত।" [রচনা, ষষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২৫]

মানুষ বা পশুর রক্তপাত তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না— একথা সত্য বলে যদি ধরে নেওয়া হয় আর নারীজাতির প্রতি তাঁর মায়া মমতার প্রাচুর্য ছিল এও যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে নারীজাতিকে তিনি কি করে পরামর্শ দিতে পারেন যে, কোন ব্যভিচারী বা দুষ্কৃতকারী আক্রমণ করলে আত্মসমর্পণ না করে তারা যেন আত্মহত্যা করে। নারীর হাতের অস্ত্র আক্রমণকারীকে নিক্ষেপ না করে নিজের দেহে চালানো— কোন্ ধরণের অহিংসা সে প্রশ্ন থাকবেই। তাঁর ভাষায়, "নারীকে দুষ্কৃতকারীর নিকট আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা আত্মহত্যা করিবার পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে কি?—এই প্রশ্নের স্পষ্ট পরিষ্কার জবাব চাই। নোয়াখালি রওনা হইবার ঠিক পূর্বে দিল্লীতে আমি ইহার জবাব দিয়াছি। নারী বরং আত্মহত্যা করিবে তথাপি আত্মসমর্পণ করিবে না। ইহা তো অতি সুনিশ্চিত পরামর্শ।" [ঐ, পৃ. ৫৩]

খুব উচ্চস্তরের তো দূরের কথা, সাধারণ ও স্বল্পশিক্ষিতরাও উপলব্ধি করতে পারেন সংবাদপত্রের গুরুত্ব। সংবাদপত্রের সব সংবাদই যে সত্য, তা নয়। যাঁরা সংবাদ সরবরাহ করেন হয়তো তাঁদের ত্রুটি থাকে অথবা তাঁদের যাঁরা সংবাদ যোগান দিয়েছেন তাঁদেরও ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই বলে সংবাদপত্রের জগতটাকেই উপেক্ষা করা কোনও শিক্ষিত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বিলেত ফেরত নেতা গান্ধীজী খবরের কাগজের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছেন ও লিখেছেন। যেমন তাঁর ভাষায়, "আমি নিজে সংবাদপত্রের খবর বড় বিশ্বাস করিনা। এবং সংবাদপত্র যাঁহারা পড়েন তাঁহাদের সাবধান করিয়া দিয়া বলি, ঐ সব কাগজে যে খবর ছাপা হয়, তাহা দ্বারা তাঁহারা যেন অতি সহজে বিচলিত না হন। উচ্চ শ্রেণীর সংবাদপত্রও অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জন দোষ হইতে মুক্ত নহে।" [রচনা, ষষ্ঠখন্ড, পৃ. ২৯৯]

তখনকার শিক্ষিত সমাজের মানসিকতা নির্ধারণ করতে পারেন নি বলেই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক শেক্সপিয়রের নাটকগুলোকে তিনি ঘৃণা করতেন—"গান্ধীজী শেক্সপিয়রের নাটকগুলিকে অশ্লীল মনে করে নিষিদ্ধ পাঠ্য ভাবতেন। অপরপক্ষে বাংলার বুদ্ধিজীবীরা ১৮ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত শেক্সপীয়রকে অবশ্য পাঠ্য মনে করেন।" [সুধী প্রধান : গান্ধী ও সুভাষ, 'পশ্চিমবঙ্গ' গান্ধী সংখ্যা, পৃ. ৮৮]

অনেকে মনে করেন যে গান্ধীজী বৃটিশের নিযুক্ত, বৃটিশের বাছাই করা ভারতীয় সেই নেতা যিনি ইংরেজ বিরোধী ভারতবাসীদের ভিতরে প্রবেশ করে বিপ্লবী সেজে বা বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিয়ে অভিনয় করে গেছেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত— তাহলে প্রশ্ন আসে, তা কিভাবে হয়েছিল? তাঁদের মতে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে : ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতার কংগ্রেসের অধিবেশনে এই 'অহিংস' কথাটি যখন সদস্যদের মাথায় ঢোকালেন, তখন সকলেই মেনে নেননি এটা। যাঁরা মেনে নেননি তাঁদের যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি হলেন ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। তখন ভোটাভুটি হয়েছিল। কিন্তু অপরিচিত ও অখ্যাত মাথাগুনতি অনেক সদস্যের উপস্থিতি দেখা গেল সেখানে। মোট ভোটদাতা ছিলেন ২৭১০ জন। বৃটিশের কৌশল যাঁরা ধরতে পারলেন না অথবা জেনে বুঝেই বেইমানি করলেন পক্ষে ভোট দিয়ে, তাঁদের সংখ্যা হোল ১৮২৬ জন। আর যাঁরা হিসেব করে ফেললেন যে, বৃটিশ আমাদের মারবে আর আমরা একতরফা মার খেয়েই যাবো অথচ মারতে পারবো না তাদের— এ কোন্‌দেশীয় রাজনীতি? এবং যাঁরা এই 'অহিংসনীতি' মেনে নিতে পারলেন না তাঁদের সংখ্যা হোল ৮৮৪ জন। সুতরাং গান্ধীজীর ঐ প্রস্তাব পাস হয়ে গেল। তখন ষড়যন্ত্র টের করতে পারেন নি অনেকেই। বেশির ভাগ ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ভাড়া করে আনা হয়েছিল পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য। ডঃ বিমলানন্দ শাসমল ডঃ আম্বেদকরের Pakistan or Partition of India গ্রন্থের উল্লেখ করে লিখেছেন : পরলোকগত Mr. Tairsee আমাকে একবার বলেছিলেন যে, যাঁরা ঐ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন কলকাতার ট্যাক্সি ড্রাইভার যাঁদের এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবার জন্যে ভাড়া করে আনা হয়েছিল। [তথ্য : স্বাধীনতার ফাঁকি: ব্যারিস্টার বিমলানন্দ শাসমল, পৃ. ১৬]

জাতির জনক বা জাতির পিতা এই উপাধিটি যেকোন কারণেই হোক ভারতে বহুল প্রচারিত ও প্রচলিত। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্সি, ইহুদি প্রভৃতি কোন জাতিরই তিনি প্রথম পুরুষ বা প্রতিষ্ঠাতা নন্। তাহলে তিনি কোন্ জাতির পিতা এ প্রশ্ন থেকেই যায়। উত্তরে যদি বলা হয়. তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পিতা তাহলে সেখানে আর এক বিরাট প্রশ্নের সৃষ্টি হয়— স্বাধীনতা আন্দোলন কাকে বলে? তার সহজ ও সরল উত্তর হোল, কোন পরাধীন দেশের জনসাধারণ যখন স্বাধীনতার জন্য সেই সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা লড়াই করে তাকেই বলে স্বাধীনতা আন্দোলন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীর কোন নাম গন্ধ ছিল না। যদি তাই হয় তাহলে একটি বড় প্রশ্ন থেকে যায় যে, জাতির জনক বা জাতির পিতা গান্ধীজীর আবির্ভাবের পূর্বে স্বাধীনতার জন্য কোন যুদ্ধ, বিপ্লব বা বিদ্রোহ কি হয় নি? তাহলে ওহাবী যুদ্ধ, ফারায়ী বিপ্লব, মোপলা বিপ্লব, সাঁওতাল বিপ্লব, চোয়াড় বিপ্লব, সিপাহী বিপ্লব ইত্যাদি

সবই কি মিথ্যা? ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পরে রাজনীতির মঞ্চে গান্ধীজীর আবির্ভাব— যদি তাঁকে জাতির জনক বা পিতা বলে স্বীকৃতি দান করা হয় তাহলে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বঙ্গদেশে যে ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংগঠিত হোল, একদিকে ভারতীয় সৈন্যের নেতা সিরাজউদ্দৌলা অপরদিকে বৃটিশ সৈন্যের নেতা ইংরেজ ক্লাইভ— যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা বা অন্যভাবে বললে, ভারতের হোল পরাজয় আর বৃটিশের হোল বিজয়। সিরাজ হলেন বন্দী ও নিহত, ভারত ভারতবাসীর হাত থেকে চলে গেল বৃটিশের হাতে— এও কি মিথ্যা?

১৯০০ খৃষ্টাব্দের গান্ধীজীকে যদি জাতির পিতা বলা হয়, তাহলে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের লড়াকু বিপ্লবী শহীদ সিরাজউদ্দৌলাকে জাতির পিতা বলা হবে, নাকি জাতির পুত্র?

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট সারা ভারতবাসী স্বাধীনতা উদযাপনে যখন মাতোয়ারা হয়ে উঠলো, দিল্লিতে ত্রিরঞ্জিত পতাকা তুলে সেই আনন্দময় মুহূর্তে গান্ধীজীও শামিল হলেন না কেন? কেন তিনি কলকাতায় লুকিয়ে রইলেন ঘিঞ্জি পল্লীতে সোহরাওয়ার্দির সঙ্গে? কেন তাঁকে কংগ্রেস দলের পক্ষ হতে বসানো হোল না স্বাধীন ভারতের উচ্চাসনে? যেমন পাকিস্তানের উচ্চাসনে বসানো হয়েছিল সে দেশের জনক জিন্নাহ সাহেবকে?

জাতির জনক ও জাতির পিতা প্রসঙ্গ শেষ করতে গিয়ে এ বিষয়ে গান্ধী স্বয়ং কী মন্তব্য করেছেন সেটাই দেখা ভাল। মাত্র কিছুদিনের জন্য বিশেষ কিছু নেতার কৌশলে জাতির জনক আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু পরক্ষণে নিভে গিয়েছিল সেই উপাধি প্রাপ্তির প্রদীপ। তিনি স্বয়ং বলেছেন, "আমাকে জাতির পিতা বলা হয়। আন্তরিক হইলে কথাটি এই অর্থেই সত্য যে, ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আমার ফিরিবার পর, কংগ্রেস যে রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহার সৃষ্টিতে আমার হাত অনেকখানি ছিল। ইহাতে একথাই সূচিত হয় যে, দেশবাসী আমার প্রভাবে খুব প্রভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ আমার সে প্রভাব নাই। এজন্য আমার দুশ্চিন্তা নাই, অন্ততঃ থাকা উচিত নয়।" [রচনা, ষষ্ঠখন্ড, পৃ. ২৮৪]

রবীন্দ্রনাথকে গান্ধীজী 'গুরুদেব' উপাধি দিয়েছিলেন। এই গুরুজী ও গান্ধীজীর মধ্যে অনেক সময় মতানৈক্য হলেও তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল সুগভীর। তদানীন্তন সাম্প্রদায়িক দল বলে প্রকাশিত 'রাষ্ট্রীয় সেবা সংঘের' উপর গান্ধীজীর ধারণা ভাল ছিল না। তিনি মনে করতেন যে, তারা সহিংস বা রক্তপাত করার দল। যে কোন কারণেই হোক গান্ধীজী যাতে ঐ দলের বিপক্ষে না গিয়ে সপক্ষে থাকেন তার ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। গান্ধীজী তাঁর রচনাসম্ভারের ষষ্ঠ খন্ডের ১৫৯ পৃষ্ঠার হেড লাইনে লিখেছেন, "রাষ্ট্রীয় সেবা সংঘ।" তারপরে লিখেছেন, "আমি শুনিয়াছি এই প্রতিষ্ঠানের হাতও রক্তরঞ্জিত। কিন্তু গুরুজী আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে,

একথা ঠিক নয়। তাঁহাদের সংস্থা কাহারও শত্রু নয়। মুসলমান হত্যা ইহার উদ্দেশ্য নয়। ইহার একমাত্র কাম্য যথাশক্তি হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করা। এই সংঘ শান্তি চায় একথা তিনি আমাকে প্রচার করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন।"

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা সেই সময় ভারতের অনেক বিচক্ষণ বিখ্যাত জাঁদরেল নেতৃবৃন্দ, যাঁরা ছিলেন সত্যিকারের উচ্চশিক্ষিত, কথা বলতেন অত্যন্ত মাপজোক করে, যাঁরা অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে সচেতন তো ছিলেনই, সেই সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতের ভাবনা চিন্তা করার ব্যাপারেও ছিল যাঁদের দারুন দক্ষতা— বিশাল সেই শিক্ষিত সমাজ কিভাবে প্রচারের প্রাবল্যে গান্ধীজীকে কেন্দ্র করে বৃটিশের কক্ষপথে ঘুরপাক খেলেন? প্রশ্ন আসবে, গান্ধীজী অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন নাকি সাধারণ ব্যক্তি? যদি সাধারণ হন তাহলে এতো সব অসাধারণ ব্যক্তি তাঁকে অনুসরণ করলেন কিভাবে? গান্ধীজী রচনা সম্ভারের চতুর্থ খন্ডের ভূমিকায় সাধারণ সম্পাদক শ্যামদাস ভট্টাচার্য এবং চেয়ারম্যান শঙ্করপ্রসাদ মিত্র লিখেছেন, "লোক শিক্ষার জন্য মহাত্মাগান্ধী তাঁর জনসেবা মূলক জীবনের ঊষাকাল থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার প্রায় কিছু পূর্ব পর্যন্ত অক্লান্তভাবে লেখনী চালনা করেছিলেন। ভারত সরকার গড়ে ৪০০ পৃষ্ঠার ৭০ খন্ডে ইংরেজিতে তাঁর সমগ্র রচনা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছেন। "অর্থাৎ ২৮০০০ হাজার পৃষ্ঠার বই" লিখে গেছেন। কিভাবে? কখন? তাও এক বিস্ময়! সম্পাদক বিধুভূষণ দাশগুপ্ত সম্পাদকের ১৯৬৯ সালের ১লা অক্টোবরের নিবেদনে লিখেছেন, "কয়েকমাস পূর্বে কলিকাতা ময়দানে চিন্ময় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী নির্মাণানন্দ মহারাজের গীতার ব্যাখ্যা শুনিতে গিয়াছিলাম। তিনি প্রথমেই এই কথা বলিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন— 'গীতা পাঠ করিলে কি হয় যদি শুনিতে চাও তবে মহাত্মা গান্ধীর দিকে চাহিয়া দেখ। প্রথম জীবনে যিনি একজন সাধারণ প্রতিভার মানুষ ছিলেন, তিনিই গীতার শিক্ষা অনুশীলন করিয়া পরবর্তী জীবনে বিশ্ববরেণ্য মহামানবে পরিণত হইয়াছিলেন। গীতার শিক্ষা অনুসরণ করিলে সাধারণ মানুষ মহাপুরুষে পরিণত হয়'।" [সম্পাদকের নিবেদন, দ্বিতীয় পৃষ্ঠা, চতুর্থ খন্ড]

স্বাধীনতা বিপ্লবীগণ যাতে কৃতকার্য হতে না পারেন সেজন্য সবসময় তিনি যেন লাগাম টেনে ধরতেন। বড় বেদনার কথা যে, প্রাণ উৎসর্গ করতে সংকল্প নিয়ে যাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাঁদেরকে তিনি 'উচ্ছৃঙ্খল জনতা' বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৪৬ সালের ৭ই এপ্রিল 'হরিজন' পত্রিকায় ইংরেজিতে মন্তব্য করলেন— "I might have ... in the flames." যার বাংলা মানে হচ্ছে; "আমি ইহা উপলব্ধি করিতে পারিতাম যদি তাহারা সমগ্র দেশকেই দলে টানিতে পারিত। অবশ্য তদ্দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল জনতার হস্তেই ভারতের সমর্পণ বুঝাইত। ১২৫ বৎসর বাঁচিয়া এই পরিণতি দেখিবার ইচ্ছা আমার নাই— তদপেক্ষা অগ্নিতে আত্মাহুতি দেওয়া শ্রেয়।" [ঐ, পৃ. ৪৩]

সত্য মিথ্যা যা-ই হোক, গান্ধী বিরোধীরা যাঁরা গান্ধীজীকে বৃটিশেরই গুপ্তচর বলে মনে করেন তাঁদের ঝাঁপিতেও অনুকূল দলিল কম নেই। বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্যা মিস উইলকিন্সন বলেছেন, "ইংরেজের ভয় গান্ধীকে ততোটা নয়, যতোটা ভয় ক্ষ্যাপা ছেলের দলকে। গান্ধী ইংরেজের সবচাইতে বড় পুলিস অফিসার অর্থাৎ আমাদের পোষা লোক।" (দ্রঃ অবিস্মরণীয় : গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র, প্রথম খন্ড, পৃ. ৪১৮, ১৯৭৯-তে ছাপা)

যাঁদের দাবী গান্ধীজী বৃটিশেরই নিয়োগ করা লোক তাঁরা প্রমাণের নমুনা হিসাবে বেলা মিত্রের কথা উল্লেখ করেন। সুভাষচন্দ্র বসুর "আজাদ হিন্দ সরকারের গুপ্তচর বিভাগ (সিক্রেট সার্ভিস)-এর ১৪ জনের ফাঁসির আদেশ হল ভারতেই। হরিদাস মিত্র অন্যতম আসামী। তাঁর পত্নী বেলা মিত্র গান্ধীজীকে সব বললেন তাঁর কাছে গিয়ে এবং গান্ধীজীর উদ্যোগে বড়লাটের বিশেষ আদেশে সকলেই কারামুক্ত হলেন, ফাঁসি তো দূর অস্ত।" [সুশীলকুমার ধাড়া : 'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা'-গান্ধী সংখ্যা, পৃ. ৭৫]

গান্ধীজীকে সাধু, সন্ন্যাসী অথবা অবতার যা-ই বলে প্রচার করা হোক না কেন, সত্য ইতিহাসের মূল উপড়ে ফেলে দেওয়া যায় না। ইউরোপে গান্ধীজীকে নিয়ে সিনেমায় যে সব বই দেখানো হয়েছে তা ছিল অত্যন্ত অশ্লীল এবং ভারতবাসীর প্রত্যেকের পক্ষেই ছিল একটা কলঙ্ক। গঙ্গানারায়ণ বাবু লিখেছেন, "এমনকি ইওরোপে ছবি দেখানো আরম্ভ হল 'Everybody Loves Music'. নেংটি পরা গান্ধীজী ইংরেজ রমণীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে বলনৃত্য করছেন। সেদিন তো কংগ্রেসের হোমরা চোমরা অনেকেই ইওরোপ গিয়েছিলেন। তাঁরা ত কোনরকম আপত্তি জানাতে সাহস করেন নি। ওদেশ ত দেখিয়েই চলেছিল একই ধরণের ছবি 'ইন্ডিয়া স্পীকস্', 'বেঙ্গলী' ইত্যাদি। শুধু একজন বীর্যবান পুরুষ এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সব বন্ধ করে দিয়েছিলেন— তিনি হলেন শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি নিজে গেলেন Arch Bishop Cardinal Intizar-এর কাছে। জানালেন তাঁর আপত্তি, ছবি দেখানো বন্ধ হল। নিজে হিটলারকে অনুরোধ করলেন, জার্মানীতে বই দেখানো বন্ধ হল। সেই সুভাষচন্দ্রকেই পরে গান্ধীজী কংগ্রেস থেকে তাড়ালেন তিন বছরের জন্য, অপরাধ বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ।" [ঐ, পৃ. ৪১৯]

সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে গান্ধীজী তাঁর অত্যন্ত অনুরাগী ভক্ত ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়াকে দাঁড় করিয়েছিলেন। কিন্তু পট্টভি সীতারামাইয়া পরাজিত হয়েছিলেন। গান্ধীজী তখন শোকার্ত হয়ে বলেছিলেন— এ পরাজয় সীতারামাইয়ার নয়, এ পরাজয় আমারই।

গান্ধীজীর সঙ্গে ধনীদের একটা নিবিড় সম্পর্ক বরাবরই ছিল। তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্মের গোড়াপত্তনে সে বাজারে মোটা অর্থের সাহায্য করেছিলেন জি.ডি.বিড়লা। কংগ্রেস দলের মুষ্টিমেয় কিছু সৎ কর্মী এটাকে ভাল চোখে দেখেন নি। তাই তাঁরা বলে ফেলেছিলেন বা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন— "And yet there were Congressmen.

was being dominated by them." অর্থাৎ অনেক কংগ্রেসসেবীই কংগ্রেসকে ভাঙ্গিয়া দেবার কথা বলিতেছেন। তাহদের মতে, এই প্রতিষ্ঠানটি ধনিক শ্রেনী ও চোরাবাজারীদের পুরোপুরি কবলস্থ না হইলেও তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত।" [দ্রঃ সত্যেন সেন: পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২]

গান্ধীজীর ঐ প্রিয়তম নেতা ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া স্পষ্ট বলেছিলেন, "The fight of Congress is the fight of the Indian Capitalist against the British Capitalist." অর্থাৎ "কংগ্রেসের সংগ্রাম ব্রিটিশ ধনিক শ্রেনীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ধনিক শ্রেনীর সংগ্রাম। ধনিক শ্রেনীর সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্কের কথা বিশদ করিয়া গান্ধীজী সোদপুরে জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন : My relation with the capitalist is the relation of Congress with the Capitalist. অর্থাৎ আমার সহিত ধনিকদের যে সম্পর্ক কংগ্রেসের সহিত ধনিকদের ঠিক সেই সম্পর্ক।" [ঐ, পৃ. ১৬২-৬৩]

গান্ধীজীর সময়ে খুব নাম করা ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা ছিল Hindustan Times। ঐ পত্রিকাটির মালিক ছিলেন ধনকুবের মিঃ জি. ডি. বিড়লা। সম্পাদক ছিলেন দেবদাস বা দেবীদাস গান্ধী। জানিনা কেন লুকিয়ে রাখা হয় এসব তথ্য। ইনি হচ্ছেন গান্ধীজীর পুত্র। গান্ধীর আর এক পুত্রের নাম হরিলাল গান্ধী। এঁদের ইতিহাস চেপে রেখে দেওয়া হয়েছে কেন? তাঁরা দুই ভাই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন বলেই কি এই ব্যবস্থা? কেউ বলেন একটি ছেলে মুসলমান হন, কেউ কেউ বলেন দুজনেই মুসলমান হয়েছিলেন। আবার কেউ বলেন, মুসলমান হয়ে আবার হিন্দুধর্মে ফিরে এসেছিলেন। আর একটি দল গান্ধীপুত্রের মুসলমান হওয়ার ব্যাপারটি একেবারেই উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। সাধারণ অনুসন্ধানপ্রিয় ইতিহাস প্রেমিকরা পাত্তাই করতে পারবেন না আসল ব্যাপারটা কী? গান্ধীজীর নিজের লেখা হতে উদ্ধৃতি দিলে প্রমাণের একটা কিছু পেতে পারেন পাঠকেরা।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুসলমান হওয়ার পরে গান্ধীজী লিখেছেন— "আমার জ্যেষ্ঠপুত্র কয়েকবছর আগে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছেন। ... তাঁর মা একটি চিঠি লিখেছিলেন, জানতে চেয়েছিলেন ধর্মান্তরিত হওয়ার পর সে মদ্যপান ত্যাগ করেছে কিনা, কারণ ইসলাম মদ্যপান বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছে। যাঁরা তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণে খুশী হয়েছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি ঐ চিঠিতে বলেছিলেন— তাঁর মুসলমান হওয়াতে এতোটা আপত্তি নেই, যতোটা আপত্তি রয়েছে তাঁর মদ্যপানে। মদ্যপান বরদাস্ত করবেন না।" [গান্ধী রচনা সম্ভার, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ১২৭]

প্রচারিত সংবাদ এই যে, গান্ধীপুত্র হরিলাল ও দেবীদাস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হরিলাল পিতার মৃত্যুর একবছর পরে মুসলমান অবস্থাতেই মারা যান। [তথ্য : আনন্দবাজার পত্রিকা, পৃ. ৩, ৬ই জুলাই, ১৯৯০]

তাহলে কি গান্ধীজীর ছেলেরা নিরক্ষর অশিক্ষিত মূর্খ বলেই তাঁদেরকে চেপে রাখা হয়েছে? তা নয় মোটেই। আসল সত্য ইতিহাস হোল এই, গান্ধীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিলাল বাবার অহিংস আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। হরিলাল গান্ধী কিন্তু জানতেন, তাঁর পিতার নামে যতো জয়ঢাক বাজানোই হোক, তখন সারা ভারতে হিন্দু নেতাদের মধ্যে হৃদপিন্ডের মত ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস। অল্পবয়সেই হরিলাল জেল খেটেছিলেন ছ'বার। হরিলাল কলকাতার বড়বাজারে ব্যবসা ফেঁদেছিলেন। একদিন কিছু ছেলেমেয়েদের গ্রেফতার হওয়ার পর বড়বাজার থানায় হরিলাল গান্ধী দেখা করতে গিয়েছিলেন। তখন এ্যারেস্ট হওয়া ছেলেমেয়েরা চেয়েছিলেন যে, এই সংবাদ তাঁর মাধ্যমে তাঁর পিতা গান্ধীজীর কাছে পৌঁছে যাক। তখন গান্ধী পুত্র গুজরাটি বা হিন্দিতে উত্তর না দিয়ে ইংরেজিতে বললেন, "I need not send it to Mahatma; my father is present here in the person of Mr. C.R. Dass. Whatever he says we will do. অর্থাৎ মহাত্মার নিকট পাঠাইবার দরকার নাই, এখানেই মিঃ দাসের মধ্যে আমার পিতা উপস্থিত রহিয়াছেন।" [দ্রঃ শ্রী হেমন্তকুমার দাসের লেখা 'বন্দীর ডায়েরী', পৃ. ৬৯, ১৯২২-এ ছাপা]

"তিনমাস প্রেসিডেন্সি জেলে থাকার পর হরিলাল (গান্ধী) ও কেদারবাবুকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলি করা হইয়াছিল। হরিলালের অসুখে অসুখে শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছিল— ৫ মাসে ২৫ পাউন্ড ওজন কমিয়া গেল। ... এই বয়সে ছয় বার জেল খাটিয়াও হরিলালের চৈতন্য হইল না।" [ঐ, পৃ. ৭৩-৭৪]

ঐতিহাসিকদের চরিত্র ষড়যন্ত্রপূর্ণ বা সাম্প্রদায়িক হলে তা বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য দুঃসংবাদ ছাড়া সুসংবাদ নয় মোটেই।

পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে এসে আবার বলছি, এক শ্রেনীর ধনিক ব্যবসায়ী আছে যারা নিজের স্বার্থের জন্য দেশকে পর্যন্ত ধ্বংস করে দিতে পারে। তারা জাতিতে হিন্দু মুসলমান পার্সী যা-ই হোক না কেন অর্থ, লাভ আর মূলধনই তাদের কাছে বড় ধর্ম। গান্ধীজী যখন আফ্রিকায় 'কুলি ব্যারিস্টার' হয়ে গিয়েছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে সহযোগী হয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিলেন যে সমস্ত ধনী ব্যবসায়ীরা, তাঁরা বেশিরভাগই ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁদের নাম গান্ধী রচনাবলীতে লেখা রয়েছে। যেমন শেঠ আব্দুল্লাহ (পৃ. ৪৩), শেঠ হাজী তৈয়েব খাঁন মহম্মদ (পৃ. ৪৩), শেঠ আদমজী মিয়া খাঁ (পৃ. ৫২), শেঠ রুস্তমজী (পৃ. ৬২), শেঠ আব্দুল গণি খুরশী, শেঠ মহঃ কাসিম কামরুদ্দিন (পৃ. ১০৪), শেঠ হাজী হাবিব (পৃ. ১০৫), শেঠ হাজী উজির আলি (পৃ. ১১৯), শেঠ ইমাম সাহেব বাওয়াজির (পৃ. ২১৬), শেঠ দাউদ মহম্মদ (পৃ. ২১৩), শেঠ আহম্মদ মহম্মদ কাছলিয়া (পৃ. ১৩৩). শেঠ ইউসুফ ইসমাইল (পৃ. ১৩১)-ইনি অবশ্য স্যার টাইটেলও পেয়েছিলেন পরে।

পাকিস্তানের ইসপাহানী, ভারতের বিড়লা সেই সঙ্গে আরো বড় বড় কিছু ব্যবসাদার বৃটিশের হাতে ভারতকে বিক্রি করে দিয়েছেন বললে তা চমকে যাওয়ার মত কথা বটে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় আহত নিহত হওয়ার রক্তাক্ত মৃত্যুযজ্ঞ দেখে অথবা হিরোশিমা কিংবা নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমাতে বিরাট সংখ্যক মানুষ নিহত আহত আর পঙ্গু হয়ে গেলে ঐতিহাসিক সাহিত্যিক ও লেখকদের কলমের ডগা দিয়ে আগুন ঝরতে থাকে। লিখতে কোন বাধা থাকে না কারণ ময়দান পরিষ্কার। কিন্তু এইরকম শ্রেনীর বড় ধরণের ধনীদের ক্রূর ষড়যন্ত্রের কারণে লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি মানুষও যদি আহত নিহত হয় তাহলে সেরকম ক্ষেত্রে কলম চালানো বড়ই কঠিন। কারণ তাঁদের টাকায় টিকি বাঁধা আছে অনেকেরই।

১৯৯৫-এর ২৪শে আগস্ট দৈনিক 'আজকাল' পত্রিকায় ডক্টর পূর্ণেন্দু ঝা যে তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক সংবাদ পরিবেশন করেছেন তা কোন কাপুরুষ লেখকের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। কলকাতার দারভাঙা বিল্ডিংয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সহ তদানীন্তন বেশ কয়েকজন নেতাদের উপস্থিতিতে লেখক ডঃ ঝা-র সম্মুখে যে ঘটনাটি ঘটেছিল বা যা কথোপকথন হয়েছিল তা জানতে পারলে ঐ রকম ক্ষতিকারক ধনীদের চরিত্রের 'এক্স-রে' করা সম্ভব। ডক্টর পূর্ণেন্দু ঝা-র সামনে বিধানচন্দ্র রায়কে হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট ও প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী জানালেন, তিনি আশংকা করছেন যে, গোটা বঙ্গদেশ এবং পাঞ্জাব পাকিস্তান হয়ে যেতে পারে। ঠিক ঐ সময় কলকাতায় চলছিল হিন্দু মুসলমানের রক্তাক্ত দাঙ্গা। সাধারণ মানুষ মনে করছিলেন ঐ দাঙ্গা হবে দীর্ঘ— কবে যে থামবে তা আন্দাজ করতে পারছিলেন না তাঁরা।

আসল সত্য অনেকেই জানেন না যে, দাঙ্গা সৃষ্টি করতে পারেন রাজনৈতিক নেতারা, আবার তা বন্ধও করতে পারেন তাঁরা। এবার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিড়লাজীকে যে ফোন করেছিলেন সেটা হচ্ছে— "বিড়লাজীকে বলেছেন গান্ধীজীকে রাজী করাতে যাতে তিনি অন্ততঃ নীতিগতভাবে পাকিস্তানকে মেনে নেন। গান্ধীজী রাজী হলে বিড়লাজী যেন ইসপাহানী সাহেবকে দিয়ে মিঃ জিন্নাকে অনুরোধ করেন সোরাবর্দ্দী সাহেবকে নির্দেশ দিতে মিলিটারীর আশ্রয় নিয়ে দাঙ্গা নিবারণ করতে। মিঃ জিন্নার অনুরোধ ছোটলাট নিশ্চয় মেনে নেবেন। ডঃ মুখার্জী সমগ্র বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাব পাকিস্তানে যাবার আশংকা প্রকাশ করলে ডাঃ রায় জানালেন, বিড়লাজীকে বলা আছে, ইসপাহানী সেরকম কোন কৌশল করলে বিড়লাজীর ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে তাঁর যে কয়েক কোটি টাকা বেনামীতে আছে, তা হাতছাড়া হবে। এরূপ হুঁশিয়ারীতে ইসপাহানী মিঃ জিন্নাকে পাকিস্তানের এলাকায় একটি কমিশন ঠিক করবে এই প্রস্তাবে

রাজী করাতে পারবেন বলে তাঁর বিশ্বাস। এখানে উল্লেখ্য (পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ডঃ মুখার্জী মন্ত্রী হন) এইসব চলা কালে আবার ডাঃ রায়ের কাছে ফোন এল। কিছুক্ষণ পর প্রায় বেলা ১টায় তিনি ফিরে এসে ঘোষণা করলেন উল্লিখিত পরস্পরের সঙ্গে কথা হয়েছে এবং বেলা ১-১৫ মিনিটে মার্শাল আইন জারি করে মিলিটারী রাস্তায় নামছে। ... কিন্তু মিলিটারী পূর্বোক্ত সময়ে নামল, গুলিগোলা চালাতে লাগলো। গণহত্যা ক্রমে বন্ধ হোল, কিন্তু দাঙ্গার জের চলতে লাগলো। দেশও ভাগ হোল— সেই সাম্প্রদায়িক অভিশাপ আজও আমাদের বহন করতে হচ্ছে। তখন বুঝিনি বিড়লার ব্যাঙ্কে ইসপাহানীর টাকা বেনামীতে কেন? পরে জানতে পারি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিড়লা ও ইসপাহানী যৌথভাবে বৃটিশকে শস্য যোগানোর ঠিকাদারি নিয়ে বঙ্গদেশের চাল গম সব তুলে দিয়েছিল তাদের হাতে। যার ফলে ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষে মারা যায় পঞ্চাশ লক্ষাধিক মানুষ। [এই মর্মান্তিক মৃত্যু সংখ্যা ৫০ লাখ বা আধ কোটি যেটা হিরোসিমা ও নাগাসাকির পরমাণু বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যার চেয়ে বহুগুণ বেশি]। পরে বিভিন্ন রিপোর্টে দেখেছি এইভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে চাপ সৃষ্টি করে গান্ধীজীকে পাকিস্তান মেনে নিতে রাজী করানো হয়েছিল। ব্যবসায়িক ও পুঁজিপতিদের স্বার্থে শোষক শ্রেনীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের দেশবাসীর স্বার্থের পরিবর্তে তাদের শ্রেনীস্বার্থের আসল রূপ।"

যে গান্ধীজী একসময় বলেছিলেন, দেশভাগ করতে হলে আমার মৃতদেহের উপর ভাগ হবে, তার পূর্বে নয়— সেই গান্ধীজীই পুঁজিপতিদের চাপের কাছে [এই ক্ষেত্রে মিঃ জি. ডি. বিড়লার আদেশে] বাধ্য হলেন নতিস্বীকার করতে। সুর পাল্টে ফেললেন তিনি—"দেশভাগের প্রশ্নে আর তিনি বাধা দেননি। এমনকি অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভাতে তিনি সবাইকে দেশভাগের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পরামর্শই দিয়েছিলেন। কারণ ব্যাখ্যা করে গান্ধীজী বলেছিলেন, আমার সেই অবস্থা বা বয়স নেই যাতে কোনও বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারি। এই পরিস্থিতিতে বর্তমান নেতৃত্বকে দুর্বল করে দেওয়া ভুল হবে। ফলে আমাকে এই তেতো বড়ি গিলতে হচ্ছে।" তারপর তিনি আর একটা কথা যোগ করলেন, "আমার যদি শক্তি থাকত তাহলে আমি একা হাতে বিদ্রোহ ঘোষণা করতাম। ... কাশ্মীর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ৬ই আগষ্ট লাহোরের কংগ্রেস কর্মীদের তিনি বলেন, 'আমার বাকী জীবন পাকিস্তানের মাটিতেই কাটবে। হয়তো পূর্ববঙ্গে অথবা পশ্চিম পাঞ্জাবে কিংবা সীমান্ত প্রদেশে'।"

তাহলে কি তিনি ভারতের স্বাধীনতা মেনে নিতে পারেন নি? আরও প্রশ্ন আসে, তিনি কি তাহলে স্বাধীনতার পুরোপুরি বিরোধী ছিলেন? যে কোন বিষয়ে ক্ষোভ দুঃখ

অভিমান হতেই পারে। গান্ধীজীর যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তিনি ঐ তারিখটিতে চুপচাপ থেকে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে বছর পাঁচেক আগে তাঁর শিষ্য মহাদেব দেশাই-এর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঐ তারিখে তাঁর মৃত্যুদিন পালন করেন। সারাদিন ধরে গীতা পাঠ হয় এবং তিনি ঐ দিন উপবাসও করেছিলেন। এককথায় স্বাধীনতা দিবসের আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দময় মৃত্যুদিন পালন তাঁর মনের বিরোধিতাই প্রমাণ করে। [ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের 'মহাত্মাগান্ধী' পুস্তকের উদ্ধৃতি দিয়ে ঐ তথ্য পরিবেশন করেছেন শ্রী সুরজিৎ দাশগুপ্ত। দ্রষ্টব্য 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা, গান্ধী সংখ্যা, পৃ. ১০০]

গান্ধীজী সফল না ব্যর্থ এ প্রশ্নও বিরাট। কংগ্রেস বারে বারে তাঁকে বাদ দিয়ে দিয়েছিল অথবা তাঁকে সরে আসতে হয়েছিল। অবশ্য মহিমাময় লেখকেরা 'তাড়িয়ে দেওয়া' 'বের করে দেওয়া' প্রভৃতি শব্দগুলোকে সযত্নে পরিহার করে উত্তমতর মিষ্টি শব্দ 'তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল' ব্যবহার করেছেন।

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট গোটা দিল্লি শহর যখন স্বাধীনতাময়, গান্ধী সেখানে নিঃসঙ্গ, নীরব, দুঃখিত এবং অসন্তুষ্ট— "অল ইন্ডিয়া রেডিও স্বাধীনতা দিবসের জন্য তাঁর বাণী প্রার্থনা করলে তিনি প্রথমে অক্ষমতা জানান। রেডিওর প্রতিনিধিবর্গ যখন তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, তাঁর বাণী না পেলে ব্যাপারটা খুব খারাপ দেখাবে তখন গান্ধীজী রূঢ় জবাব দেন, 'There is no message at all, if it is bad, let it be so,' অর্থাৎ কোনও বাণী নয়, যদি বাণী না দেওয়াটা খারাপ হয়, তাই হোক।

গান্ধীজীর একটা দিকে বড় ব্যর্থতা দেখা যায়। সেটা হচ্ছে, তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কাউকে খুশি করতে পারলেন না, পারলেন না খুশি করতে হিন্দু মহাসভা বা রাষ্ট্রীয় সেবা সংঘকে। না খুশি করতে পারলেন ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিকবাদীদের, না পারলেন সনাতন প্রাচীনপন্থীদের, না খুশি করতে পারলেন নিজের পরিবারের পুত্র-স্বজনদের। শেষে সকলের বিরোধিতা পেয়েও নিজে সুখী হওয়ার যে ক্ষমতা, সেখানেও তিনি ব্যর্থ। বারে বারে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে— "তাঁর প্রাণনাশের প্রথম চেষ্টা হয় ১৯৩৪-এর ২৫শে জুন পুনে শহরে। ... ১৯৪৬-এর জুন মাসে দিল্লি থেকে যখন মহাত্মাজী পুনে যাচ্ছিলেন তখন নিরাল ও করজাত স্টেশনের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। তারপর ১৯৪৮-এর ২০শে জানুয়ারি তৃতীয়বার তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে মদনলাল।" সবশেষে ১৯৪৮ এর "৩০শে জানুয়ারী শুক্রবার নাথুরাম গডসে মহাত্মাকে হত্যার পরে ধরা পড়ে। গডসের প্রথম বিচারে সেশন জজ মন্তব্য করেন যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (প্যাটেল) গোপন তথ্যাবলী থেকে গান্ধী হত্যার চক্রান্ত সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার

পরে যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন তাহলে মহাত্মাজীর জীবন রক্ষা পেত।" [সুরজিৎ দাশগুপ্ত : 'পশ্চিমবঙ্গ', ঐ, পৃ. ১০৪]

যে গান্ধীজী পিতা করমচাঁদ (বা কাবা গান্ধী) আর মাতা পুতলীবাঈ-এর কোলে গুজরাটের পোরবন্দর নামে ছোট্ট শহরে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই গান্ধীজী ১৯৪৮-এর ৩০শে জানুয়ারি নতুন দিল্লিতে বিকাল ৫টা ১০ মিনিটে একজন ভারতীয়র হাতেই গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। ৭৯ বছরের বর্ষীয়ান এই বৃদ্ধ নেতাকে গুলি করে যে নিশ্চিহ্ন করতে চাওয়া হোল, এটা যদি না করা হোত, আরও কয়েক বছর ভারতের আকাশের নীচে যদি তিনি চলে ফিরে বেড়াতেন, লাভ অথবা ক্ষতির পরিমাণ কতটুকু হোত হিসাব বিশারদেরাই তা ভাল জানেন। অহিংসার বাণী-বাহক যেভাবে রক্তাক্ত কলেবরে ঢলে পড়েছিলেন মৃত্যুর কোলে, গান্ধীজীর কোন শত্রুর পক্ষেও তা কাম্য হওয়া অনুচিত।

ছবি : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ এবং 'কলম' পত্রিকার সৌজন্যে।

যে প্রশ্নের উত্তর নেই

আমরা কি স্বাধীন হয়েছি ১৯৪৭-এর পনেরোই আগস্ট? এ স্বাধীনতা কি সম্পূর্ণ? নাকি আংশিক? নাকি শর্তসাপেক্ষ? "ইতিহাসের ছাত্রদের জানা প্রয়োজন যে, ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কারের তীব্র বিরোধী ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু আমাদের জাতীয় পিতা গান্ধীজী ১৯৩৭ সালে এই শাসন সংস্কার মেনে নিয়ে সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। রজনীপাম দত্ত নিজে তাঁর বিখ্যাত বই 'India Today'-র মধ্যে বলেছেন যে, ভারতের জনগণের কোন সার্বভৌম ক্ষমতা নেই এবং Independence কথায় উনি একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়েছেন। পেঙ্গুইনের বই মারফত জানা গেছে যে, আমাদের পাশের দেশ বার্মা স্বাধীন। কিন্তু আমরা পরাধীন।" [বর্তমান দিনকাল, জুলাই, ১৯৮২, পৃ. ২৬, রচনা: অমিতাভ মৈত্র]

একটি নির্ঘাত সত্য ইতিহাসের তথ্য যদিও বেশিরভাগ ভারতবাসীকে জানতে দেওয়া হয়নি তবুও সে তথ্য তথ্যই। ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসের ১২ তারিখে জয়ন্ত ঘোষালের লেখাটা শুধু আকর্ষণীয়ই নয়, লেখকের প্রচন্ড সংসাহসও প্রশংসার দাবী রাখে।

'১৫ই আগস্ট আমরা স্বাধীনতা দিবস পালন করব কেন?' এই শিরোনামের সম্পূর্ণ লেখাটি উদ্ধৃত করে বইটির কলেবর বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য নয়। তাই তার কিছু অংশ তুলে দেওয়া হচ্ছে যা পাঠকদের জন্য হয়ে উঠতে পারে মূল্যবান প্রাপ্তি। তিনি লিখেছেন: "১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট, যেদিন আমাদের দেশ স্বাধীন হল বলে আমরা ঘোষণা করলাম। সেদিন আমাদের দেশের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন? লর্ড মাউন্টব্যাটেন। বেশ কয়েকমাস তিনি এই পদে ছিলেন। আমার বিনীত প্রশ্ন, ভারত যদি স্বাধীনই হয়ে যায় তবে মাউন্টব্যাটেন গভর্নর জেনারেল একদিনের জন্যও থাকেন কী করে? দেশভাগের পর দু দেশেরই গভর্নর জেনারেল থাকতে চেয়েছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। কিন্তু জিন্না সে প্রস্তাবে রাজী হননি। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল কিন্তু হয়েছিলেন জিন্না। প্রশ্ন হচ্ছে স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেল বৃটিশ শাসক-প্রতিনিধি হলেন কী করে? আর হলে স্বাধীনতা লাভই বা কিভাবে হয়?

দ্বিতীয়তঃ মাউন্টব্যাটেনের পর ভারতীয় গভর্নর জেনারেল হলেন চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী। কিন্তু ১৯৪৯ সনের ২১ জুন তিনি শপথবাক্য পাঠ করলেন কার নাম স্মরণ করে? কার প্রতি আনুগত্য, কার প্রতি দায়িত্ব প্রকাশ করলেন তিনি? ভারতবর্ষের আম জনতার উদ্দেশ্যে নয়, তিনি সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ ও তাঁর বংশধরদের প্রতি আনুগত্য

প্রকাশ করে শপথ নিলেন। শপথ নিতে গিয়ে তিনি বল্লেন, আমি চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ, তাঁর বংশধর এবং উত্তরাধিকারীদের প্রতি আইনানুসারে বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকবো এবং আমি চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী শপথ নিচ্ছি যে, 'আমি গভর্নর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত থেকে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ তাঁর বংশধর ও উত্তরাধিকারীদের সুচারু ও যথাযথভাবে সেবা করব।'

স্বাধীন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল শাসক রাজার নামে শপথ নেবে কেন? এরপরও এই স্বাধীনতাকে আমরা স্বাধীনতা বলব কেন? ... ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনকে আমরা স্বাধীনতা বলব কেন? নাকের বদলে নরুণ পেয়ে আমরা তাক্ ধিনা ধিন্ নৃত্য শুরু করেছি। যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা পাওয়াটাই ছিল লক্ষ্য। যে লক্ষ্য অর্জনটাও হয়েছে বৃটিশ শাসককুলের দয়া দাক্ষিণ্যে, কোন সংগ্রাম বা লড়াইয়ের মাধ্যমে নয়। সে জন্য মহাত্মা গান্ধীও নিজে ১৫ আগস্ট দেশভাগের ঘটনায় খুশী হতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন এ দিনটি তাঁর জীবনের এক দুঃখের দিন।

এরপরেও আমরা বলব ১৫ আগস্ট অনেক রক্ত ঝরিয়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করলাম? ... বৃটিশ রাজতন্ত্র অবসানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকাকে আমি খাটো করে দেখতে চাইনা। গান্ধী-নেহেরুর ঐতিহাসিক অবদানকেও আমি অস্বীকার করিনা, কিন্তু পাশাপাশি এটাও মনে করি '৪৭ সনের ১৫ আগস্ট বড় বেশী তাড়াহুড়ো করে বৃটিশ শাসক প্রভুদের দাক্ষিণ্য নিয়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। এটা দয়ার দান।

১৯৫২ সনে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ হলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি। '৫০ সনের ২৬ জানুয়ারি আমাদের দেশকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু '৪৭-এর ঠিক পরেই '৪৯ সনে নেহেরু গেলেন কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দিতে। কিন্তু নেহেরুর এই কমনওয়েলথ সফর নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক দেখা গিয়েছিল। কারণ কমনওয়েলথ-এর প্রধান হলেন গ্রেট বৃটেনের রাজা। এটা একটা স্থায়ী পদ। মজার ব্যাপার '৫০ সনের ২৬ জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত কমনওয়েলথ-এ যাওয়ার সিদ্ধান্তটি সংসদে র‍্যাটিফাই বা অনুমোদিত হয় নি। ... আমরা ১৫ আগস্ট নাকি মধ্যরাত্রে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। কিন্তু আমাদের বহির্সার্বভৌমত্ব কতটা সেটা এতক্ষণে পাঠকরা বুঝতে পেরেছেন আশা করি। আমাদের গভর্নর জেনারেল রাজার নামে শপথ নেন্, আমরা সংবিধানে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের মর্যাদা পাই আর লণ্ডনে আমরা কমনওয়েলথ করতে যাই সার্বভৌমত্বের প্রমাণ দিতে। ধ্যাষ্টামির একটা সীমা আছে। ১৯৭১ সনের একটা ছোট্ট খবর। '৭১ সনে আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৯ জুলাই লেখা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের সরকারি বাসভবন ও গাড়ীগুলোতে এতদিন যে সব ব্যক্তিগত

পতাকা দেখা যেত '৭১ সনের ১৫ আগস্ট থেকে তার পরিবর্তে দেখা যাবে জাতীয় পতাকা। রাজ্যসভায় তৎকালীন সহকারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এফ. এইচ. মহসীন এ খবর জানান। পি টি আই এ সংবাদ দিয়েছিল। আমার প্রশ্ন, '৪৭ সনের ১৫ আগস্ট আমরা নাকি স্বাধীনতা লাভ করেছি, তা হলে '৭১ সন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি-রাজ্যপালরা রাজার দেওয়া পতাকা উড়িয়ে এলেন কেন? কোন স্বাধীনতার ঐতিহ্য তাঁরা এতদিন বহন করলেন? তাই আজ যখন আর একটা ১৫ আগস্টের মুখোমুখি আমরা তখন মনে হচ্ছে আত্মসমীক্ষার সময় এসেছে। আজ যদি প্রশ্ন করি, '৪৭ সনের ১৫ আগস্ট-এর পর ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত আই. এন. এ. কে নেওয়া হোল না কেন? অথচ পাকিস্তান তার সেনাবাহিনীতে আই. এন. এ. সদস্যদের নিল। হবিবুর রহমানের মতো লোককেও চোখের জল ফেলতে ফেলতে পাকিস্তান চলে যেতে হয়েছিল। আজ নতুন করে যদি এ প্রশ্ন তুলি তবে দেশের কর্ণধাররা তার কী জবাবই বা দিতে পারবেন? ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে ১২টি ভল্যুম প্রকাশিত হয়ে গেছে যাতে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস আমরা জানতে পারছি। বাকী ডকুমেন্ট ১৯৯৯ সনের আগে প্রকাশ করা যাবে না বলে বৃটিশরা আগেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। প্রকাশিত ডকুমেন্ট থেকেই জানা যাচ্ছে নেতাজীকে বৃটিশরা 'ওয়ার ক্রিমিনাল' বলে ঘোষণা করেন। ... আসলে আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের বিস্মৃতিশক্তি ঘোরতর। আমরা ইতিহাস ভুলতে বসেছি। আমাদের দেশের নেতারা অধিকাংশই ভণ্ড, ধান্দাবাজ, সুবিধাবাদী। তাই তাঁরা এই স্বাধীনতা দিবসের নেপথ্য কাহিনীকে সবাই মিলে আড়াল করেছেন। আর যে কমিউনিস্টরা একদিন 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলে গগনভেদী চিৎকার জুড়েছিলেন আজ তাঁরাই দুগ্ধপোষ্য গুডবয় হয়ে গেছেন। সভা সমিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের প্রতিযোগিতায় তাঁরাও আজ আর পিছিয়ে নেই। '৪৭ সনের ১৫ আগস্টের মোহে আজ তাঁরাও পিছলে যান। ... সত্যি আমরা আধুনিক মানুষ হয়ে উঠেছি।" [দ্রষ্টব্য দৈনিক 'বর্তমান', ১২.৮.১৯৯৫, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা]

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের সত্যিকারের ইতিহাস বেশিরভাগ মানুষের কাছেই চাপা রয়েছে। আজও ভারতের বৃহত্তম গণগোষ্ঠী জানতে পারেন না এ স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া, না ভিক্ষা নেওয়া, না আধা স্বাধীনতা, নাকি অস্বাধীনতা? অতীব পরিতাপের কথা, শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি আজও জানতে পারেন নি 'স্বরাজ', 'স্বায়ত্ত শাসন', 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস', 'হোমরুল' প্রভৃতি গোলকধাঁধা মার্কা শব্দগুলো আর 'স্বাধীনতা', 'ফ্রিডম', 'ইনডিপেনডেন্স' সব একই কথা না সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার।

'প্রচার' বস্তুটি এমনই যে তা সত্য হোক বা মিথ্যা, সে প্রচার সরকারি হোক বা বেসরকারি, যথাযথভাবে প্রচারের কাজ শেষ করলে কোটি কোটি মানুষ ওটাকেই মনে

করবে সত্য। প্রচারের প্রাবল্যে সত্য মিথ্যা হতে পারে, আবার মিথ্যাও সত্য হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং সঠিক, সত্য, তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ কাগজ প্রস্তুত না হলে মগজ ও পরিপুর্ণ মানসিকতা সৃষ্টি করা একেবারে অসম্ভব। কোটি কোটি মানুষকে এরকম ভুল শেখানো হয়েছে, হচ্ছে আর হতেও থাকবে কতদিন তা বলা যাবে না সঠিকভাবে।

আমি আমরা সবাই বলি, লিখি, বিশ্বাস করি ও করাই যে, অবিভক্ত ভারতবর্ষ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের লড়াই-এর ফলস্বরূপ দুভাগে ভাগ হয়। পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমানে বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে একটা রাষ্ট্র, আর একটা আমাদের ভারতবর্ষ। এই ভারত এখন জনসংখ্যায় একশো কোটিকেও ছাপিয়ে গেছে। এই বিশাল জনসংখ্যার মাত্র এক কোটি লোকও কি জানেন যে, ভারত ক'ভাগে ভাগ হয়েছিল? কিন্তু আমাদের নেতাদের নেতারা তো জানেন আসল সত্যটুকু। অবিভক্ত ভারতবর্ষ বৃটিশরা ভাগ করে দিয়ে গিয়েছিল দুই বা তিন খণ্ডে নয় বরং তা ভাগ হয়েছিল মোট ২৮৫ খণ্ডে। ২৮৫ শুনেই তো কপালে চোখ উঠবে। কেউ কেউ মনে করবেন হয়তো ছাপার ভুল, ওটা আট কিংবা পাঁচ হবে। কিন্তু বাস্তব সত্য হোল দুশো পঁচাশিটি ভাগে দেশকে ভাগ করে বৃটিশ চলে গিয়েছিল তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে।

জিন্নাহ সাহেব চেয়েছিলেন হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান এমনভাবে ভাগ হবে যেন সমান সমান হয়। এই সম্বন্ধে পশ্চিমবাংলার শীর্ষস্থানীয় তাথ্যিক লেখক প্রাক্তন জেলাশাসক ও বিচারপতি শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, "ওদিকে কায়েদ আজম ঝিনা সাহেবের পলিসি কিন্তু তার বিপরীত। তিনি যা চান তা হচ্ছে হিন্দু মুসলমান এই দুই 'নেশনে'র মধ্যে বিভক্ত হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান। দুই দিকের পাল্লা সমান ভারি হবে। একদিকে বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার আর ওড়িশা। অন্যদিকে বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর বেলুচিস্তান। এদিকেও ছয়, ওদিকেও ছয়, সমান সমান।" [নন্দন, ১৪০৬ শারদ সংখ্যা, পৃ. ১৩-১৪]

সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার কংগ্রেস শতবর্ষ (১৮৮৫ - ১৯৮৫) সংখ্যায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠিত প্রখ্যাত বাঙালি নেতা ও তাথ্যিক লেখক শ্রী অতুল্য ঘোষ যে লেখাটি লিখে গেছেন উদ্ধৃতি হিসাবে তার ক্ষুদ্রাংশ উল্লেখ করছি। লেখাটির শিরোনাম 'ভারত বিভাগ (কার্য ও কারণ)'।

প্রসঙ্গ পুরনো হলেও বলতে হচ্ছে, সাধারণত আমরা শিখি বা শেখাই দেশভাগের জন্য দায়ী মুসলিম লীগ-এর নেতা জিন্নাহ। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি বেচারারা নির্দোষ। তাঁদের মনের বিরুদ্ধে হলেও দেশভাগ তাঁরা নাকি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। উপরোক্ত কংগ্রেস নেতা শ্রী অতুল্য ঘোষ জানতেন যে মুসলিম লীগ সৃষ্টি হয়েছে ১৯০৬-এ। তখন দেশবিভাগের কথা তাঁদের মাথায় ছিল না। তাই তিনি লিখেছেন, "ভারতবর্ষের

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতবর্ষকে ভাগ করতে হবে এ কথা মুসলিম লীগ সৃষ্টির পরেও বহুদিন ধারণার বাইরে ছিল। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে মুসলিম লীগ প্রথম তাদের দেশ বিভাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করে।" [পৃ. ১৩২]

অতুল্য ঘোষ আরও লিখেছেন, "কিন্তু কংগ্রেস ভারত বিভাগে সম্মতি দেওয়ার ঢের আগে ১৯৪০-'৪১ সালে যখন রাশিয়া যুদ্ধে যোগদান করল সেই সময়ে C.P.I. (তখন অবিভক্ত C.P.I.) বোম্বাই থেকে প্রকাশিততাঁদের 'People War' কাগজে ভারতবিভাগ যে হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেন। এবং ম্যাপে ভারতবর্ষের কোন অংশ কোথায় যাবে তাও এঁকে দেন। ঐ ম্যাপে ভারত বিভাগের ফলে ভারতের যে অংশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান দেখানো হয়েছিল।" [পৃ. ১২৫]। ম্যাপ দুটি 'দেশ' পত্রিকার ঐ সংখ্যায় ১২৮ ও ১৩১ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মিঃ ঘোষ আরও লিখেছেন, "ভারতীয় জনসঙ্ঘের স্রষ্টা শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদবাবু বহু জায়গায় ভারত বিভাগের স্বপক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এটা সত্য যে কংগ্রেসও এ ব্যাপারে দায়ী এবং কংগ্রেস তা অস্বীকার করে না। অথচ অপর সব দলই জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য ক্রমে ক্রমে সরে এসে কংগ্রেসের ঘাড়েই দোষ চাপায়।" [পৃ. ১৩০] এরপর মিঃ ঘোষ লিখেছেন, "অর্থাৎ ইংরেজ যাবার সময় শুধু ভারতবর্ষ দুভাগ করে গেল, তা নয়, বহুভাগে ভাগ করে গেল। ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে স্বাধীনতার জন্য, এটা ভুল। কেবলমাত্র হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান হয় নি। ২৮১টি Native States যা প্রিভি পাস পেত, ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্ব অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের চুক্তির জন্য তারা সব স্বাধীন হয়। অর্থাৎ—

১) দেশীয় রাজ্য	২৮১
২) হিন্দুস্থান	১
৩) পাকিস্তান	১
মোট	২৮৩

এইভাবে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়। এছাড়া ফরাসী অধিকৃতও পর্তুগীজ অধিকৃত রাজ্য ছিল। অর্থাৎ মোট ভারতবর্ষ ২৮১, হিন্দুস্থান ১, পাকিস্তান ১, পর্তুগীজ এবং ফরাসী অধিকৃত ২টি— মোট ২৮৫টি ভাগে ভাগ হয়েছিল, সেইজন্য যে বলা হয় ভারতবর্ষ দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়েছিল, তা ভুল। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ ২৮৫ খণ্ডে বিভক্ত হয়।" [পৃ. ১৩০]

পাকিস্তানের ভাগে যে জায়গাটুকু পড়েছিল তা ৪,৪২,৫৯৬ বর্গমাইল। তা থেকে এখন আবার নতুন দেশ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ। পাকিস্তান হিন্দুস্থান ছাড়া হিন্দু ও মুসলমান যে সমস্ত স্বাধীন রাজা তাঁদের রাজ্য নিয়ে ছিলেন সেই সম্বন্ধেও মিঃ ঘোষ

লিখেছেন, "ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষ ত্যাগ করার আগে দেশীয় রাজাদের ডেকে বলেছিলেন যে, তারা প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ সরকারের অধীন, ভারত সরকারের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। ইংরেজ ভারত ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা স্বাধীন।" [পৃ. ১৩০]

ভারতবর্ষে যে সমস্ত স্বাধীন রাজ্য ছিল সেইসব রাজ্যের হিন্দু মুসলমান রাজারা নিজ নিজ রাজ্যের রাজা ছিলেন। প্রথম খণ্ডে এবং এই খণ্ডে যে সব রাজা মহারাজা জমিদার বা জমিনদারদের ইতিহাস লেখা হয়েছে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে রাজা ছিলেন না। এইসব স্বাধীন রাজা, নবাব ও শাসকদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাতশত। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ এক এক করে গ্রাস করে নিয়েছিল অনেককে। ১৯৪৭ সালে তাদের চলে যাওয়ার প্রাক্কালে তখনো অস্তিত্ব ছিল দুশো আশিটির বেশি ঐ ধরনের রাজ্য বা এলাকার। ওগুলোকে বলা হোত করদ বা মিত্র রাজ্য। এ সম্বন্ধে নূতন বাঙ্গালা অভিধানের ১৪২৬ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিটি উল্লেখযোগ্য ঃ "করদ ও মিত্ররাজ্য— ভারতের ইংরাজাধীন সামন্ত রাজ্য। এই সমস্ত রাজ্যের রাজাগণ স্বয়ং নিজ নিজ আইন অনুসারে রাজ্য শাসন করিতেন। ইংরাজ গভর্নমেন্টকে ইহাদের কর দিতে হইত; একজন করিয়া ইংরাজ রাজকর্মচারী ইহাদের সভায় থাকিতেন। ভারতে কমবেশী সাত শত ঐরূপ রাজ্য ছিল। নিম্নে প্রধান প্রধান কতকগুলির নাম দেওয়া হইল; যথা— ভূপাল, ইন্দোর, ময়ূরভঞ্জ, বরোদা, ছোট উদয়পুর, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, কপূরতলা, পাতিয়ালা, ভরতপুর, জয়পুর, উদয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, সিকিম, কুচবিহার, মণিপুর, ত্রিপুরা, কার্শী, আলোয়ার, দেওয়াস। এইসব রাজ্যের আর পৃথক কোন অস্তিত্ব নাই।"

কিরণশঙ্কর রায়

এসব ইতিহাস লুকিয়ে রাখার কোন কারণ নেই। আমরা ২৮৩টি অংশকে ভারতের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে পেরেছি। নিঃসন্দেহে এটা আমাদের রাজনৈতিক বিজয়। পাকিস্তানের জিন্নাহ সমান সমান অংশ দাবী করেও যা পেয়েছিলেন আমরা কিন্তু ভারতের মানচিত্রে তার চেয়েও বেশি এবং বিরাট অংশ বাড়িয়ে ফেলেছি। এটাকে কেউ যদি আগ্রাসন, অত্যাচার অথবা আন্তর্জাতিক নীতিভঙ্গ বলেন তাতে আমাদের কী এসে যায়? শ্রী অতুল্য ঘোষের কথা দিয়ে শেষ করছি এই প্রসঙ্গ, "স্বাধীনোত্তর ভারতের আয়তন লক্ষাধিক বর্গমাইল বেড়েছে। ... কংগ্রেসের পক্ষে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অত্যন্ত ধৈর্য্য

সাহসিকতা ও কুশলতার জন্য দেশীয় রাজ্যগুলি একে একে ভারতভুক্ত হয়।" [দেশ, ঐ, পৃ. ১৩০]

বঙ্গদেশকে কেটে ভাগাভাগি করা হোল। যাঁরা বঙ্গকে ভঙ্গ না করে পৃথক ও স্বতন্ত্র রাখতে চেয়েছিলেন, যাঁদের অপ্রকাশিত কল্পনা ছিল বৃহৎ বঙ্গ সৃষ্টির— যাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যার বিশাল এক অংশ এবং বিহারের দুমকা কাটিহার সিংভূম মানভূম এবং সমগ্র ত্রিপুরা প্রদেশের বিশাল এই বাংলাভাষী এলাকাকে নিয়ে গড়ে তুলবেন এক নতুন বঙ্গ —তাঁদের অবদান চাপা থেকেই গেল। যাঁরা এটা চেয়েছিলেন তাঁরা হলেন গান্ধী-শিষ্য সোহরাবর্দী, কিরণশঙ্কর, ফজলুল হক, সৈয়দ আবুল হাশিম প্রমুখ প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দ। তাঁরা এবং তাঁদের এই চিন্তাভাবনা চাপা পড়ে গেল কেন এ প্রশ্নেরও কোন উত্তর নেই।

হাসান সোহরাবর্দী

ইংরেজের আমলে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীকে বঞ্চিত রেখে বৃটিশ যে গোষ্ঠীটিকে বেছে নিয়েছিল সেই 'এলিট' শ্রেণী বা অভিজাত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। নিজেদের পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি ঘটাতে যা যা করা সম্ভব সবই করেছিলেন তাঁরা। ইংরেজদের সীমাহীন প্রশংসা করা সেইসঙ্গে প্রাক্তন শাসক বা মুসলিম জাতির সীমাহীন অসত্য ইতিহাস সৃষ্টির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তখন। বৃটিশ জানতো যে, ভারতে মুসলমান শাসকদের আগমনের পূর্বেই কিছু মুসলিম তাপস বোযর্গ সুফী উলামা এসে পৌঁছেছিলেন এখানে। আবার ঐ শাসকদের সঙ্গে এবং পরেও এসেছিলেন অনেক সুফী এবং উলামা এবং সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। ডক্টর আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও লিখেছেন, "তুর্কি বিজেতাদের সঙ্গে সঙ্গেই, এমনকি কোথাও কোথাও তাদের সশস্ত্র অভিযানের পূর্বেই ভারতবর্ষে কতকগুলি সুফী সাধক আর সাধু ফকীর দরবেশ আর কলন্দর এসে দেখা দিলেন। এঁদের মধ্যে খুব নামী আর যথার্থ উঁচু দরের, যাকে হিন্দিতে বলে 'পহুঁচে হুএ' অর্থাৎ উপলব্ধিযুক্ত সাধকও অনেকে ছিলেন। ... মুসলমান তুর্কদের দ্বারা উত্তরভারতে বিজয়ের পরে, এঁরা এদেশে আসবার সুযোগ বেশি করে পেতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে একদলের সত্যকার আধ্যাত্মিক শক্তি আর সততা, এঁদের প্রচারিত উদার সুফীমতের ইসলাম ভারতের অনুসন্ধানী চিত্তকে জয় করতে

সমর্থ হয়েছিল।" [দ্রষ্টব্য ভারত সংস্কৃতি ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৬৪, পৃ. ১৩৮-৩৯]

মুসলিম জাতির ঐ তাপস সুফী সাধক ও মনীষীদের কথা স্মরণ রেখেই কি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নতুন ইতিহাসে কিছু ঋষি মহাঋষি, মহারাজ, গুরুজী, স্বামীজী তৈরি করার প্রয়োজন হয়েছিল ? দুঃখের বিষয়, পূর্ব আলোচনায় আমরা তাঁদের ইতিহাস খুঁজে যা পেয়েছি তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন গোঁড়া মুসলমান বিদ্বেষী এবং অনুন্নত মানুষদের উন্নতি বিরোধী। তার চেয়েও বড় কথা, তাঁরা বেশিরভাগই ছিলেন বৃটিশের অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী। আজও ভারতে ঐ তাপস, বোযর্গ, আলেম, মুয়াল্লেম ও মুবাল্লেগশ্রেণী বিদ্যমান। তাঁদের মধ্যে কিছু পদস্খলিত নকল ও ভণ্ড যে নেই তা নয়। দেশ বিভাগের পূর্বে এই মুসলিম 'ক্রীম' সাধক শ্রেণীটি দুভাগে বিভক্ত হয়েছিলেন। একটি দল চেয়েছিলেন অবিভক্ত ভারত, অপর দলটি চেয়েছিলেন বিভক্ত ভারত বা পাকিস্তান। যাঁরা পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন থানাভবনের মাওলানা আশরাফ আলী (রহঃ)। তাঁদের যুক্তি ছিল, মুসলমানদের নিজস্ব দেশ হলে তাঁরা ইসলাম ধর্ম পুরোপুরি পালন করতে পারবেন, বাধা পাবেন না সংখ্যাগুরুদের কাছ থেকে, আর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাহিত্যিক, শিল্পী প্রভৃতি তৈরি হতে বা উপরে উঠতে চাপ সহ্য করতে হবে না তাঁদের। অপর বৃহত্তম দলটি চেয়েছিলেন অবিভক্ত ভারতে সকলে মিলেমিশে বাস করবেন তাঁরা, তাঁদের মসজিদ, মাদরাসা, আঞ্জুমান সবই বজায় রাখতে পারবেন, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া বা উপযুক্ত হয়ে চাকরি পেতে বা প্রতিষ্ঠিত হতেও বাধা থাকবে না কিছু। পাকিস্তানের সমর্থকেরা চলে গেলেন সেখানে, আর অপর বড় দলটি থেকে গেলেন এখানে।

শের-এ বাংলা ফজলুল হক

ভারত ও বহির্ভারতের এই ধার্মিক উভয় দলই ছিলেন কিন্তু প্রচণ্ড বৃটিশ বিরোধী। তাঁরা ছিলেন সংসারী, বৈরাগ্যে বিশ্বাস ছিলনা তাঁদের। প্রয়োজনে তাঁরা বিবাহ করেছিলেন এক বা একাধিক। কিন্তু স্ত্রী ছাড়া কোন মহিলা বন্ধু, মহিলা সহযোগী, মহিলা রাজনৈতিক কর্মী কাউকেই তাঁদের আশ্রম খানকাহ বা আস্তানায় একান্ত সঙ্গলাভের সুযোগ দেন নি।

ইসলাম ধর্মে চারটি বিয়ে করার আদেশ আদৌ নেই, প্রয়োজনে অনুমোদন আছে মাত্র। তা সত্ত্বেও মুসলমান সমাজের প্রতি এই ধারণা ও প্রচার ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এমনভাবে যে, সব মুসলমানেরই যেন চারটে করে স্ত্রী আছে। কারণে অকারণে দু-এক লক্ষ লোকের মধ্যে দু-একজন যদি চারটে বিয়ে করেই থাকেন তার জন্য প্রত্যেকটি মুসলমানকে ঐ অভিযোগে অভিযুক্ত না করে তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন স্বীকার করে নিলে ক্ষতি কী ছিল ? যেমন আমাদের ভারতে প্রচারিত 'জাতির জনক' গান্ধীজীর পিতা কাবা গান্ধী চারজন স্ত্রীর স্বামী ছিলেন। গান্ধীজী তাঁর পিতার চতুর্থ স্ত্রীর চতুর্থ বা শেষ সন্তান। [দ্রঃ 'পশ্চিমবঙ্গ' গান্ধী সংখ্যা, পৃ. ১৩২]

আশরাফ আলি থানভী

কারও নামে ঋষি, মুনি, অবতার, মহামানব প্রভৃতি উপাধি জুড়ে দেওয়া সহজ, কিন্তু তাঁরা সত্যিকারের ঐ উপাধির উপযুক্ত কিনা তা বিবেচ্য বিষয়। ঋষি বঙ্কিম ঋষি অরবিন্দ ও মহা-ঋষি দেবেন্দ্রনাথদের সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা, সন্ত্রাসবাদ অথবা তাঁদের মহানুভবতা ও উদারতার আলোচনা পূর্বেই হয়ে গেছে। এঁরা ছাড়াও ভারতের বরণীয় ব্যক্তিদের ধরলে গান্ধীজী, জওহরলাল প্রভৃতি নেতাদের নারীর প্রতি আসক্তি বা মহিলাদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার উদারতায় তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন বিশ্বাসী।

মুসলিম সমাজের ঋষিপ্রতিম মানুষদের বলা হয় বুযুর্গ, ওলি, আউলিয়া, কুতুব, আবেদ, দরবেশ, পীর প্রভৃতি। আজমীরের হযরত খাজা মইনুদ্দিন, দিল্লির হযরত নিযামুদ্দিন, হযরত কুতুবুদ্দিন কাকী, হযরত ইলিয়াস, হযরত আহমাদ শিরহিন্দী, হযরত ইমদাদুল্লাহ, হযরত রশীদ আহমাদ, হযরত আশরাফ আলী, হযরত হুসাইন আহমাদ, শাহ ইসমাঈল, হযরত বাহাউদ্দিন যাকারিয়া, হযরত হুসামুদ্দিন, হযরত সৈয়দ আব্বাস, হযরত শাহ মাহমুদ, হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত শাহ সুফী সুলতান, হযরত আব্দুল হামিদ বাঙালী, হযরত সাইয়েদুল আরেফীন (রহ.) প্রমুখ বহু ভারতীয় মুসলমান ঋষির কবর ভারতেই রয়েছে।

ভারত ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে আছে এই রকম মুসলিম ঋষিদের কীর্তি। তাঁদের মধ্যে হযরত মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানী, হযরত শাইখ সাদী, হযরত জালালুদ্দিন রুমী, হযরত আবুসিনা, হযরত ফিরদৌসী, হযরত শাহ জালাল (রহ.)

প্রভৃতিদের সকলেই নারীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা, নারীদের সেবা শুশ্রূষা নেওয়া বা শিষ্যা হওয়ার অজুহাতে তাঁদের একান্তে ব্যবহার করা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতেন।

জালাল উদ্দীন রুমী

প্রচার ও অপপ্রচারের এমনই মহিমা যে, এইসব মুসলিম মহামনীষীদেরকে ভারতের শত্রু, পঞ্চম বাহিনী বা গুপ্তচর প্রভৃতি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই অভিযোগগুলো যে অসত্য, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া হয়েছে 'চেপে রাখা ইতিহাসে'।

নানা জাতির এই ভারতে ঐ সমস্ত মুসলিম ঋষিদের পরলোকগমনের পরেও তাঁদের কবরস্তানগুলো হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল এবং আজও তা অব্যাহত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দিল্লির হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া, আজমীরের হযরত মইনুদ্দিন চিশ্‌তী, মঙ্গলকোটের আব্দুল হামিদ বাঙালী, বীরভূমের আব্দুল্লাহ কিরমানী, ঘুটিয়ারির শরীফ শাহ গাজী, হাড়োয়ার আব্বাস সাহেবদের কবরস্তানগুলো আজও প্রমাণ করছে যে, মুসলিম ভক্তের চেয়ে হিন্দু ভক্তের সংখ্যা অল্প নয়। তাঁরা সঙ্কীর্ণমনা বা সাম্প্রদায়িক হলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষরা তাঁদের শ্রদ্ধা না জানিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতেন নিঃসন্দেহে।

মুসলিম জাতির কোরআন ও হাদীস সম্বলিত ইসলাম ধর্মটি নিরপেক্ষ মনীষীদের মতে একটি বিজ্ঞানসম্মত, সার্বজনীন এবং আকর্ষণীয় ধর্ম। সেই জন্যই আজও পূর্ণ শিক্ষিত, পণ্ডিত, গবেষক ও চিন্তবিদেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেই চলেছেন।

সারা বিশ্বে সভ্যতা শক্তি ও সঙ্গতির চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে আমেরিকা। সেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন বা করছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে বিশ্বের বিস্ময়। যেমন বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী মিঃ আলেকজান্ডার রাসেল ওয়েব (নতুন নাম মুহাম্মদ), বিজ্ঞানী মিঃ নীল আর্মস্ট্রং, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ ব্লাংকিনশিপ (নতুন নাম খালিদ), বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ মিঃ মের্জ ডালীন প্রমুখ। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী মিঃ জোরার্ড ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নতুন নাম নিলেন ইব্রাহিম জোরার্ড।

আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন, বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ক্রীড়াবিদ মিঃ ক্যাসইয়াস ক্লে-র ইসলাম গ্রহণের পর নতুন নাম হয় মুহাম্মদ আলী।

আর এক মুষ্টিযোদ্ধা চ্যাম্পিয়ন মাইক টাইসনও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নতুন নাম হয় আব্দুল আজিজ। উচ্চশিক্ষিত না হলেও ক্রীড়াজগতে এঁরা বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব।

মিঃ ম্যালকম এক্স-এর ইসলাম গ্রহণের পর নাম হয় মালিক আল-শাবায। আমেরিকার রাজনৈতিক নেতা মিঃ র‍্যাপব্রাউন ইসলাম গ্রহণ করে নতুন নাম নিলেন জামিল আব্দুল্লাহ আল-আমীন। প্রখ্যাত মার্কিন মহিলা ডাক্তার মিস মারিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আমেরিকার সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মিঃ মার্ক এন্টনিও ওটারস্ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাম নিলেন আব্দুস সালাম আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ। ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যাথলিক নান্ মিসেস ফিন মারিয়া মুসলমান হয়ে নাম নেন আমিনা মরিয়ম।

শাইখ সা'দী

মিশিগান ইউনিভার্সিটির ছাত্রী মিস সুরাইয়া ইসলামে মহিলাদের অধিকারের কথা পড়ে মুসলমান হন ১৯৯০-এ। ঐ দেশের বিখ্যাত চিকিৎসক ডঃ ভ্যান কব মুসলমান হয়ে নাম নেন ডঃ যায়েদ ভ্যান কব। আমেরিকার মহাকাশ বিজ্ঞানী মিঃ জেমস অরউইনও ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি চাঁদে যান ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে। বিখ্যাত খোলোয়াড় মিঃ ক্রিস জ্যাকসন ১৯৯১-এ মুসলমান হয়ে নাম গ্রহণ করেন মাহমুদ আব্দুর রউফ। টেক্সাসের মেয়র চার্লস এডওয়ার্ড জেনকিন্স মুসলমান হয়ে নাম নেন চার্লস মুসতাফা বিলাল। আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরো সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক মুসলমান হন এবং নতুন নাম হয় ডক্টর আইউব খাঁন উমাইয়া। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মিস এমিলি মুসলমান হয়ে নাম গ্রহণ করেন হাজেরা।

আমেরিকার মিঃ টমাস ক্লেটন মুসলমান হয়ে নাম নেন মুহাম্মাদ। ঐ দেশেরই মিঃ রোনাল্ড স্লোলিং ইসলাম গ্রহণের পর নাম নেন আসকিয়া মুহাম্মাদ তাওরী। মিঃ ট্যাভেটাসও মুসলমান হন এবং নাম হয় আব্দুর রশীদ।

নিউইয়র্ক পোস্ট অথরিটির যে মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর নতুন নাম হয় সাদীয়া মুহাম্মাদ। আমেরিকার মিস ফিলিপও মুসলমান হন এবং নতুন নাম হয় হাদিয়া ফিলিপ।

সে দেশের আইভি লীগ ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত মেধাবী ছাত্র ইসলাম গ্রহণ করে নাম নেন্ উমার ফারুক আব্দুল্লাহ।

আবু সিনা

টেক্সাসের অধিবাসী মিঃ ডাঙ্কে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে নাম হয় উসমান ডাঙ্কে। আমেরিকার সেনা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মিঃ ডেভিড ফ্রীম্যান ইসলাম গ্রহণ করে নতুন নাম নেন্ দাউদ। ঐ দেশের সেনাবিভাগের আর একজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাম নেন ইদরীস খাঁন। সৈন্য বিভাগের আরও একজন মুসলমান হন, তাঁর নতুন নাম হয় আব্দুর রহমান।

এমনিভাবে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী মিঃ রোনাল্ড রেসিক, মিস হেলমা রেসিক, এডোয়ার্ড আলকক, এসথার এম. গিল, মিসেস সুগরা আহমেদ, মিঃ লিওনার্দ কুক্, লিউইস অরভিস হাসান ইভান্স, পি. ই. সাইদ চিপারফিল্ড, অধ্যাপক হারুন মুসতাফা লিওন, প্রখ্যাত গ্রন্থকার উইলিয়ম বার্চেল পিকার্ড, স্যার জালালুদ্দিন লডার ব্রান্টন, স্যার চার্লস এডোয়ার্ড আর্চিবল্ড হ্যামিলটন, অধ্যাপক ডঃ বারবারা নেলসন, লর্ড ওয়ার্সলে, অধ্যাপক ইয়াকুব জ্যাকি, ইঞ্জিনিয়ার ডেভিড মার্ক প্যাডকক্, শ্রমিক নেতা জন ট্রাসকাট, নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী বিদুষী মহিলা মিসেস সান্থা, ওকিং স্পিরিচুয়ালিস্টচার্চের প্রেসিডেন্ট জর্জ এডওয়ার্ড ফাউলার, মিঃ জে. ডব্লিউ লাভগ্রোভ, মিঃ উইলিয়াম ওয়াল্টার, লন্ডনের মুসলিম মহিলা সমিতির নেত্রী মিসেস আয়েশা জান, মিস ব্রিডা কনভয়, মিঃ রশীদ শার্প, মিসেস মেভিস জলি, মিঃ জন ফিশার, মিঃ উসমান ওয়াটকিন্স, মিঃ আব্দুল্লাহ কার্ডেল রায়ান, মিসেস বুকনান হ্যামিলটন, মিসেস আমিনা, মিসেস জে. ফ্লিশার নাসিম, বিখ্যাত গায়ক মিঃ ক্যাটস স্টিভেন্স, বিজ্ঞানী ডঃ আর্থার এলিসন, মিঃ ডেরেক হাওয়ার্ড স্মিথ এবং তাঁর স্ত্রী, কর্নেল আলবার্ট রেমস, লর্ড হেডলি স্যার রোনাল্ড জর্জ এলানসন, বৃটিশ সেনানায়ক মেজর আব্দুল্লাহ বাটারসবে, বৃটিশ নৌবাহিনীর নেতা এইচ. এফ. ফেলোস, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল্লাহ বেইনস হিউইট, মিঃ জামিল প্লান্ট, ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের অফিসার উচ্চশিক্ষিত মিঃ ইসমাঈল ডি ইয়র্ক, মিঃ বি. ডেভিস, বিখ্যাত বৃটিশ লেখক মিঃ এ. কীন, বুদ্ধিজীবী মিঃ ডেভিড কাওয়ান, ইংলিশ মুসলিম মিশনের সভাপতি জন ওয়েবস্টার, মিসেস জেমিমা গোল্ডস্মিথ, মিঃ আহমাদ সেইগ এবং তাঁর স্ত্রী মিসেস

আসমা সেইগ, মিঃ হাসান জি. ইয়াটন, মিঃ ইবরাহীম হিউয়েট, মিঃ এ. রশীদ স্কিনার, মিঃ আহমাদ বুলক, মিঃ হুসেন রফি, মিসেস যয়নাব সেবাই, ক্যাথলিক নেত্রী মিসেস বুশরা, মিসেস সিলভিয়া সালমা কোহেন, লেডি ইভেলিন কোবল্ড, মিসেস বাশীরা ওয়েন, মিসেস রহিমা গ্রিফিথ, মিসেস আলিয়া হাইরি, মিসেস প্যাট্রিসিয়া প্যারী, মিঃ আব্দুল্লাহ মেইনার্ড, মিঃ পি. রবিনসন প্রমুখ সকলেই গ্রেট ব্রিটেনের সাহেব মেমের দল যাঁরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম ধর্ম।

ফিরদৌসী

ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক অধ্যাপক হেনরী স্প্রোগ, বিশ্বজয়ী বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, বিজ্ঞানী ডঃ মরিস বুকাইলি, বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী কডকিভিচ, দার্শনিক অধ্যাপক ইভা দ্য ভিত্রে মেয়েরোভিন, প্রফেসর এস. হারগ্রোঞ্জ, ক্যাথলিক পাদ্রী মাইকেল লেলং— এঁরা সকলেই ফ্রান্সের বাছাইকরা ইতিহাস প্রসিদ্ধ মানুষ, যাঁরা বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম ধর্ম।

আব্দুর রহমান রসলার, মিসেস আনা, প্রখ্যাত কূটনীতিবিদ মহম্মদ আমান হবম, বিজ্ঞানী ও গ্রন্থকার ডক্টর হামিদ মার্কাস, মিসেস মসলার, মিসেস এ্যানলিস উইলডেন, রাষ্ট্রদূত ডক্টর আলফ্রেড হফম্যান— এঁরা সকলেই জার্মানির স্বনামধন্য ব্যক্তি যাঁরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন সানন্দে।

চীনের চেম্বার অব কমার্সের সদস্য মিঃ এন. এম. বি. রিযওয়ান, সে দেশের বিখ্যাত পত্রিকা নান্ ইয়াং সিয়াং পো-র সাংবাদিক মিঃ আদনান সেং, জোহো-র বিখ্যাত মিডল স্কুলের অধ্যক্ষ এবং চেম্বার অব কমার্সের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ লুকমান ইয়াংটক, কেদাত-এর বিশাল শিক্ষায়তনের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ রাফিয়ান চাও, প্রখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ ফারুক চিয়াহ, মিস মিনিরা চো, শিক্ষাবিদ জালালুদ্দিন হো— এরকম অনেক চীনবাসী মুসলমান হয়েছেন এবং আজও হচ্ছেন সাগ্রহে।

সাংবাদিক মিতসুতারো ইয়ামাওকা, বুমপাচিরো অ্যারিজা, কূটনীতিবীদ কোতাকা কান্দো, মন্ত্রী জোশিরো কুমিয়ানা, বিখ্যাত চিকিৎসক ডঃ শাওকী ফুতাফী, ডাঃ হিরু ফুজিমাসু, সুলাইমান তাকিউচি, আব্দুল্লাহ উমুরা প্রমুখ জাপানের মনীষীবৃন্দ ইসলাম গ্রহণ করেছেন স্বেচ্ছায়।

প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী মিঃ জোহানেস এনথনিয়াস হির্হটজ, মিঃ ফেডারিক ফার্দিনান্দ ক্লোভিনিয়ার্স. বিজ্ঞানী অধ্যাপক আর. এল. মেলামা, জে. এল. সি. বীটেম, মিঃ ওভারিং এবং ফাইসাল ডব্লিউ ওয়াগনার হলেন হল্যাণ্ডের বিখ্যাত সব ব্যক্তি। তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই।

সাঈদ চিপারফিল্ড

ফিলিপাইনের অধ্যাপক ঈসা ম্যাকলালেদ, খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক সালেহ আল সুলাইমান, ডঃ দীলু সানটোস্, মিঃ আসারি ট্রো, ফয়সল পল, মিসেস মারিয়াম লোপস এবং মিসেস গ্লোরিয়া মুসলমান হয়েছেন সানন্দে।

এমনিভাবে অস্ট্রেলিয়ার মিঃ ডেনিসন এমিল ওয়ারিংটন-ফ্রাই, মিসেস সিসিলিয়া কেনোলি, বুদ্ধিজীবী মিঃ স্টুয়ার্ট এবং মিসেস হালিমা শোয়ার্ট ইসলাম ধর্মকে ভালবেসে গ্রহণ করেছেন।

সুইডেনের মিঃ গানার এরিকসন এবং মিঃ মুহাম্মাদ কুনুতও ইসলাম গ্রহণ করেন স্বেচ্ছায়।

সুইজারল্যাণ্ডের মিসেস ডি. বোয়েরকি মুসলমান হলে নাম হয় যায়নাব। হাঙ্গেরীর অধ্যাপক ডক্টর জুলিয়াস জার্মানাস, আর্জেন্টিনার খৃষ্টান প্রেসিডেন্ট-পুত্র কার্লোস মুনেম, আয়ার্ল্যাণ্ডের মিসেস এলিজাবেথ সাফারন, জয়েস ইয়াসমিন স্কট এবং থাইল্যাণ্ডের শ্রেং তামসীও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন বিনা প্ররোচনায়।

ইতালির প্রখ্যাত আইনবিদ মিসেস রবার্টা তিন বছর ধরে অনেক ধর্মগ্রন্থ পড়ে তুলনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ইসলাম গ্রহণ করার। তারপর লন্ডনের ইসলামী সেন্টারে স্বয়ং এসে ইসলাম গ্রহণ করেন ঐ মহিলা।

পোল্যান্ডের উইসল জেজরস্কি ইসলাম গ্রহণ করে ইসমাঈল নাম গ্রহণ করেন।

রাশিয়ার মিঃ নিকোলাই ও মিঃ ভ্যালেন্তিন চোদ্দ বছর ধরে রুশ সেনা অফিসার হিসাবে শত্রুদের উপর অত্যাচার অনাচার ও পীড়ন করার পর পরিবর্তন আসে তাঁদের মনে। প্রথম জনের ইসলামী নাম হয় নসরতউল্লাহ আর দ্বিতীয়জনের নাম হয় হেদায়েতউল্লাহ।

রাশিয়ার শিক্ষিত যুবতী সভেলি কোভালেঙ্কো নানা ধর্মের উপর পড়াশোনা ও গবেষণা

আলেকজাণ্ডার রাসেল ওয়েব

এডওয়ার্ড আলকক

ডেরেক হাওয়ার্ড স্মিথ
এবং তাঁর স্ত্রী

লিউইস অরভিস হাসান ইভান্স

করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন ইসলাম গ্রহণ করার। আর নিজের জন্য ইসলামী নাম পছন্দ করলেন ফাতিমা।

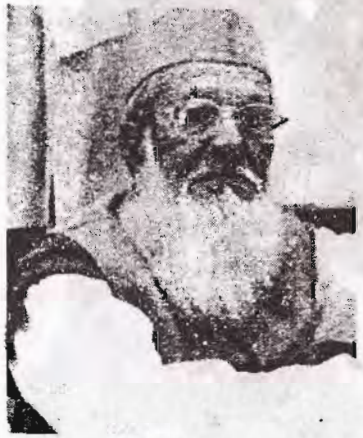

আবুল হাসান আলী নদভী

মিঃ আলকভ ফেব্রি একজন নাস্তিক। সৈয়দ আবুল আ'লা মওদুদীর লেখা সুদ বিষয়ক মূল্যবান তত্ত্বপূর্ণ বইটি পড়ে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই সময় ইউক্রেনীয় ভাষায় কোরআন চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মুসলিম লেখকদের বই পড়া নিষিদ্ধ ছিল না। সুতরাং বিভিন্ন লেখকের নানা বইয়ের মধ্যে কোরআনের অনেকখানি তিনি পেয়ে যান আর মুগ্ধ হয়ে যান ঐ নতুন প্রাপ্তিতে। তাঁর আগ্রহ বেড়ে যায় এবং ইসলাম গ্রহণ করে নতুন নাম নেন উবাইদুল্লাহ।

কোরআন এবং হাদীসকে অবলম্বন করে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা পড়ে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর বইও পৃথিবীর বহু উচ্চশিক্ষিত মানুষকে প্রভাবিত করেছে এবং অনেক চিন্তাভাবনার পর তাঁরাও গ্রহণ করেছেন ইসলাম ধর্ম।

বাংলাদেশের ঢাকার আশুপ্রকাশ দাশগুপ্ত ইসলাম গ্রহণ করে নাম নিয়েছেন সিরাজুল ইসলাম। অধ্যাপক মাখনলাল ধর হিন্দুধর্ম থেকে খৃষ্টান ধর্মে আসেন। পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার। বাড়ী ফরিদপুর। নতুন নাম হয় নুরুদ্দিন আলমগীর। তাছাড়া চট্টগ্রামের শ্রী প্রতাপ চন্দ্র সেন, পাবনা জেলার সন্ন্যাসী শ্রী মাধুশাহ, সুনামগঞ্জের শ্রী কৃষ্ণ দাস, শ্রী রমেশচন্দ্র, ফরিদপুরের বিখ্যাত গ্রন্থকার শ্রী সুদর্শন ভট্টাচার্য, শ্রী সুরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রী মানবেন্দ্র রায় প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এবং প্রত্যেকেই নেন্ নতুন ইসলামী নাম।

পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির অধিবাসী খৃষ্টান মিঃ জেমস মাইকেল আহমাদ নাম নিয়ে মুসলমান হয়েছেন স্বেচ্ছায়। লাহোরের জৈন ধর্মাবলম্বী বিখ্যাত ব্যারিষ্টার লোসা সাগর চাঁদ জৈন (বার-এট-ল, লন্ডন) ইসলাম গ্রহণ করার পর নাম নেন মহম্মদ আমিন।

ভারতের ডক্টর শিবশক্তি স্বরূপজী মহারাজ উদাসেনের ইসলামধর্ম গ্রহণ করে ইসলামুল হক নাম গ্রহণ করা এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। তিনি ইলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রি নিয়ে লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আট বছর ধরে গবেষণা

করে পৃথিবীর দশটি বিখ্যাত ধর্মের তুলনামূলক রিসার্চ করে পি-এইচ. ডি. করার পর দেশে ফিরে এসে হিন্দু ধর্মের পণ্ডিতদের কাছ থেকে 'ধর্মাচার্য' উপাধি লাভ করেন। প্রয়াত আচার্য বিনোবা ভাবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার মতে মানুষের জন্য কোন্ ধর্ম শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন?" উত্তরে ডঃ শিবশক্তি বলেন, "আমি জবাবে বলেছিলাম ইসলাম। আমার জবাবে দাদা খুশি হননি।" ডক্টর শিবশক্তি ছিলেন যেমন বিশ্বহিন্দু পরিষদের একজন প্রথম শ্রেণীর নেতৃপুরুষ, তেমনি সমসাময়িক কালের জগদগুরু শঙ্করাচার্য, রামগোপাল শালওয়ালা, পুরীর মহামন্ডলেশ্বর স্বামী, গুরু গোলওয়ালকর, বাবাসাহেব, দেশমুখ বালঠাকরে, অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং আচার্য বিনোবা ভাবের সঙ্গে ছিল তাঁর অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বিপুল অর্থের সম্পদ সম্পত্তি ও ভারতের বৃহত্তম হিন্দু সমাজের পাওয়া সম্মান ও মর্যাদা ত্যাগ করে "বর্তমানে আপনি কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করছেন? তিনি উত্তর দিয়েছেন ইসলামের এই মহান উপহারের বদলে আমি সমগ্র বিশ্বের রাজত্বও ত্যাগ করতে দ্বিধা ও কুণ্ঠাবোধ করতাম না। ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে যে তৃপ্তি আমি পেয়েছি, সাত রাজ্যের ধনসম্পদ লাভ করেও তা পাওয়া সম্ভব নয়।" [আবুল বাশার ঃ কেন মুসলমান হলাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৪-১৫, ১৯৯৯]

ডেনিসন ওরিংটন ফ্রাই

লে. কর্নেল আব্দুল্লাহ হিউইট

ভারতের প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক, লেখিকা এবং স্বীকৃতি পাওয়া ইংরেজি ভাষার কবি, সেই সঙ্গে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার তালিকায় কয়েকবার নমিনেশনপ্রাপ্ত শ্রীমতী মাধবী কুট্টি, যিনি কমলা দাশ বলে পরিচিত, ১৯৯৯-এর ২৩শে ডিসেম্বর তিরুবনন্তপুরমের পালয়ম

মসজিদে অনুষ্ঠান করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। এ ব্যাপারে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য সভাপতি কুম্মনম্ রাজ শেখরনের বক্তব্য, "মাধবী তো কচি খুকি নন্। হিন্দু ধর্ম ছাড়া এবং ফিরে আসার স্বাধীনতা তাঁর আছে।" কথাটা সঙ্ঘ পরিবারের নেতাদের মুখে কিঞ্চিৎ বেমানান। কারণ গরিব দলিতদের এই স্বাধীনতা দিতে তাঁরা নারাজ বলেই লোকের বিশ্বাস।

ডেভিড কাওয়ান

শনিবার সন্ধ্যায় এক আলোচনা সভার উদ্বোধনী ভাষণে মাধবী কুট্টি সবাইকে হতবাক করে দিয়ে ঘোষণা করলেন, আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুরাইয়া হয়েছি।"[দ্রষ্টব্য আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯, পৃ. ৫]

মাধবী কুট্টি বা কমলা দাশ প্রকাশ্যে মুসলমান হওয়ার পূর্বেই ইসলাম ধর্মকে অন্তরে স্থান দিয়েছিলেন এবং দিনে রাতে পাঁচবার নামাজ পড়তেও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। পোষাক পরিচ্ছদেও ইসলামী সভ্যতায় মুড়ে গিয়েছিলেন তিনি। অবাক হওয়া মানুষদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "অতিমাত্রায় স্বাধীনতা ভোগে, বমি করে ক্লান্ত আমি, এখন আল্লাহর গোলাম হয়ে শান্তি পেয়েছি। এর্নাকুলামে কড়াভস্ত্রা পাড়ায় একতলা বাড়ির ফটকে লাগানো নেমপ্লেটে এখন লেখা কমলা সুরাইয়া, কমলা দাশ লেখা প্লেট তুলে ফেলা হয়েছে।"

প্রেমে পড়ে যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন সেগুলো লিখলে ফিরিস্তি খুব লম্বা হয়ে যাবে। যেমন ব্রাহ্মণ কন্যা চিত্রতারকা শর্মিলা ঠাকুরের ক্রিকেটার পতৌদির নবাব মনসুরের সঙ্গে বিবাহ। সঙ্গীত পরিচালক শেখরের পুত্র দিলীপের মুসলমান হয়ে এ. আর. রহমান নাম নেওয়ার মতো ঘটনাও অনস্বীকার্য। [উদ্ধৃতি ও তথ্য আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯, বিক্রমণ নায়ারের প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য]

ভারতের জলন্ধরের পুরুষোত্তম লাল চোপড়া সারা জীবন ধরে পারিবারিক বাধা বিপত্তি ঘাত প্রতিঘাত, সমাজের চোখরাঙানি উপেক্ষা এবং বিশাল ধনসম্পত্তির মমতা প্রত্যাখ্যান করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নতুন নাম নিয়েছেন আব্দুল আজিজ খান জলন্ধরী। তারপর নিজের জীবনীটি লিখেছেন উর্দু ভাষায়। নাম দিয়েছেন 'আন্ধেরে সে রোশনী কি তরফ' অর্থাৎ অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। তিনিও একজন পণ্ডিত মানুষ।

ছিটেফোঁটা এইসব উদাহরণগুলোই সব নয়। দলে দলে পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যেমন মাত্র কয়েকবছর পূর্বে তামিলনাড়ুর মীনাক্ষীপুরমে একসঙ্গে কমবেশি দশ হাজার দলিত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সরকারি বেসরকারি বহু শাসানি, আতঙ্ক, প্রতিশ্রুতি ও প্রলোভন উপেক্ষা করেও তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁদের স্বাতন্ত্র ও গৌরব নিয়ে 'রহমতনগর' সৃষ্টি করে।

আহমাদ সেইগ

জার্মানীর মতো শিক্ষিত ও উন্নত দেশে কোন্ ধর্মে নারীর কতটুকু অধিকার এবং অনধিকার এই নিয়ে দলবদ্ধভাবে সেখানকার সচেতন মহিলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম ধর্ম। তাই দশ হাজার উল্লেখযোগ্য বিদূষী মহিলা, কুমারী বিধবা ও সধবা, সগৌরবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

ইসলাম ধর্ম একটি স্বয়ংসম্পন্ন বিজ্ঞানসম্মত চলমান ধর্ম। এটা জানার পর শিক্ষা, চেতনা এবং সাহস এই তিনটি থাকলেই সমস্ত বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে ইসলাম গ্রহণ করা সম্ভব। আর এগুলোর অভাব থাকলে তা মোটেই সম্ভব নয়। প্রমাণে বলা যেতে পারে যে, মায়ানমার বা বর্মায় মুসলমানদের উপর প্রচন্ড অত্যাচার করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। অত্যাচারের চাপে দলে দলে মুসলমানেরা পালিয়ে গেছেন তাঁদের ভিটেমাটি ছেড়ে। এই অবস্থাতেও বিচারপতি রাউমলিং ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনশে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী মুসলমান হয়েছেন তাঁর হাতে।

আসমা সেইগ

বিশ্বজুড়ে খৃষ্টান ধর্মের প্রচার সংস্থাগুলো বিজ্ঞানসম্মতভাবে সক্রিয় ও পরিপুষ্ট। সাইবেরিয়ায় মুসলমানদের খৃষ্টান করার জন্য

সিলভিয়া সালমা কোহেন

মেজর আব্দুল্লাহ বেটারস্‌বে

এলিজাবেথ সাফারন এবং
জয়েস ইয়াসমিন স্কট

ইসমাঈল ডি ইয়র্ক

অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে ৬৪৫৩ জন পাদ্রী বা ধর্মযাজককে পাঠানো হয়। ঐ পাদ্রীগণ প্রথমে তাদের ভাষা শিখতে গিয়ে তাদের সাহিত্য এবং হজরত মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সঙ্গী দের জীবনী জানতে বাধ্য হন। তখনই নিজেদের মধ্যে তাঁরা আলোচনা করে অনেকেই ইসলাম ধর্ম শ্রেষ্ঠ মনে করে তা গ্রহণ করার কথা বলেন। কয়েকশো গোঁড়া পাদ্রী বাদ দিয়ে বাকী নিরপেক্ষ বিচারশীল পাদ্রীদের কমবেশি ছ'হাজার পাদ্রী গ্রহণ করেন ইসলাম ধর্ম।

জামিল প্লাস্ট

এই প্রসঙ্গে দু-একটি মুসলিম দেশের নাম যদিও করা হোল আরও পঞ্চাশটিরও বেশি যেসব মুসলিম দেশ আছে সে দেশের খৃষ্টান বা অমুসলিমদের ব্যাপকভাবে মুসলমান হবার সংবাদ এজন্যই দেওয়া হচ্ছে না যে, অনেকে মনে করতে পারেন অর্থের লোভে অথবা সরকারি কোন চাপেই হয়তো তাঁরা ধর্মান্তরিত।

বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় ১৯৯৯-এর ২৩শে জানুয়ারি আলোলিকা মুখোপাধ্যায়ের "আমেরিকায় ইসলাম ধর্ম" শিরোনামের গবেষণাপূর্ণ লেখাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, "মাসাচুসেট্‌স্ থেকে ক্যালিফর্নিয়া, আমেরিকার যে প্রান্তেই যাওয়া যাক, কোনও না কোনও শহরে একটি মসজিদ চোখে পড়বে। হয় পুরনো গির্জার নবকলেবর, নয়তো জমি কিনে তৈরি করা নতুন মসজিদ। ...আমেরিকায় ইসলামধর্মের নিঃশব্দ প্রচার ও ধীর প্রসার ক্রমশই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ দেশের প্রায় ছ'মিলিয়নের (৬০ লক্ষ) কাছাকাছি মুসলমান আছেন। ক্রিশ্চান ধর্মের বিভিন্ন শাখা, অর্থাৎ প্রেসবিটেরিয়ানস, এপিসকোপ্যালস এবং মর্মোনসদের চেয়ে মুসলমানদের সংখ্যা ভারী। কোয়েকার্ম

ব্রিডা কনভয়

ইউনিটেভিয়ানস, সেভেনথ্‌ডে-এডেনটিস্টস, মেনোনাইটস, জিহোভাস, উইটনেসেস-এর মতো ক্রিশ্চান সম্প্রদায়কেও আলাদাভাবে ধরলে তারা মুসলমানদের তুলনায় সংখ্যালঘু। ইহুদীরা হচ্ছেন— এদেশে ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু দল। সব শাখা মিলিয়ে ক্রিশ্চানরাই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। আর তার পরেই ইহুদি সম্প্রদায়। ইদানীং শোনা যাচ্ছে, ইসলাম ক্রমশ তার কাছাকাছি পৌঁছতে চলেছে। ... ইদানীং ফ্রান্স, জার্মানী এবং অন্যান্য ইওরোপীয় দেশেও মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। সেখানেও যে প্রশ্নটি মাথা তুলেছে আমেরিকাতেও তার উত্তর খোঁজার সময় এসেছে। ... ইসলামধর্মের সাম্যের বাণীই আমেরিকার বহু মানুষকে ধর্মান্তর গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে। শ্বেতাঙ্গ সমাজে মধ্যবিত্তদের মধ্যে থেকে আশি হাজারেরও বেশি লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এরা পশ্চিম ইওরোপীয় বংশধারার সন্তান।"

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

প্রফেসর হারগ্রোঞ্জ

সিস্টার মেরি ফ্লোলিক ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী কোরআন পড়ে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হলেন। তিনি "ক্রমশ ইসলাম ধর্মের প্রতি আকর্ষণবোধ করলেন এবং ধর্মান্তরিত হলেন নতুন নাম হোল মরিয়ম আগা। এখন তাঁর তিপান্ন বছর বয়স। ইসলামের বাণী তাঁকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।"

"ক্যালিফোর্নিয়ার একসময়কার কংগ্রেসম্যান জিম বেটসের ইসলাম গ্রহণ আরও ঘটনাবহুল। ... তারপর জীবনে নানা ঝড়ঝাপটা এল। পঞ্চাশ বছরে তাঁকে নতুন করে চিন্তা করতে হল কোন্ পথে গেলে তিনি মনে শান্তি পাবেন। জীবনে এমন সত্য কী আছে যা কখনো পরিবর্তন হয় না, বঞ্চনা করে

না? এই সংকটের মুহূর্তে তাঁকে পাকিস্তানি আমেরিকান বন্ধুরা সাহায্য করেন। ... পাকিস্তানি আমেরিকানরা জিমকে কোরআনের বাণী শোনান। তাঁদের ধর্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে জিম ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। ... আমেরিকান সমাজে মুসলমান ধর্মনেতা বলতে লুই ফারাখানকে সবাই এককথায় চেনেন।"

আব্দুর রহমান রসলার

তাঁর তৈরি 'নেশন অফ ইসলামে'র শিষ্য হয়ে রয়েছেন পঞ্চাশ হাজারের মতো মানুষ। "যেমন গত বছর ওয়াশিংটনে 'মিলিয়ন ম্যান মার্চে' অসংখ্য কালো মানুষ তাঁর বক্তৃতা শুনতে এলেন। কিন্তু কয়েকজন মাত্র ধর্মান্তরিত হলেন। ... নিউইয়র্কে গত বছর জানুয়ারি মাসে একটি পার্কে বিরাট 'ইদ উৎসব' হল। প্রায় পনরো হাজার লোক হয়েছিল। প্রার্থনার সময় ইমাম ইংরেজিতে বাণী দিলেন। নয়তো অধিকাংশ লোকেই বুঝবেন না।"

আশ্চর্যের কথা এটাই যে, পার্থিব কোন লাভের আশায় শুধু কলেমা বা মন্ত্র পড়ে দীক্ষা নেবার ভন্ডামি নয় বরং শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনীদের পুরুষদের দাড়ি, মেমসাহেবদের মাথা ঢাকা দিয়ে জীবনের গতি পুরোপুরি ঘুরিয়ে দিয়ে চলা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আলোলিকা মুখোপাধ্যায় আরও লিখেছেন, "সাদা চাদরে মাথা ঢেকে সুন্দরী মা আসছেন ছেলেমেয়ের হাত ধরে। দাড়িওলা ফর্সা যুবক ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 'মেরি গো রাউন্ড' বসাচ্ছে। হাতি, ঘোড়া, উট আর সিংহের পিঠে চড়ে বনবন করে ঘুরছে সাদা কালো, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার অভিবাসী সন্তান। ধর্মে মুসলমান, জাতিতে আমেরিকান। মার্কিন জনসংখ্যার তৃতীয় বৃহত্তর অংশ।"

ডঃ হামিদ মার্কাস

এই প্রতিবেদনটি ১৯৯৯-এর জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত। ইসলাম ধর্মের প্রতি আকর্ষণ, সেই সঙ্গে ইসলাম ধর্মকে বরণ করার গতি আশ্চর্যজনকভাবে চলমান। এর প্রমাণে বলা যায় যে, দু'বছর আগে ১৯৯৭ সালের ২৬ জানুয়ারি রবিবার সংবাদ প্রতিদিনে আমেরিকার চিঠি কলামে ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো পূরবী চক্রবর্তীর প্রতিবেদনটিও এই লেখার সঙ্গে সাযুজ্য রাখে। তিনি লিখেছেন ঃ "দ্রুত বাড়ছে ওয়াশিংটন এলাকায় মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা। কেবল ওয়াশিংটন নয়, সারা আমেরিকার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আর বাড়ছে মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে সচেতনতা। এই সচেতনতা কেবল বয়স্কদের মধ্যে নয়, বাড়ছে কলেজ তো বটেই, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, এলাকার স্কুলগুলোর মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা দলগতভাবে তৈরি করছে 'ইসলামিক ক্লাব' সেখানে তারা নিজেদের ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করতে পারবে এবং অমুসলমান ছাত্রছাত্রীদের মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে প্রভাবিত করতে পারবে। ... বিভিন্ন স্কুলে স্কুলে এই দলগুলির অস্তিত্ব ওয়াশিংটন এলাকার মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করায়। ১৯৮০ সালে আমি যখন ওয়াশিংটন আসি তখন এখানে মসজিদের সংখ্যা ছিল মাত্র দুটি। আর এখন মসজিদের সংখ্যা ১৪টি এবং আরও তৈরি হচ্ছে।" লেখিকা পূরবী চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি উল্লেখ করে লিখেছেন, "বিবেকানন্দ লিখেছেন, অন্ধকারে বিশ্বাস করা অন্যায়, নিজের যুক্তি ও বিচার খাটাইতে হইবে, সাধন করিয়া দেখিতে হইবে শাস্ত্রে যাহা আছে তাহা সত্য কি না। ধর্ম যাহা কিছু বলে সবই যুক্তির

জালালউদ্দিন হো

ফাইসাল ওয়াগনার

কষ্টিপাথরে ফেলিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক।" [সংবাদ প্রতিদিন, ২৬.১. ১৯৯৭, পৃ. ৫]

তাহলে বলা যেতে পারে, আমেরিকার মতো উন্নত দেশের বিজ্ঞান ও যুক্তিমনস্ক মানুষেরা সেইজন্যই কি তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করে ইসলাম ধর্মকে বরণ করছেন ?

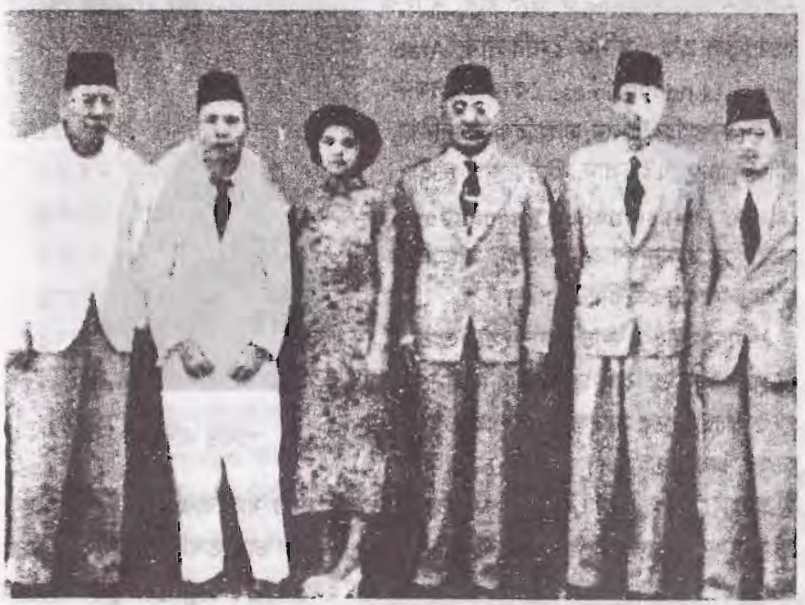

ফারুক চিয়াহ, এন. এম. বি. রিযওয়ান, মিস মিনিরা চো, লুকমান ইয়াংটক, আদনান সেং, রাফিয়ান চাও

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল যে, অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির নামের সঙ্গে সে দেশের নামকরণ পদ্ধতির অসঙ্গতি এবং ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে নাম ছিল তার সঙ্গে ইসলামি নামের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার কারণ হোল, তাঁদের জীবনী বিস্তারিত পড়ে দেখা যাচ্ছে যে, কেউ কেউ তাঁদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে পিতামাতা বা নিজের কর্মসূত্রে নতুন এক দেশের নাগরিক হয়েছেন এবং পূর্বের নাম বা পদবির সঙ্গেই মিশ্রিত করেছেন তাঁদের ইসলামি নাম। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্বের নাম জানতে পারা যায় নি বলেই দেওয়া হয়েছে ঐ ধরণের নাম।

অনেক পুস্তক ও পত্রিকায় স্বধর্মত্যাগী মানুষদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার তথ্য ও চিত্র প্রকাশিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হতে থাকবে। এগুলোর মধ্যে কতকগুলো পুস্তক এবং পত্রপত্রিকার নাম দেওয়া হচ্ছে। যেমন ইংল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত The Islamic

Review এর বিভিন্ন সংখ্যা, সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত Islam : Our Choice, আল মুসলিমূন, আরব নিউজ, The Call to Islam, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত মাসিক মদীনা, মুসলিম জাহান, মাসিক গুলিস্তান, মাসিক দাওয়াতুল হক, দৈনিক ইনকিলাব, Arab Times, London Times, কেন মুসলমান হলাম ? সাপ্তাহিক কলম, সাপ্তাহিক নঈ দুনিয়া, মাসিক নেদায়ে ইসলাম, মাসিক আত্‌তাওহীদ, Islamic Presentation Committee-র প্রচারপত্র, আনন্দবাজার পত্রিকা, সাপ্তাহিক বর্তমান, সংবাদ প্রতিদিন ইত্যাদি।

গানার এরিকসন

শেষ কথাটুকু বলতে গেলে যেটা অত্যন্ত ইতিহাস সম্মত তা হোল, মুহাম্মদ বিন কাসিমের পূর্বেও বহির্ভারতের মুসলমানদের ভারতে আসা যাওয়া অব্যাহত ছিল। এটা 'চেপে রাখা ইতিহাসে' উল্লেখ করা হয়েছে। মাদ্রাজ বা চেন্নাইয়ের মালাবার অঞ্চলে যে সমস্ত বিদেশি মুসলমানেরা আগন্তুক হয়ে এসেছিলেন, তখনকার ভারতে বসবাসকারী 'ভারতীয় জনগণ' ইচ্ছা করলে ঐ মুষ্টিমেয় মুসলমানদের হত্যা করতে পারতেন অথবা পারতেন তাদের ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু ভারতীয়রা সে ব্যবহার তো করেনই নি, বরং সাদরে আদর ও আপ্যায়ন দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন তাঁদেরকে। এ এক ঐতিহাসিক মহা ঔদার্য। ঐ নবাগত মুসলমানদের ভয়ে ভীত বা সঙ্কুচিত হয়ে ভারতীয়রা মৌন হয়ে গিয়েছিলেন এ কথা আদৌ সত্য নয়। ভারতের বিশাল জনসাধারণ শক্তি প্রয়োগ করলে ফুৎকারে উড়ে যেত ছোট্ট ঐ মুসলিম দলটি। মুসলমানদের রূপ, গুণ, জ্ঞান, গরিমা, সাহসিকতা ও নিয়মানুবর্তিতা এমনকি পোষাক পরিচ্ছদ পর্যন্ত ভারতীয়দের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন। তাঁরা

যায়নাব ডি. বোয়েরকি

মুগ্ধ হয়েই তাঁদের দান করেছিলেন একটি সম্মানজনক উপাধি 'মোপ্‌লা' 'মহাপিলা' বা মহাপুত্র।

ভারতীয়রা প্রথম দেখলেন মুসলমানদের দেহে সেলাই করা পোষাক। ভারতীয় জনসমাজে বেশভূষা ও পোষাক পরিচ্ছদে এক ইনকেলাব সৃষ্টি হোল মুসলমানদের শুভাগমনে। মুসলিমদের চালচলন সততা ও সভ্যতায় আকর্ষিত হয়ে, সেইসঙ্গে অপরদিকে ব্রাহ্মণতন্ত্রের তথাকথিত 'ছোটলোক'দের উপর অত্যাচারের রোলার চালানোর চাপে নিষ্পেষিত হয়ে যাঁরা বাঁচতে চাইছিলেন তাঁরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাঁদের বুক থেকে নামিয়ে ফেললেন নিষ্পেষণের রোলার। মুসলমানেরা জনগণের সমর্থন, সাহায্য এবং নিজেদের যোগ্যতা ও ক্ষমতায় উন্নতি করতে করতে পৌঁছে ছিলেন দিল্লির সিংহাসন পর্যন্ত। মুসলমানদের শাসন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে করেছিলেন ভারতীয় জনগণ। তাই রাজপুতদের মতো সম্ভ্রান্ত বংশের নেতারাও স্বেচ্ছায় তাঁদের বাড়ির কন্যাদের সঙ্গে সম্রাট বাদশাহ প্রিন্স মন্ত্রী ও আমলাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে আত্মীয় হয়ে গিয়েছিলেন মুসলমানদের। এটা যদি তাঁদের মনের বিরুদ্ধে হোত তাহলে কন্যাপ্রদানকারীরা মুসলমানদের অধীনে উজির, মন্ত্রী, সেনাপতি, আমলা, সুবেদার, মনসবদার বা নবরত্নের রত্ন হওয়ার সুযোগকে দুর্যোগ মনে করে প্রত্যাখ্যান করতেন।

প্যাট্রিসিয়া প্যারী

উইসল জেজরস্কি

আর্য সভ্যতা ও আর্যদের ভারত আগমন মেনে নিলে এও মেনে নিতে হয় যে, আর্যরা গৃহপালিত পশুদের স্নেহ ও আদর দিতে জানতেন। কিন্তু কালো চামড়ার ভারতবাসীদের

গলায় 'অনার্য' 'শূদ্র' 'ব্রাত্য' 'ছোটলোক' প্রভৃতি নানা উপাধির ফাঁস পরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা। আদি ভারতীয়দের মেয়েদেরকে বিবাহ করা আর্যদের পক্ষে সম্ভব ছিল না শুধু নয়, বরং তা ছিল কল্পনাতীত। এই ক্ষেত্রে বহির্ভারতীয় মুসলমানেরা ছিলেন ব্যতিক্রম। ইসলাম ধর্ম থেকেই তাঁরা হয়েছিলেন এই উদারতার অংশীদার। তাই তাঁরা পেরেছিলেন বাজার থেকে ক্রীতদাসকে কিনে সেই অচেনা অজানা বংশপরিচয়হীনকে শিক্ষা দীক্ষায় পরিপুষ্ট ও উপযুক্ত করে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সিংহাসনে বসাতে। ইতিহাসের দাস বংশ তার স্বর্ণোজ্জ্বল উদাহরণ।

কমলা সুরাইয়া (মাধবী কুট্টি)

মুসলিম সমাজের উলামা সাধক তাপসদের ব্যবহারে ভারতের হিন্দুরা এত মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে তাঁদের মৃত্যুর পরে আজও তাঁদের সমাধিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অব্যাহত— যা পূর্বেই উল্লেখিত। এটাও মুসলমানদের প্রতি ভারতীয় হিন্দুদের উদারতার এক নিদর্শন।

আবদুল আযিয জলন্ধরী

মুসলমানদের ভারতে পদার্পণের প্রথম তারিখ থেকে আজকের তারিখ পর্যন্ত ছোট বড় শহরের মসজিদের দরজায় হিন্দু মহিলা ও শিশুদের ভিড় দেখা যায় যাঁরা নামাজী মুসলমানদের মুখের ফু বা বাতাস নিতে চান তাঁদের গ্লাস বা বোতলের জলে এবং কচিকাঁচাদের মাথায় ও দেহে— এও এক ঔদার্য।

তাছাড়া প্রথম থেকে আজও মুসলমান কসাইদের হাতে জবাই করা ছাগল ভেড়া ও মুরগীর মাংস তাঁরা অবাধে খেয়ে আসছেন। অবশ্য এটা বলে রাখা ভাল যে, এগুলো তাঁদের ধর্মে নিষিদ্ধও নয়।

শুধু সেলাই করা পোষাকই নয়, মুসলমানদের মতো লম্বা আলখাল্লা পরা, মাথায় টুপি ও পাগড়ি ব্যবহার করা, দাড়ি রাখা ইত্যাদি শুরু হয়েছিল ব্যাপকভাবে। রবীন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রামমোহনের পোষাক পরিচ্ছদ লক্ষ্য করার মতো। অপরদিকে মুসলমানেরা অনেকে তাদের ধর্মে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও হিন্দু জাতির সঙ্গে আরও নিকটবর্তী হতে এবং আরও মিশে যাবার জন্য অনেক কিছুকে মেনে নিয়েছিলেন। যেমন কবর ও সমাধিকে বাঁধিয়ে পুষ্পাঞ্জলি, ফুলের তোড়া, ধূপ ধুনো দেওয়া, মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য মোরগ ও খাসী প্রভৃতি মানত করা, মহিলাদের সালোয়ার কামিজ ওড়না বাদ দিয়ে শাড়ী ব্লাউজকে বরণ করা, ধর্মে নিষেধ থাকলেও কপালে টিপ ও সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়া, হিন্দুদের মতো বিয়েতে যৌতুক বা পণের লেনদেন করা, তাঁদের মতো নবান্ন পর্ব পালন করা, ধর্মে কড়া নিষেধ থাকা সত্ত্বেও জামাইবাবু-শ্যালিকা এবং বৌদি-দেবরের বল্গাহীন ঠাট্টা তামাসা করা, ধর্মে নিষেধ নেই তবুও হিন্দুদের মতো মুসলমান সমাজে শাশুড়ি ও জামাতার মধ্যে লজ্জার বাড়াবাড়ি করা, ধর্মে আপত্তি থাকলেও মুসলমান ছেলেমেয়েদের হিন্দুদের মতো নাম রাখা, হিন্দুদের দেবদেবী বিসর্জনের মতো ঢোলবাদ্যসহ মহরমের তাজিয়া বিসর্জন করা, শিবের সম্মানে শিবরাত্রিতে সারারাত জাগার মতো মুসলমানদের 'শবেরাত' বা শবেবরাতে সারা রাত জাগা (অথচ সারা রাত জাগতেই হবে এমন কোন নিয়ম ইসলামে নেই), মুসলমান শিশুদের একরকম চর্মরোগ হলে বামুনবাড়ির ভাত খেলে তা ভাল হয় এ প্রচলন মুসলমানদের মধ্যে ছিল বা আছে, মুসলমান পুরুষদের ব্যাপকভাবে কোঁচা করে ধুতি পরা, হাতে বালা পরা, সোনার আংটি ও চেনহার ব্যবহার করা, সিল্কের পোষাক ব্যবহার করা— পুরুষদের জন্য এগুলো ধর্মে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবেশীদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতেই বোধহয় তাঁদের এই আমদানি করা আধুনিকতা বা বিবর্তন।

এত সব সত্ত্বেও হিন্দুত্ববাদীগণ ও মুসলমানদের মধ্যে কেন বেড়ে যাচ্ছে বৈরিতা, বিরোধিতা, ঘৃণা বিদ্বেষ আর সেই সঙ্গে লড়াই করার প্রবণতা? ক্রূর চক্রান্তকারী বৃটিশ ইতিহাসে ভেজাল দিয়ে মুসলমানকে অদ্ভুত ও বিপজ্জনক চরিত্রে চিহ্নিত করার চক্রান্তটি কি আজও ধরে ফেলা সম্ভব হোল না? দুশো বছর ধরে drain theory সামনে করে কোটি কোটি টন চাল ডাল পাট চা তুলো কয়লা এবং সেই সঙ্গে সোনা রুপো মণিমাণিক্য হীরে জহরত স্রোতের গতিতে বিলেতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারত থেকে। বৃটিশ মোগলদের মতো ভারতেই সবকিছু রেখে নিজেরা পূর্ণভাবে ভারতীয় হয়ে মুসলমানদের মতো ভারতের মাটিতে মিশে যেতে পারে নি। শোষণ, শাসন, ফাঁসি, গুলি, প্রহার, ধর্ষণ ও বৃটিশের সৃষ্টি করা ছোট বড় অনেকগুলো মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষে কোটি কোটি মানুষের ধ্বংস হওয়ার কথা কি করে ভুলিয়ে দিল ভারতীয়দের? এ প্রশ্নের উত্তর নেই।

১৮৯৯-এর ৩০শে অক্টোবর রিজলি ম্যানর থেকে তাঁর অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য শিষ্যা মিস মেরি হেলকে যে পত্র বিবেকানন্দ লিখেছিলেন তার একটু অংশ তুলে ধরছি ঃ

"ভারতবর্ষে কয়েক বছর ধরে চলেছে ত্রাসের রাজত্ব। বৃটিশ সৈন্য আমাদের পুরুষদের খুন করেছে, মেয়েদের মর্যাদা নষ্ট করেছে, বিনিময়ে আমাদেরই পয়সায় জাহাজে চড়ে দেশে ফিরেছে পেনসন ভোগ করতে। ভয়াবহ নৈরাশ্যে আমরা ডুবে আছি। কোথায় সেই ভগবান? মেরী, তুমি আশাবাদী হতে পার, কিন্তু আমি কি পারি? ধর, এই চিঠিখানাই যদি তুমি প্রকাশ করে দাও— ভারতে নূতন কানুনের জোরে ইংরেজ সরকার আমাকে এখান থেকে সোজা ভারতে টেনে নিয়ে যাবে এবং বিনা বিচারে আমাকে হত্যা করবে। আর আমি জানি, তোমাদের সব খৃষ্টান শাসক সম্প্রদায় ব্যাপারটা উপভোগ করবে, কারণ আমরা যে 'হিদেন'। ... হিদেন হনন খৃষ্টানদের পক্ষে অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত অবসর বিনোদন।" [দ্রষ্টব্য 'স্বামীজী লিখছেন' পুস্তকের পৃ. ২৩২, প্রকাশক স্বামী সত্যব্রতানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দে ছাপা]

এই 'হিদেন' শব্দটি একটি মারাত্মক শব্দ। নতুন কিছু গবেষকের মতে বঙ্গদেশের নামকরণের প্রচলিত ইতিহাস সত্য নয়। আদিবাসী সাঁওতালদের দেবতা 'বোঙ্গা' থেকেই যেমন বঙ্গের উৎপত্তি, তেমনি হতে পারে এই হিদেন থেকেই হিন্দু শব্দের সৃষ্টি।

শ্রীরামপুরের পাদ্রী মিঃ কেরির নাম বহুল প্রচলিত। উনি সদলবলে ভারতে আসবার পূর্বেই তাঁর স্বদেশ বিলেতে এই 'হিদেন' নামটি ভারতীয়দের জন্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। ভারতের 'হিদেন'দের কোন্ কায়দায় খৃষ্টান করা হবে সেই ষড়যন্ত্রের কারখানা তৈরি হয়ে যাওয়ার অনেকদিন পর তিনি পৌঁছেছিলেন ভারতে। কেরী ভারতে না এসেও হিদেনদের মধ্যে খৃষ্টের বাণী প্রচারের জন্য উতলা হয়ে উঠেছিলেন এবং কোটারিং শহরে 'The Particular Baptist Society for propagating the Gospel amongst the Heathen' নামে সমিতি গঠন করেছেন।" [দ্রষ্টব্য বাংলার সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ পুস্তকের পৃ. ১৪, লেখক অধ্যাপক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭৭]

উল্লিখিতঅনুল্লিখিত ভারতীয় বহু বুদ্ধিজীবী জেনেশুনে ঠান্ডা মাথায় নিজেদের আখের গোছাতে যুক্ত ছিলেন এই ষড়যন্ত্রে। হিদেন-এর সহজ বাংলা হচ্ছে অধার্মিক, নিম্নস্তরের ধর্মাবলম্বী জাতিভুক্ত ব্যক্তি, অখৃষ্টান, অসভ্য বা বর্বর ব্যক্তি, রুক্ষ, নিষ্ঠুর, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি। [দ্রষ্টব্য Samsad English-Bengali Dictionary, Fifth Edition, 1976, p. 504]

ইরান বা পারস্যের লোকেরা ভারতীয়দের নাম দিয়েছিলেন 'সিন্ধু'। পণ্ডিতেরা আমাদেরকে শিখিয়েছেন পারস্যের লোকেরা নাকি 'স' উচ্চারণ করতে পারতেন না তাই 'স'কে তাঁরা 'হ' উচ্চারণ করেছেন। আধুনিক গবেষকদের মতে একথা অসত্য এবং অযৌক্তিক। কারণ ইংরেজি ভাষায় 'স' দুটি আছে 'S' এবং 'C'। বাংলায় 'স' আছে

তিনটি স, শ, ষ। আর ফার্সি বা পার্সি ভাষায় 'স' আছে চারটি -'স'-এর পরিবর্তে সিন, 'শ'-এর পরিবর্তে শিন, ষ-এর পরিবর্তে স্বদ, 'স'-এর আরও হালকা উচ্চারণের জন্য আছে 'ষা' বা 'ষে'। যাদের চারটি 'স' আছে তারা 'স'-কে 'হ' উচ্চারণ করত একথা হাস্যকর। কি করে এটা মেনে নেওয়া যায় যে তারা 'সন্ধ্যাবেলা'-কে বলবে 'হন্ধ্যাবেলা', 'সন্দেশ'-কে বলবে 'হন্দেশ'? গ্রীকদের কথা তুলে আর বাড়াতে চাইছি না প্রসঙ্গ।

এখন দেখা যাক ইরান বা পারস্যের ভাষা ফার্সী অভিধানগুলোতে 'হিন্দু' শব্দের অর্থ কী লেখা আছে? বিখ্যাত ফার্সি অভিধান 'হাফত কুলযুম'-এ 'হিন্দু' শব্দের অর্থ অবিশ্বাসী, দাস ও ক্রীতদাস দেওয়া হয়েছে। [দ্রষ্টব্য তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৯৮]

আর একটি ফার্সী অভিধান 'বাহরে আযম'-এ হিন্দু শব্দটি চোর, চৌকিদার, দাস ও ক্রীতদাস অর্থে ব্যবহৃত হয় বলে উল্লেখ আছে। তাছাড়া এও বলা হয়েছে যে, ভারতের বাসিন্দাদের 'হিন্দি' বলা হয়, 'হিন্দু' নয়। [দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় খন্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা]

আর একটি বহুল প্রচলিত ফার্সী অভিধানের নাম 'লোগাতে কিশওয়ারী'। এতে লেখা রয়েছে 'হিন্দু' শব্দ 'চোর' 'ডাকাত' 'ছিনতাইকারী' ও 'গোলামের' অর্থে ব্যবহৃত হয়। [দ্রষ্টব্য পৃ. ৮২১-৮২২]

পূর্বে উল্লিখিত মহা মহা পন্ডিতেরা এই অর্থগুলো জানতেন না তা নয়। সারা ভারতবর্ষে প্রায় পৌনে এক হাজার বছর ফার্সি ভাষা রাষ্ট্রভাষা ছিল। সেই সময়কার নন্ মুসলিমদের মধ্যে যাঁরা দেওয়ান, মুৎসুদ্দি, নায়েব, মুন্সী, কেরানী আর কর আদায়কারী জামিনদার বা জমিদার পরে রাজা মহারাজা প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত ছোট বড় নেতা, তাঁরা এসব ভালভাবেই জানতেন এবং অভিধানে এই হিন্দু শব্দটির অর্থ নোংরা ও কদর্য হলেও হাসিমুখে মেনেও নিয়েছিলেন সেটা। তাঁরাই ভারতকে তুলে দিয়েছেন বৃটিশের হাতে। একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়, "মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে দেশীয় জনসাধারণ বিশেষ করে নব উদ্ভুত বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজ ও ধনিক গোষ্ঠী বৃটিশরাজকে সর্বোতভাবে সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছিলেন।"

"তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরি প্রভৃতি দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করে ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না।" [ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখিত বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ, পৃ. ১৩ ও ১১১]

বিবেকানন্দও বলেছেন ঃ "যে 'হিন্দু' নামে পরিচয় দেওয়া এখন আমাদের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা কিন্তু আর কোন সার্থকতা নেই; কারণ ঐ শব্দের অর্থ 'যারা সিন্ধু নদের পারে বাস করত'। ... এইভাবে 'হিন্দু' শব্দ আমাদের কাছে এসেছে। মুসলমান শাসনকাল থেকে আমরা ঐ শব্দ নিজেদের ওপর প্রয়োগ করতে শুরু করেছি। ... সুতরাং আমি 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহার করব না। তবে কোন্ শব্দ ব্যবহার করব? আমরা 'বৈদিক'

শব্দটা ব্যবহার করতে পারি বা 'বৈদান্তিক' শব্দ ব্যবহার করলে আরও ভাল হয়।" [দ্রষ্টব্য বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, পৃ. ৭০০, ১৯৮৮]

এখন যেটা আশ্চর্যজনক প্রশ্ন সেটা হোল, বৃটিশের পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাওয়ার পরেও ইংরেজদের দেওয়া 'হিদেন', 'কালা আদমি', 'নেটিভ', 'জেন্টু', 'নবুব' প্রভৃতি কলঙ্কময় উপাধিগুলোকে ঝেঁটিয়ে তাড়ানো হয়েছে। অথচ অভিধান অনুযায়ী অশ্লীল ও অপমানজনক অর্থযুক্ত এই 'হিন্দু' শব্দকে স্বামী বিবেকানন্দের ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও কেন পরিত্যাগ করা সম্ভব হোল না বা স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দও কেন তা পরিত্যাগ করতে পারলেন না— এ প্রশ্নেরও উত্তর নেই।

কিছু আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভাবতে শুরু করেছেন কোন এক বিশেষ মহামূল্যবান প্রাপ্তির বিনিময়ে এই কদর্য অর্থযুক্ত 'হিন্দু' শব্দটিকে মেনে নিতে হয়েছে। তাহলে কি এটাই ধরে নেওয়া হবে প্রাগৈতিহাসিক যুগ ও ঐতিহাসিক যুগে 'হিন্দু' বলে যখন কিছু ছিলনা তখন ভারতে ছিল বহু জাতি। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক দেবতা ও দেবী, পূজা পদ্ধতিও ছিল স্বতন্ত্র, সামাজিক ও পারিবারিক বিধিনিষেধও ছিল আলাদা আলাদা, বিবাহ পদ্ধতি ও মৃতের সৎকার পদ্ধতিও ছিল পৃথক। অন্যদিকে মুসলমানেরা ছিল একটি বিশাল জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বৃটিশের বুদ্ধিতে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত নন্ মুসলিমদের একত্রিত করে সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়কে পরিণত করা হোল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে। ভারতীয় খৃষ্টান ও পার্সী জাতি তাঁদের স্বাতন্ত্র ধ্বংস হতে না দিয়ে পৃথক হয়ে গেছেন আজও। শিখ জাতি হিন্দু ধর্মে ঢুকে গিয়েও তাঁদের স্বাতন্ত্র বিলুপ্ত হওয়ার আশংকায় এবং এটাকে ধর্মীয় আত্মহনন মনে করে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন হিন্দু ধর্মের পরিধি থেকে।

যদি একথা সত্য হয় তাহলে মুসলমান, শিখ, পার্সী প্রভৃতি জাতি এমনকি বর্তমানের হিন্দু জাতিও ভাবতেই পারেন না যে 'হিন্দু' শব্দ বাদ দিলে ভারতে মুসলমান জাতি বর্তমানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হয়ে দাঁড়াবে। আর ব্রাহ্মণ্যবাদীরা হয়ে দাঁড়াবেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে। এত বড় মহাপ্রাপ্তির বিনিময়েই কি 'হিন্দু' শব্দটিকে বরণ করে নেওয়া হয়েছে? আর্য, আর্যাবর্ত, বেদ, বেদান্ত-এসবের পিছনেও কি ছিল বৃটিশ ও তাদের আমেরিকা ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বান্ধবদের ষড়যন্ত্র? আর্য অনার্য ভদ্রলোক ছোটলোক ব্রাত্য আদিবাসী হরিজন দলিত প্রভৃতি গোষ্ঠী বা জাতিকে সূক্ষ্ম ও সুষ্ঠ পরিকল্পনায় তাঁদের কপালে 'হিন্দু' চিহ্নের মোহর মেরে নিজেদের স্বার্থে তাঁদের সংখ্যাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। অথচ অপর দিকে তাঁদের সমস্ত রকমের উন্নতির উপকরণ কেন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে যুগ যুগ ধরে— আজও এ প্রশ্নের উত্তর নেই।

শিশুদের বিকল্পহীন পরিচারিকা মেথরানী মাতৃজাতি। তেমনি সমাজের বিকল্পহীন সমাজবন্ধু মেথর। শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত দুগ্ধ-প্রদানকারিনী মাতৃজাতি। তেমনি সমাজের বিকল্পহীন দুগ্ধ উৎপাদক বা সরবরাহকারী সমাজবন্ধু ঘোষ বা যাদব। সমাজবন্ধু মৎসজীবী, সমাজবন্ধু কর্মকার, সমাজবন্ধু স্বর্ণকার, সমাজবন্ধু ক্ষৌরকার, সমাজবন্ধু রজক, সমাজবন্ধু কুম্ভকার— এই সমস্ত বিকল্পহীন সমাজবন্ধুদের কায়দা করে 'ছোটলোক'ই বানিয়ে রাখা হয়েছে। চরিত্রে জ্ঞানে গুণে সংস্কৃত শিক্ষায় পারদর্শী হলেও তিনি একজন অশিক্ষিত নির্বোধ ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হতে পারেন নি আজও। অথচ তাঁদের কপালে 'হিন্দু' মার্কা স্ট্যাম্প মেরে দিতে ভুল হয়নি মোটেই। এই আর্যতত্ত্ব বা আর্যামি-ষড়যন্ত্র বুঝেছেন অনেকেই, কিন্তু সমাধান করতে পারেন নি কেউই।

মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বৃটিশের ছড়িয়ে দিয়ে যাওয়া ষড়যন্ত্রগুলোর উপর গবেষণা করার মতো যোগ্য লোক আমাদের ভারতে অনেকেই আছেন বলে আমার বিশ্বাস। আধুনিক গবেষণায় এখন প্রকাশ হতে শুরু করেছে যে, আর্য বা আর্যতত্ত্ব সন্দেহজনক। কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

"আর্য জাতি নামক কোন মানব গোষ্ঠীর অস্তিত্ব পৃথিবীর বুকে না কোনদিন ছিল, না এখনো আছে।"

"মিঃ কীথ বলেছেন সত্যিকারের আর্য কারা সে সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা কিছু নেই আমাদের — We have insufficient knowledge of what was ture Aryan." [দ্রষ্টব্য 'আর্যজাতির অস্তিত্বই ছিল না' ঃ পরমেশ চৌধুরী, পৃ. ১, ১০, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ]

"বৈদিক ভারতবাসীদের মধ্যে কোন রকম জাতীয় নাম প্রচলিত ছিল না।" [ঐ, পৃ. ১৩]

স্বামী বিবেকানন্দ এই আর্যামি কতটা বিশ্বাস করতেন তা বলা মুশকিল। তিনি অন্য ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, "মনু বলেছেন— প্রার্থনার মাধ্যমেই যার জন্ম তিনিই আর্য। তাঁর মতে যে শিশুর জন্ম প্রার্থনাজাত নয়, সে শিশু আইনসিদ্ধ নয় বা আর্য নয়।" [পৃ. ১৫]

"বিশুদ্ধ আর্য বলতে কারও সন্ধান মেলে না ভারতবর্ষে। বিশুদ্ধ দ্রাবিড়দেরও মেলে কি? তাও ত নয়। ... পাশ্চাত্য পন্ডিতেরা এই বিধ্বংসী তত্ত্বটি খাড়া করেছেন নিজেদের স্বার্থে। খুবই পরিতাপের বিষয় এই যে, অনেকেই এই তত্ত্বটির অনুসারী।" [ঐ, পৃ. ১৭-২০]

আর্যদের আসলে কোথায় জন্ম, কোথা থেকে কোথায় গেল এসব প্রশ্নের সঠিক কোন উত্তরই নেই। এমনকি স্যার গর্ডন চাইল্ডের মতো মনীষীও যথার্থ কোন সমাধান দিতে পারেন নি। তিনি তাঁর এই দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন ভবিষ্যত গবেষকদের হাতে।

"১৮৮৬ সালের ১০ই এপ্রিল লন্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটা ষড়যন্ত্রের জন্ম হয়েছিল। সে ষড়যন্ত্রটা ছিল— 'আর্যদের ভারত আক্রমণ'। এই কাল্পনিক তত্ত্বটাকে প্রতিষ্ঠিত করা হোল।" [দ্রষ্টব্য ঐ, পৃ. ৭৭]

"বৃটিশরা ভারতের ইতিহাস-বিকৃতি ঘটিয়েছিলেন তাঁদের নিজেদের স্বার্থে, ভারতবাসীদের বোকা বানিয়ে তাদের ওপর ইচ্ছেমত জবর দখল ভোগ করবার জন্য।"

"আধুনিক পন্ডিতের কথা না হয় বাদ দিলাম। যাস্কসের মতো প্রাচীন ভারতীয় পন্ডিতও বিরক্ত হয়ে বলেছেন বেদের সবটুকুই, বিশেষ করে ব্যাখ্যামূলক অংশ অপদার্থ। মন্ত্রগুলো দুর্বোধ্য অর্থহীন এবং পরস্পর বিরোধী। ... যদি ভারতবর্ষের ধর্ম নিরপেক্ষ কোন ইতিহাস রচনা করতে হয় তাহলে আমাদের বৈদিক যুগের পরবর্তী যুগের গ্রন্থাদির সাহায্য নিতে হবে, বেদের নয়।" [পৃ. ১২২-২৩]

"হাস্যকর ব্যাপার হোল ঋগ্বেদের কাল নিরূপণ করতে গিয়েও বিশেষজ্ঞরা এই রায় দিয়েছেন যে, ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল ১৫০০ খৃ. পূর্বাব্দে। এই কাল নিরূপণের কোন ভিত্তিই নেই, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তো দূরের কথা।" [পৃ. ১২৪]

ম্যাক্সমূলারের মতে ঋগ্বেদের বয়েস খৃষ্ট পূর্বাব্দ ১২০০ বছর আগে। পন্ডিত মিঃ কীথের মতে আরও ২০০ বছর পূর্বে। পন্ডিত মিঃ পার্গিটারের মতে তার আরও ১০০ বছর পূর্বে। পন্ডিত মিঃ ওয়েবারের মতে তার আরও ৫০০ বছর পূর্বে। পন্ডিত এইচ. জ্যাকবির মতে তারও ২০০০ বছর পূর্বে। ভারতীয় নেতা তিলকের মতে তারও একহাজার বছর পূর্বে, অর্থাৎ খৃ. পূ. ৫০০০ বছর আগে। ম্যাক্সমূলার থেকে তিলক পর্যন্ত একেবারে পাঁচ হাজার বছরের উন্নতি হোল। ঋগ্বেদের বয়স বাড়তে বাড়তে এখন দাঁড়িয়েছে একলাখ কুড়ি হাজার বছর। [তথ্য ঐ, পৃ. ১২৪-২৭]

"ঋগ্বেদকে নিয়ে ছেলেখেলা করেছেন, উল্টোপাল্টা ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঋগ্বেদের। তবে এ ব্যাপারে শুধুমাত্র বৃটিশ ঐতিহাসিক বা পন্ডিতদের দায়ী করলে চলবে না। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন এবং সুনীতিবাবুর একনিষ্ঠ ভক্ত শিষ্য বি. কে. ঘোষ প্রভৃতি বাঙালী ভাষাতত্ত্ববিদরাও এ-মহৎকর্মে বৃটিশ সাম্রাজ্য শক্তির সহায়তা করেছেন। এঁরা যে লন্ডন রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্যপদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তা কি নিছক যোগ্যতার জন্যই? কখনোই নয়।" [পরমেশ চৌধুরী, ঐ, পৃ. ১৪৭]

"আর্য নামে কোন জাতি বা মানববংশের অস্তিত্ব ছিল পৃথিবীতে কোন কালে, এর সমর্থনে কোন সাক্ষ্য নাই, প্রমাণ নাই। তবুও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই এই আর্য জাতিই হয়ে ওঠে মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বাস্তব, সবচেয়ে শক্তিশালী মানব বংশ। আর্য জাতির কথা পৃথিবী জানতে পারে ১৮৬০ সালের পর।" [পৃ. ১৭১]

আমাদের প্রকাশনায় চিন্তা-চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী কয়েকটি বই

❖ কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব	–ধর্মাচার্য ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় (ভারত)	১৫০.০০
❖ বেদ ও পুরাণে আল্লাহ্ ও হযরত মোহাম্মদ	–ধর্মাচার্য ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় (ভারত)	১৫০.০০
❖ রদ্দে খৃস্টান ও দলিলুল ইসলাম	–মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ	৮০.০০
❖ মেহেরুল ইসলাম	–মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ	৮০.০০
❖ হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা	–মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ	১৫০.০০
❖ বিধবা গঞ্জনা	–মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ	১৫০.০০
❖ ধর্মের রহস্য	–মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ	১৫০.০০
❖ মুসলিম সংস্কৃতির মর্মকথা	–এস. ওয়াজেদ আলী	১০০.০০
❖ ভবিষ্যতের বাঙালী	–এস. ওয়াজেদ আলী	৮০.০০
❖ গ্রানাডার শেষ বীর	–এস. ওয়াজেদ আলী	৮০.০০
❖ বাল্য বিবাহ	–ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১০০.০০
❖ বিধবা বিবাহ	–ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১০০.০০
❖ চেপে রাখা ইতিহাস	–আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা	২০০.০০
❖ বজ্র কলম	–আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা	২০০.০০
❖ ইতিহাসের ইতিহাস	–আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা	৩০০.০০
❖ এ এক অন্য ইতিহাস	–আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা	২০০.০০
❖ বাজেয়াপ্ত ইতিহাস	–আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা	৮০.০০
❖ এ এক বিস্ময়কর ইতিহাস	–আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা	১৩০.০০
❖ বাইবেলে শেষ নবীর পূর্বাভাস	–আহমদ দীদাত	৮০.০০
❖ অলৌকিক এই কোরআন এবং উনিশের মোজিযা	–আহমদ দীদাত	৮০.০০
❖ বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান	–মোহাম্মদ গোলাম হোসেন	২০০.০০
❖ হিন্দু ধর্মে ইসলাম প্রসঙ্গ	–মোহাম্মদ শামসুজজামান	১৫০.০০
❖ রায়নন্দিনী	–সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী	৮০.০০
❖ ভারত যখন স্বাধীন হল	–মাওলানা আবুল কালাম আযাদ	২০০.০০
❖ আত্মকথা	–মাওলানা আবুল কালাম আযাদ	২০০.০০
❖ চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান	–ডা. সিদ্দিকুর রহমান	১০০.০০
❖ ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের অবদান	–ড. তারা চাঁদ	২০০.০০
❖ বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)	–ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার	২০০.০০
❖ পুত্রের প্রতি পিতার উপদেশাবলী	–হযরত আলী (রাঃ)	৫০.০০
❖ পেতাম যদি এমনতর শাসক	–মোহাম্মদ শামসুজজামান	৫০.০০
❖ আওরঙ্গজেব মোহাম্মদ আলমগীর	–আল্লামা শিবলী নোমানী	১০০.০০